ইসলামী ফিক্বহের আলোকে

সুদবিহীন ব্যাংকিং

আপত্তিসমূহ ও তার পর্যালোচনা

শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মদ তকী উসমানী

Contents

ইসলামী ফিক্বহের আলোকে

সুদবিহীন ব্যাংকিং

আপত্তিসমূহ ও তার পর্যালোচনা

শায়খুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মদ তক্বী উসমানী

Contents

ইসলামী ফিক্বহের আলোকে
সুদবিহীন ব্যাংকিং
আপত্তিসমূহ ও তার পর্যালোচনা

মূল
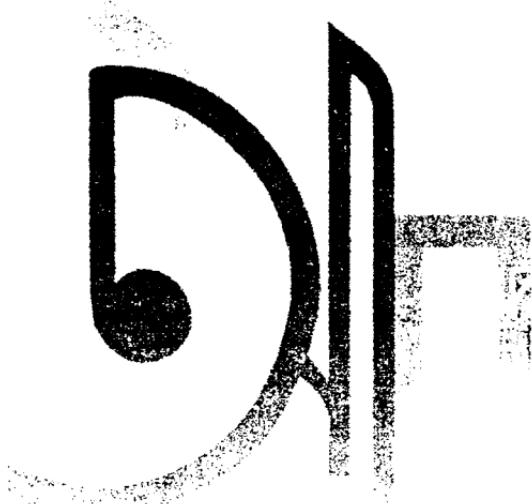
শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মদ তকী উসমানী

অনুবাদ

মাওলানা মুসা বিন ইযহার

মুহাদ্দিস : জামেয়াতুল উলুম আল ইসলামিয়া
লালখান বাজার, চট্টগ্রাম।
খতীব : আরমানিটোলা জামে মসজিদ
আরমানীয়া স্ট্রিট, আরমানিটোলা, ঢাকা।

(সেরা মুদ্রণ ও প্রকাশনার অগ্রপথিক)
৬৬২, আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা-১২১২

ইসলামী ফিক্বহের আলোকে

সুদবিহীন ব্যাংকিং

আপত্তিসমূহ ও তার পর্যালোচনা

মূল
শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মদ তকী উসমানী

অনুবাদ
মাওলানা মুসা বিন ইযহার

প্রকাশক
মুঈনুদ্দীন আহমাদ গালিব
মাকতাবাতুল ইসলাম
ফোন. ০১৯১১৬২০৪৪৭

প্রচ্ছদ
বশির মেছবাহ

প্রথম প্রকাশ
এপ্রিল -২০১২ খ্রিস্টাব্দ
বৈশাখ-১৪১৯ বঙ্গাব্দ
জুমাদাল উলা-১৪৩৩ হিজরী

মুদ্রণ
মাকতাবাতুল ইসলাম
(সেরা মুদ্রণ ও প্রকাশনার অগ্রপথিক)
৬৬২ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা-১২১২
ফোন. ০১৯১১৬২০৪৪৭, ০১৯১২৩৯৫৩৫১
০১১৯০৩৪১৫২৫

মূল্য
২৯০.০০ টাকা মাত্র

শাইখুল ইসলাম আল্লামা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর অন্যতম খলীফা, জামিয়া আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটাহাজারী'র সম্মানিত মুহতামিম ও শাইখুল হাদীস, বাংলাদেশ ক্বওমী মাদ্‌রাসা শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের আমীর, উস্তাযুল উলামা, শায়খুল ইসলাম হযরত

আল্লামা শাহ্ আহমদ শফী দা. বা.-এর

দু'আ ও বাণী

بسم الله الرحمن الرحيم

সুদ এমন একটি নিকৃষ্ট কবীরা গুনাহ, যার বিরুদ্ধে আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআনে প্রকাশ্য যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছেন। বর্তমান বিশ্বে সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার মাধ্যমে সুদ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এমনভাবে প্রবেশ করেছে যে, তা থেকে বাঁচা সাধারণ মানুষের জন্য কঠিন হয়ে পড়েছে। সুদের অভিশাপে আজ সমাজে চরম অর্থনৈতিক বৈষম্য ও বিশৃংখলা বিরাজমান। তাই এ থেকে বেঁচে ইসলামী অর্থব্যবস্থা কায়েমের মাধ্যমে সামাজিক শান্তি ও আল্লাহর আনুগত্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। একজন মুসলমান হিসেবে এ প্রচেষ্টা চালানো আমাদের সকলের ঈমানী দায়িত্ব।

বর্তমান বিশ্বে সুদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং ইসলামী ফিক্বহের আলোকে সঠিক ও কল্যাণমুখী অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন তাদের মধ্যে হযরত আল্লামা জাস্টিস তক্বী উসমানী অন্যতম। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ ইসলামী অর্থনীতির উপর গবেষণা চালিয়ে বিভিন্ন পুস্তক, প্রবন্ধ, নিবন্ধ রচনা করেছেন। 'গায়রে সূদী বাংকারী' নামক পুস্তকটিতেও তিনি বিভিন্ন অর্থনৈতিক লেনদেনের

Contents

উপর তথ্যবহুল আলোচনা করেছেন। যা আলেম, তালেবে ইলম ও সচেতন মহলের জন্য অত্যন্ত জরুরী। আমার স্নেহাস্পদ মাওলানা মুসা বিন ইজহার বাংলা ভাষায় এর অনুবাদ করে একটি গুরুত্বপূর্ণ খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। আমি দু'আ করি,আল্লাহ পাক তার এই খেদমতকে কবুল করুন। আমিন।

মাআস্‌সালাম

(আল্লামা শাহ্) আহমদ শফী

মুহতামিম ও শায়খুলহাদীস

জামিয়া আহলিয়া দারুল উলুম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

আহমদ শফি

মুহতামিম

আল-জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম

হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

Contents

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী ফিক্বহবিদ, দেশের অন্যতম শীর্ষ আলেম, জামিয়াতুল উলুম আল ইসলামীয়া লালখান বাজার চট্টগ্রামের সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম ও শাইখুল হাদীস

আল্লামা মুফতী ইজহারুল ইসলাম দা. বা.-এর

অভিমত

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ! أما بعد!

সুদভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা প্রায় বিগত একশত বছরে সাম্রাজ্যবাদের ছত্রছায়ায় শুধু ইসলাম আর মুসলমানদের নয়; বরং পৃথিবীর মানব সন্তানের ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে প্রায় শতকরা আশি ভাগ আদম সন্তানকে স্বাস্থ্য, মেধা, চরিত্র, আখলাক, কৃষ্টি ও কালচারের দিক থেকে ধ্বংসের যে প্রান্তে নিয়ে গেছে তার ভয়াল চিত্র কোন ধর্মের বুদ্ধিজীবি, লেখক, গবেষক, কবি, সাহিত্যিক এক হাজার বছর ধরে লিখেও শেষ করতে পারবে না। তাই মহান আল্লাহ পবিত্র গ্রন্থ কুরআনে সমস্ত মহাপাপের তুলনায় একমাত্র সুদী অর্থব্যবস্থার বিরুদ্ধে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পক্ষ থেকে যুদ্ধ ঘোষণা করে বলেছেন.

فأذنوا بحرب من الله ورسوله

অন্যদিকে সমাজতন্ত্রবাদীরা স্বীয় মেহনতের নিশ্চিত ফসল মালিকানাকে অস্বীকার করে। হাতের পাঁচ আঙ্গুলকে এক সমান করে দেখানোর মাধ্যমে সমাজতন্ত্র সত্তর বছরে পৃথিবীবাসীকে বোকা বানানোর যে অপচেষ্টায় লিপ্ত ছিল তা এত দ্রুত ভেঙ্গে পড়ার কথা নয়। যদি না খোদাদ্রোহিতা তথা ধর্মহীনতাকে সমাজতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে পৃথিবীর মানুষের সামনে জাহির করা হতো। খোদাদ্রোহিতাভিত্তিক মাত্র সত্তর বছরের সমাজতন্ত্র সামান্য

আফগানী পাঠানদের লাঠির আঘাতে যেভাবে খান খান হয়ে গেল তা এই শতাব্দীর ইতিহাসের অন্যতম একটি উজ্জ্বল অধ্যায়।

ইসলাম ইহ ও পরকালীন সার্বিক কল্যাণের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, তা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন পড়ে না। কুরআন একদিকে আখেরাত বেহেশত ও দোযখ পুলসেরাত ও হাশর নশরের কথা যেমন বলেছে, ঠিক তেমনিভাবে একজন মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার জীবন ধারণের সর্ব বিষয়ে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে দিক নির্দেশনা দিয়েছে। একজন মানুষের জৈবিক বিষয়ের এমন কিছু পাওয়া যাবে না, যা কুরআনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই। যারা কুরআনকে শুধু পরকালীন পথপ্রদর্শক ধর্মগ্রন্থ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তাদের মত ভ্রান্ত আহমক দুনিয়াতে আর নেই। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খুলাফায়ে রাশেদীনসহ প্রায় এক লক্ষ ৪৪ হাজার সাহাবা এই কুরআন দিয়েই সমগ্র পৃথিবীকে পরিচালনা করেছিলেন।

মোদ্দাকথা, ইসলাম সমাজতন্ত্র নয়, পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থাও নয়। এটা মানবতার ইহ ও পরকালীন উভয় জীবনের অতি সুন্দর ও সুখময় ব্যবস্থা এবং কিয়ামত পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে অবিচ্ছিন্ন থেকে মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান-সমগ্র আঙ্গিনায় একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, যাকে আমরা Complete code of life হিসেবে সমগ্র বিশ্বের সামনে বুক ফুলিয়ে উঁচু করে ধরে থাকি।

যে সুদী অর্থব্যবস্থার বিরুদ্ধে আল্লাহ ও তাঁর মহান রাসুল যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন তা কোন জাতির জন্য পৃথিবীর কোন অঞ্চলে কোন প্রকার কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। আজকে ক্ষুধা, দারিদ্র ও পুষ্টিহীনতাসহ নানাবিধ রোগে পৃথিবীর অগণিত মানুষ আক্রান্ত হওয়ার পিছনে অন্যতম প্রধান কারণ পুঁজিবাদী সুদী অর্থব্যবস্থা। আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে অর্থ বন্টনের একটি মৌলিক নীতি ঘোষণা

করেছেন, তা হচ্ছে- كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ। অর্থ মানবতার মেরুদন্ড স্বরূপ এবং তা মানব সন্তানের দেহে প্রবাহিত রক্তের সমতুল্য। আল্লাহ পাক কুরআনে বলেছেন- وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا অর্থাৎ, "তোমরা কোন অবুঝ লোকের হাতে এ অর্থ সম্পদ সোপর্দ করো না, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য মেরুদন্ড স্বরূপ দান করেছেন।" যে অর্থ মানবতার মেরুদন্ড ও রক্তের মত, তা কোন দিনই এককভাবে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠির নিকট পুঞ্জিভূত হতে পারে না। তাই মেরুদন্ড ও রক্ত সমতুল্য অর্থ কোন বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠির নিকট সীমাবদ্ধ হওয়া সমগ্র মানবতার জন্য মহা বিপর্যয় ছাড়া অন্য কিছু নয়।

যে সুদী অর্থব্যবস্থার বিরুদ্ধে আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন সেই যুদ্ধ কয়েক মাস বা কয়েক বছরের জন্য কোন জাতি বা গোষ্ঠির ব্যাপারে মওকুফ বা রহিত হতে পারে না।

কঠোর হুশিয়ারীর এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর কিয়ামত পর্যন্ত আদম সন্তান বিধ্বংসী এই সুদের বিরুদ্ধে লড়াইতে অবতরন করে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থাকে দুনিয়া থেকে চিরতরে নির্মুল করা ছাড়া যেকোন ধর্মাবলম্বী মানব সন্তানের জন্য দুনিয়াতে সুখে শান্তিতে বসবাস করার বিকল্প কোন পথ নেই।

এই বিষয়ে মুসলিম উম্মাহ'র গর্বের সন্তান শাইখুল ইসলাম আল্লামা মুহাম্মদ তক্বী উসমানী তাঁর মহা মূল্যবান জীবনের প্রায় চল্লিশটি বছর কোন সময় মুফতি হিসেবে, কোন সময় মুহাদ্দিস হিসেবে, কোন সময় ওয়ায়েজ ও খতিব হিসেবে বিশেষতঃ পাকিস্তান নযরিয়াতি কাউন্সিলের নীতি নির্ধারণী প্রভাবশালী সদস্য হিসেবে এবং সর্বশেষ পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের শরীয়া আপিল বিভাগের মহামান্য বিচারপতি হিসেবে হাজার হাজার পৃষ্ঠা লিখনির যে অবদান

রেখেছেন ইসলামের ইতিহাসে তা স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে। দুঃখের বিষয়, গুটি কয়েক তথাকথিত মুফতিগণ বাংলাদেশ, পাকিস্তানে তাঁর আকাশচুম্বি জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে ইসলামে সুদবিহীন ব্যাংকিংয়ের কোন ব্যবস্থা নেই বলে মহা ধৃষ্টতা পোষণ করে একটি বই রচনা করে হাটহাজারী মাদরাসার মত স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের ওলামায়ে কেরামের কাছ থেকে কৌশলে দস্তখত উসুল করে বাংলাদেশ, পাকিস্তানের হকপন্থী আলেম-আওয়ামের মাথা নিচু করেছে। আল্লাহ পাক তাদের হেদায়েত দান করুন।

যে কোন মুসলিম অমুসলিমের নিকটে সুদবিহীন অর্থব্যবস্থাকে সুন্দর পন্থায় উপস্থাপন করতে পারলে সারা বিশ্বজোড়া অর্থনীতির এই ভয়াবহ সংকট থেকে উত্তরণের জন্য একটি সুন্দর মডেল তারা উপহার হিসেবে পাবে এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই।

এই বিষয়ে আমি অধমের বিগত ত্রিশ বৎসরে কুরআন হাদীস ও ফিক্বহ লব্ধ অসংখ্য অজস্র অভিজ্ঞতা আমার অন্তরে অঙ্কিত রয়েছে যা লিখতে গেলে কয়েক হাজার পৃষ্ঠার প্রয়োজন। তাই আমার শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু শাইখুল ইসলাম আল্লামা তক্বী উসমানী এসব বিতর্কিত বক্তব্যের যে দাতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন আমি তার সঙ্গে একমত।

আমার প্রিয় স্নেহভাজন মাওলানা মুসা তাৎক্ষনিকভাবে আমাদের শ্রদ্ধেয় আল্লামা তক্বী উসমানীর সময়োপযোগী মহান গ্রন্থের অনুবাদ করে বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের মুসলমান ভাই বোনদের জন্য যে অবদান রেখেছেন তার মূল্যায়ন করার ভাষা আমার নিকট নেই।

মহান রাব্বুল আলামীন তাকে, তার পরিবার পরিজনকে, তার প্রজন্মকে কিয়ামত পর্যন্ত এইভাবে দ্বীনের প্রতিটি বিষয়ে কলম ধরার এবং মৌখিক খুৎবা দেয়ার জন্য তাওফীক দান করুন।

আমি অধমের পক্ষ থেকে আজীবন তার প্রতি দিবা রাত্রি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে এই দোয়াই অব্যাহত থাকবে।

اللهم آمين بحرمة سيد الأمين — ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم —

মাআস্‌সালাম

আল্লামা মুফতী ইজহারুল ইসলাম দা. বা.

মুহতামিম ও শায়খুলহাদীস

জামিয়াতুল উলুম আল ইসলামিয়া লালখান বাজার

অনুবাদকের কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد !

আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন সুদকে হারাম করেছেন। শুধু হারাম করেই ক্ষান্ত হননি; বরং সুদকে এমন একটি কবীরা গুনাহ হিসেবে অভিহিত করেছেন, যার বিরুদ্ধে কোরআনে কারীমে স্বয়ং আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে প্রকাশ্য যুদ্ধের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। সুদ এমন একটি পাপ, যা মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে চরম বৈষম্যের সৃষ্টি করে। সুদী ব্যবস্থায় ধনী আরো ধনী হয়, গরীব আরো অধিক গরীবে পরিণত হয়। সুদের অপকারিতা অত্যন্ত ব্যাপক। সুদ আজ যেভাবে বিশ্বব্যাপী তার আগ্রাসী থাবা বিস্তার করে রেখেছে, শুধু মুখের কথা বা কলমের কালি দিয়ে তা থেকে বিশ্ব মানবতাকে উদ্ধার করা সম্ভব হবে না। এর জন্য প্রয়োজন সুদবিহীন ইসলামী অর্থব্যবস্থার ব্যাপক প্রচার ও প্রচলন। বর্তমান বিশ্বে ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। তবে তা সুদ ভিত্তিক হবার কারণে মানবতাকে ক্রমেই বিপর্যয়ের পথে নিয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে ইসলামী শরীয়তের আলোকে এর বিকল্প পেশ করা বর্তমান সময়ে অন্যতম চাহিদা। তাই আজ বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় এই চাহিদা মিটাতে সুদবিহীন ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুদবিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় আল্লাহ পাকের কিছু বান্দা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন, বর্তমান বিশ্বের অন্যতম সেরা ইসলামী ব্যক্তিত্ব, শাইখুল ইসলাম আল্লামা জাস্টিস মুফতী মুহাম্মদ তক্বী উসমানী।

আল্লামা মুফতী তক্বী উসমানীকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেয়ার কিছুই নেই। তিনি তার গবেষণাকর্মের মাধ্যমে ইতোমধ্যে সারা বিশ্বের ইসলামী জনতার হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন। সুদের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টে তাঁর প্রদত্ত ঐতিহাসিক রায় এবং সুদমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় তিনি যে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন, তাতে আজ তিনি

ইসলামের শত্রুদের আক্রমনের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছেন। তবে অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে কিছু উলামায়ে কেরামও এই কাতারে শামিল হয়েছেন। তাঁরা মনে করেন, সুদী ব্যাংকের কোন বিকল্প ইসলামে নেই। এ বিষয়ে তাঁরা বিভিন্ন যুক্তিও উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। আল্লামা তক্বী উসমানী তাঁদের সেসব বক্তব্য ও আক্রমনের জবাব দিয়েছেন সুনিপুণভাবে।

সর্বশেষ হযরত তক্বী উসমানী সাহেবের এসব কাজের সমালোচনা করে বিগত বছরকয়েক পূর্বে করাচীর জামেয়া বিন্নুরী টাউন থেকে একটি ফতোয়া প্রকাশিত হয়। তিনি এর জবাবে غیر سودی بینکاری নামক একটি কিতাব রচনা করেন। বক্ষমান গ্রন্থটি তারই অনুবাদ।

এই কিতাবে তিনি বিরোধীতাকারীদের সমালোচনার জবাবের সাথে সাথে বর্তমান সময়কে সামনে রেখে অর্থ ও বাণিজ্য বিষয়ক কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফিক্বহী মাসায়েলের উপর আলোকপাত করেছেন। বিষয়গুলো আলেম, ছাত্র ও শিক্ষিত সমাজের সামনে আসা অত্যন্ত জরুরী। এই উপলব্ধি থেকেই আমার প্রিয় ভাই হযরত হাফেজ্জী হুজুর রহ. এর সুযোগ্য নাতি মাওলানা সানাউল্লাহ হাফেজ্জী বিষয়টি আমার সামনে উপস্থাপন করে কিতাবটি বাংলা ভাষী মুসলমানদের কল্যাণার্থে অনুবাদের জন্য অনুরোধ করেন। এই খেদমতটি আঞ্জাম দেয়ার সুযোগ করে দেয়ায় আমি তাঁর কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। আমি মহান আল্লাহ পাকের উপর ভরসা করে প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে এ কাজ সম্পাদনে নেমে পড়ি। দ্রুত প্রকাশনার তাগিদ থাকায় আলহামদুলিল্লাহ খুব অল্প সময়ের মধ্যেই কাজটি সম্পাদন করতে পেরেছি। যথাসাধ্য চেষ্টা ছিল সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করার। তবে আলোচ্য ফিক্বহী মাসায়িলগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও কিছুটা জটিল। তাই দ্রুত কর্মসম্পাদনের কারণে হয়ত কারো কাছে কিছু বিষয় দুর্বোধ্য মনে হতে পারে। এ ব্যাপারে কারো কোন পরামর্শ থাকলে আমাদের অবগত করতে পারেন। আমরা সযত্নে বিবেচনাপূর্বক পরবর্তী প্রকাশনায় তা গ্রহণ করার আশা করছি।

প্রায় বছরখানেক পূর্বে অনুবাদকর্ম শেষ হলেও বিভিন্ন জটি[illegible] কারণে তা আটকে ছিল। যাই হোক, অবশেষে মাক[illegible]

ইসলামের অন্যতম কর্ণধার, হযরত আল্লামা মুফতী মুহিউদ্দীন রহ. এর সুযোগ্য নাতি প্রিয় ভাই মাওলানা বদরুদ্দীন আহমাদ তক্বী বইটি প্রকাশে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় দেরীতে হলেও বইটি প্রকাশিত হচ্ছে। এজন্য তাঁকে অসংখ্য মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

এ কাজে আমাকে নির্দেশনা ও উৎসাহ যোগানোর জন্য আমি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি আমার শ্রদ্ধেয় পিতা দেশের অন্যতম শীর্ষ আলেম ফক্বীহুল উম্মাহ হযরত আল্লামা মুফতী ইযহারুল ইসলাম চৌধুরী দা. বা., আমার শ্রদ্ধাভাজন আম্মা (যিনি দক্ষিন এশিয়ায় বিগত শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফিকহবিদ বাংলাদেশের মুফতীয়ে আজম হযরত আল্লামা মুফতী ফয়যুল্লাহ রহ. এর সুযোগ্য বড় নাতনি), আমার প্রিয় সহধর্মিনী (যিনি বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব ও ইসলামী রেনেসার অগ্রদূত হযরত হাফেজ্জী হুজুর রহ.এর সুযোগ্য নাতনি), আমার প্রিয় ভাই হযরত হাফেজ্জী হুজুর রহ. এর সুযোগ্য নাতি মাওলানা হাফেজ মাহমুদুল্লাহ হাফেজ্জীকে।

পরিশেষে মহান আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করি, তিনি যেন আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস কবুল করেন।

আল্লাহ হাফেজ

মুসা বিন ইযহার

১৯ রবিউল আউয়াল ১৪৩৩ হিজরী

১২ ফেব্রুয়ারী ২০১২ ঈসায়ী

প্রকাশকের কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

শাইখুল ইসলাম আল্লামা মুফতী মুহাম্মাদ তক্বী উসমানী। একটি নাম, একটি ইতিহাস। যিনি ইতোমধ্যেই নিজ কর্ম ও কীর্তির কল্যাণে ইসলামী বিশ্বের মধ্যমণিতে পরিণত হয়েছেন। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের অগ্রযাত্রায় তাঁর অবদান সর্বজন বিদিত। তিনি ইসলামী ব্যাংকিংসহ ইসলামী অর্থনীতির বিভিন্ন বিষয়ে বহু পুস্তক রচনা করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপপ্রচারে লিপ্ত হয়। সেই ধারাবাহিকতায় ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে তার গবেষণার সমালোচনা করে কিছু পুস্তক/প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তারই একটি হলো مروجہ اسلامی بینکاری নামক করাচী থেকে প্রকাশিত বইটি। এই বই প্রকাশিত হবার পর বিভিন্ন বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ায় তিনি এর জবাবে غیر سودی بینکاری নামক কিতাবটি রচনা করেন। যেখানে বর্তমান সময়ের ইসলামী ব্যাংকিংয়ের বিভিন্ন জরুরী মাসআলার প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। যা আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজেও অনেক উপকারে আসবে। বিপুল সাড়া জাগানো এ বইটি বাংলাদেশে আসার পরপরই বাংলা ভাষায় প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তখন মাওলানা ছানাউল্লাহ হাফেজ্জীর অনুরোধে বিশিষ্ট আলেমেদীন মাওলানা মুসা বিন ইজহার আপন প্রতিভা ও কর্মদক্ষতার গুণে অল্প ক'দিনের মধ্যেই বইটির অনুবাদ সম্পন্ন করেন।

এরপর প্রায় বছরাধিককাল বইটি অপ্রকাশিত অবস্থায় মুহতারাম অনুবাদকের কাছেই থেকে যায়। অবশেষে বিষয়টি নযরে আসে আমার ছোট ভাই হাফেয মাওলানা বদরুদ্দীন আহমাদ তকি'র। তিনি নিজ প্রচেষ্টায় মাকতাবাতুল ইসলাম থেকে বইটি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। মহান আল্লাহ তাকে ও মুহতারাম অনুবাদককে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমিন।

Contents

Contents

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

বিদ্যমান অর্থব্যবস্থায় সুদ এমন এক অভিশাপ; যা পুরো দুনিয়াকে গ্রাস করে নিয়েছে। কুরআন-সুন্না'য় এর হারাম হবার বিষয়টি যত বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে এবং এর বিরুদ্ধে যে পরিমান সতর্কবাণী উচ্চারন করা হয়েছে, সম্ভবত অন্য কোন পাপ কার্যের বেলায় তা করা হয়নি। এ সম্পর্কিত কুরআন-সুন্নাহ'র উদ্ধৃতিগুলো আমার শ্রদ্ধাভাজন পিতা রহ. তাঁর রচিত "মাসআলায়ে সূদ" নামক কিতাবে সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁরই নির্দেশে "তিজারতী সূদ" নামে এ কিতাবের দ্বিতীয়াংশ আমি আঠারো বছর বয়সে লিখেছি, যেখানে সেসব লোকদের বিরোধীতা করা হয়েছে যারা ব্যাংকের প্রচলিত সুদকে জায়েয বলার চেষ্টা করেন। এ সম্পর্কিত আরো বেশ কয়েকটি কিতাব ও প্রবন্ধ লেখার সুযোগ আমার হয়েছে যার মধ্যে সর্বশেষ রচনা হচ্ছে সেটাই যা আমি সুপ্রিম কোর্টের শরীয়ত এপিলেট বেঞ্চের একজন সদস্য হিসেবে একটি রায়ে লিপিবদ্ধ করেছি। পরবর্তীতে তা "সূদ পর তারিখী ফয়সালা" (সুদের উপর ঐতিহাসিক রায়) নামে প্রকাশিত হয়েছে।

আমাদের আকাবিরদের মধ্যে হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ., হযরত মাওলানা যফর আহমদ উসমানী রহ., হযরত মাওলানা ইউসুফ বিন্নুরী রহ., হযরত মাওলানা মুফতী রশীদ আহমদ রহ., হযরত মাওলানা মুফতী আবদুশ্ শুকুর তিরমিযী রহ., হযরত মাওলানা শামসুল হক আফগানী রহ., হযরত মাওলানা মুফতী ওয়ালি হাসান রহ. প্রমুখ বুযুর্গদের ব্যাপারে এই অধমের মনে আছে, তাঁরা এই চিন্তায় নিমগ্ন থাকতেন যে, কিভাবে বর্তমান ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে সুদ থেকে পবিত্র করে এমন একটি বিকল্প ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যায় যার মাধ্যমে এই হারাম

লেনদেন থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হবে। এসব বুযুর্গদের মধ্যে অনেকেই এ বিষয়টির উপর লেখালেখি করেছেন, অনেকে এর জন্য বাস্তব প্রচেষ্টাও চালিয়েছিলেন। আব্বাজান রহ. এর ব্যাপারে আমার মনে আছে, আমার ছোট বেলায় তিনি এ বিষয়টি নিয়ে পাকিস্তানের তৎকালীন অর্থমন্ত্রী ও পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মুহাম্মদ আলীর সাথে বেশ কয়েকটি দীর্ঘ বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। সেসময় তিনি সুদবিহীন ব্যাংকিংয়ের একটি ফর্মূলাও তৈরী করেন। পরর্তীতে রাষ্ট্রপতি আইয়ুব খানের সময় শেখ আহমদ এরশাদ সাহেব শরয়ী মূলনীতির উপর ভিত্তি করে করাচীতে একটি কো-অপারেটিভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেসময় তিনি আমার হযরত আব্বাজান রহ. ও হযরত বিন্নুরী রহ. এর সাথে ঘন ঘন দেখা করতেন। (এই ব্যাংক সম্পর্কে হযরত বিন্নুরী রহ. এর প্রতিক্রিয়া এই কিতাবেই পরে আলোচনা করা হবে)।

মোট কথা! 'সুদী ব্যাংকের কোন বিকল্প ব্যবস্থা পেশ করা হোক'-এ আকাঙ্ক্ষা এবং প্রচেষ্টা আমাদের বুযুর্গদের কাছ থেকে সবসময় পরিলক্ষিত হয়েছে। কিন্তু এর বিস্তারিত বাস্তব রূপরেখা আমাদের দেশে সর্বপ্রথম তখনই দৃশ্যমান হয় যখন রাষ্ট্রপতি জিয়াউল হকের সময়ে 'ইসলামী নযরিয়াতি কাউন্সিল' নতুনভাবে গঠিত হয়। সেসময় হযরত আল্লামা সৈয়্যদ ইউসুফ বিন্নুরী রহ.ও এর সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন। হযরতের সাথে আমি অধমেরও খেদমতের সুযোগ হয়েছিল। এর একেবারে প্রারম্ভিক বৈঠকগুলোতে কাউন্সিলের যে কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করা হয় তাতে সুদবিহীন ব্যাংক ব্যবস্থার বিস্তারিত প্রস্তাবনা তৈরীও অন্তর্ভূক্ত ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই হযরত বিন্নুরী রহ. ইন্তেকাল করেন। পরে তাঁর জায়গায় হযরত মাওলানা শামসুল হক আফগানী রহ.কে সদস্য মনোনীত করা হয়। পরিশেষে কাউন্সিল একটি রিপোর্ট তৈরী করে যেখানে হযরত আফগানী রহ. ছাড়াও হযরত মাওলানা মুফতী সাইয়্যাহুদ্দীন রহ. এবং আমার দস্তখত ছিল।

এরপর ১৪১২ হিজরী সনে সুদবিহীন ব্যাংকিংয়ের গৃহিত পদ্ধতিসমূহের উপর গবেষণা করার জন্য করাচীতে 'মজলিসে তাহক্বীকে মাসায়িলে হাজেরা'র বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে হযরত মাওলানা মুফতী রশীদ আহমদ রহ., হযরত মুফতী আব্দুশ্ শুকুর তিরমিযী রহ., হযরত মাওলানা

মুফতী মুহাম্মদ ওয়াজীহ রহ., হযরত মাওলানা মুফতী সাহবান মাহমুদ রহ., হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ রফী' উসমানী দা. বা., হযরত মুফতী আবদুল ওয়াহেদ দা. বা. খায়রুল মাদারিস মুলতান থেকে হযরত মুফতী মুহাম্মদ আনোয়ার দা. বা. অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং আমি অধমও উপস্থিত ছিলাম। এই মজলিসের কার্যবিবরণী আহসানুল ফাতাওয়ার ৭ম খন্ডের ১১১ নং পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে।

যেসব প্রস্তাব এই মজলিসে গৃহিত হয়েছিল তার ভিত্তিতেই পরবর্তীতে আমি সুদবিহীন ব্যাংকিং বিষয়ে বেশ কয়েকটি কিতাব ও প্রবন্ধ উর্দূ, আরবী ও ইংরেজী ভাষায় লিখেছি। যেখানে সুদবিহীন ব্যাংক ব্যবস্থাকে বাস্তবে কার্যকর করার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এতে উলামায়ে কেরামের প্রতি আবেদন করা হয় যে, বিষয়বস্তুটি নতুন হবার কারণে তাঁরা যেন গবেষণা করে তাঁদের মতামত পেশ করেন। উদ্দেশ্য ছিল, যদি কোন প্রশ্ন কিংবা প্রস্তাব এসে যায় তাহলে যেন পর্যালোচনা ও বোঝাপড়ার পরিবেশে গবেষণা করা যায়। অনেকেই চিঠি ইত্যাদীর মাধ্যমে পর্যালোচনার পরিবেশে বিভিন্ন প্রস্তাব ও প্রশ্ন পাঠিয়েছেন। তাদের সাথে চিঠি পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ চলে। এর একটি বড় ফাইল আমার কাছে সংরক্ষিত আছে। পত্র মারফৎ এসব যোগাযোগের আলোকে অনেক জায়গায় আমি আমার রচনাগুলোতে পরিবর্তন এনেছি। যেখানে সুদবিহীন প্রাইভেট ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানে তা কার্যকর করার চেষ্টা করেছি। আর অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তরও প্রদান করেছি। তবে কেউ কেউ আমাকে এমন কিছু লেখা দেখিয়েছেন যেখানে আমার কিতাব "ইসলাম আওর জাদীদ মায়ীশাত ওয়া তিজারাত" এর কিছু কথার বিরোধীতা করা হয়েছে। সে রচনাগুলোতে আমি পর্যালোচনা ও বোঝাপড়ার বিষয়টি অনুপস্থিত পেয়েছি। তাই ঐ লেখাগুলো ছাপানোর পরও আমার কাছে কোন কপি প্রেরণ করা হয়নি; বরং প্রকাশিত হবার দীর্ঘ সময় পর আমাকে কেউ একজন তা দেখিয়েছে। এসব লেখার উপর পর্যালোচনা অবশ্যই করা হয়েছে, তবে তর্ক বিতর্ক এবং বিরোধীতার পরিবেশ সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য ছিল না বলেই এগুলোর জবাব দেয়ার চিন্তা পরিহার করা হয়েছে।

বেশ কয়েক বছর পর গত বছর হঠাৎ করে সুদবিহীন ব্যাংকিং এর প্রচলিত পদ্ধতির উপর কিছু সমালোচনামূলক লেখা প্রকাশিত হয়েছে।

যেখানে একই বিষয়ে আমার বিভিন্ন লেখা ও বক্তব্যের পর্যালোচনা করা হয়েছে। তারা সম্মিলিতভাবে এই অবস্থান নিয়েছেন যে, এসব পদ্ধতি শরয়ী দৃষ্টিতে নাজায়েয এবং যেসব সুদবিহীন ব্যাংক এ পদ্ধতিগুলো গ্রহণ করেছে তাদের সাথে লেনদেন হারাম; বরং কোন কোন লেখায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, এগুলো সূদী ব্যাংকের চেয়েও বেশী হারাম।

প্রথম প্রথম এসব সমালোচনার জবাবে কিছু লেখার ব্যাপারে আমি যথেষ্ঠ দ্বিধান্বিত ছিলাম। যার একটি কারণ ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তর্ক বিতর্ক এবং বিরোধীতা-সমালোচনা ইত্যাদীর সাথে নিজেকে কখনো মানিয়ে নিতে পারিনি। বিশেষত তা যখন ঐসব আলেমদের সাথে হয় যাদের ব্যাপারে কখনোই আমার এরকম ধারণা ছিল না যে, তারা সমঝোতা ও বোঝাপড়ার পথ পরিহার করে ছাপার অক্ষরে মতপার্থক্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটাবেন। তাদের উত্থাপিত প্রশ্নসমুহের মধ্যে অনেকগুলোরই আলোচনা ইতোপূর্বে আমি আমার কিতাবসমূহে করেছি। কোথাও দৃঢ়তার সাথে আর কোথাও বিবেচনা যোগ্য বলে সেগুলোর মৌলিক উত্তরও প্রদান করেছি। তাই শুরুতে আমার ধারণা ছিল, উলামায়ে কেরাম যখন এসব সমালোচনাকে আমার লেখার সাথে মিলাবেন তখনই তারা বুঝতে পারবেন কোনটি শুদ্ধ আর কোনটি অশুদ্ধ। কিন্তু অনেক উলামায়ে কেরাম আমাকে অনুরোধ করলেন, এসব সমালোচনার ব্যাপারে অবশ্যই কিছু লেখা উচিৎ। কেননা আজকাল সব আলেমরা এতটাই ব্যস্ত যে, উভয় লেখাকে সামনে নিয়ে বিচার করার সুযোগও হয়ত প্রত্যেকের মিলবে না। দ্বিতীয়তঃ ব্যাংকিংয়ের বিষয়টি এমন যে, এর প্রতিটি অংশ সকলের সামনে দৃশ্যমান থাকে না। তৃতীয়তঃ এসব সমালোচনায় এমন কিছু অবাস্তব কথা আছে যা অনুমান করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয় যারা কার্যক্ষেত্রে এর সম্মুখীন হননি।

এতদসত্ত্বেও এসব সমালোচনা যদি কোন প্রতিষ্ঠান অথবা প্রতিষ্ঠানসমূহের বিরুদ্ধে হত তবুও এর জবাব দেয়ার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু এগুলোর মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য লেখায় সুদবিহীন ব্যাংক ব্যবস্থার অস্তিত্বকে হয় অস্বীকার করা হয়েছে নয়তো বাস্তবে রূপ দেয়াকে অসম্ভব বলা হয়েছে। এমনও বলা হয়েছে যে, এসব ব্যাংক শুধু 'শিরকাহ' ও 'মুদারাবাহ'র ভিত্তিতেও যদি পরিচালিত হয় তবুও তা নাজায়েয থেকে

যাবে। যার আবশ্যিক অর্থ দাড়ায়, বর্তমান ব্যবসা বাণিজ্যকে সুদ থেকে পবিত্র করার সব প্রচেষ্টাই নাজায়েয এবং অনর্থক। আর ব্যবসা বাণিজ্য করতে গিয়ে যেসব লোকের ব্যাংকের সাথে সম্পৃক্ত হতে হয় তাদের সুদ থেকে বাঁচার কোন পথ নেই। পুরো ইসলামী দুনিয়ায় আজ সরকারগুলোর কাছে ব্যাংককে সুদমুক্ত করার যে গণদাবী উত্থাপিত হচ্ছে সে দাবী থেকে মুসলামনদের সরে আসা উচিৎ। সুদের হারাম হওয়ার বিষয়ে একথাই মেনে নিতে হয় যে, এই যুগে কুরআন-সুন্নাহ'র এ বিষয়টির উপর আমল করা সম্ভব নয়। আবার কোন কোন জায়গায় অবশ্য এই শর্ত যুক্ত করা হয়েছে যে, যতদিন পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকবে ততদিন কোন ব্যাংক ইসলামী হতে পারে না। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিনাশ কিভাবে হবে তারও উল্লেখ করা হয়নি। ব্যাংকগুলোকে সুদমুক্ত করা ছাড়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নির্মূল কিভাবে সম্ভব ?

বিষয়গুলো যেহেতু অত্যন্ত জটিল এবং এই অবস্থানকে প্রমাণিত করতে অনেক শরয়ী আহকামও জড়িত হয়ে পড়েছে। উপরন্তু আমার সম্পর্কে এমন সব কথা বলা হয়েছে যা বাস্তবতাবিবর্জিত। তাই ইস্তেখারা এবং পরামর্শের পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে, কমপক্ষে বিষয়গুলো কিছুটা বিস্তারিতভাবে পরিস্কার করে দেয়া উচিৎ। আর ইতোপূর্বে আমি সংক্ষিপ্তাকারে যেসব বিষয় লিখেছিলাম তার ফিকহী প্রমাণাদী আরো বিস্তারিতভাবে আসা এবং নতুনভাবে উত্থাপিত প্রশ্নসমুহের পর্যালোচনা হওয়া দরকার। সুতরাং আমার উদ্দেশ্য তর্কে লিপ্ত হওয়া নয়; বরং সংশ্লিষ্ট কিছু ফিকহী মাসায়িল পর্যালোচনা করা।

আমার জানামতে এখন পর্যন্ত এরকম চারটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে যেগুলো এখন আমার সামনে। এগুলোর মধ্যে কিছু এমন যাতে সামগ্রিকভাবে কিছু ইলমী বিষয় উত্থাপিত হয়েছে। কিছু এমন যাতে ব্যক্তিগত আক্রমণ প্রাধান্য পেয়েছে। আর কিছু এমন যাতে সহিষ্ণু ও পান্ডিত্যপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে যোগ্যতার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। ভাষার কারুকার্য ব্যবহার করে এবং প্রশংসাচ্ছলে সমালোচনার উত্তম প্রদর্শনী করা হয়েছে। কোথাও الكناية ابلغ من التصريح এর ভিত্তিতে ইশারা আবার কোথাও التصريح এর ভিত্তিতে স্পষ্টতার মূলনীতিকে সুচারুরূপে কাজে লাগানো হয়েছে

এধরনের পান্ডিত্যপূর্ণ বাক্যব্যয়ে আমারও যথেষ্ঠ দখল আছে। কিন্তু অত্যন্ত সচেতনতার সাথে এর ব্যবহার ফিকহী মাসায়িল ও আলোচনা থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রাখি। দৃশ্যত যুবক লেখকদের সামনে যেহেতু যথেষ্ঠ বয়স পড়ে আছে (আল্লাহ এটাকে আরো দীর্ঘ করুন) তাই তারা যদি ফিকহী মাসায়িলের আলোচনাতেও মনোরঞ্জনকারী এই পন্থা অবলম্বন করেন তবে সেটা তাদের তাজা ইলম এবং তপ্ত খূনের চাহিদা হতে পারে। বিশেষতঃ এসব যুবক আলেমদের মনে একজন বৃদ্ধ জ্ঞানপিপাসু তালিবে ইলমের ব্যাপারে যদি এমন বদ্ধমূল ধারণা সৃষ্টি হয় যে, অর্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল ধরে ফিক্হ পড়ার পরও সে ফিকহের প্রাথমিক বিষয়গুলো সম্পর্কেও অবগত নয় এবং তাকে ফিকহ ও উসুলে ফিকহের ঐসব বিষয় পড়ানো উচিৎ যা চতুর্থ-পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রদের পড়ানো হয় তাহলে তার উপর ক্রোধান্বিত হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এই ক্রোধ সত্ত্বেও বার্ধক্যের খাতিরে যদি তারা তার জন্য বিভিন্ন উপাধি ও শিষ্টাচারের আবরণে ইশারা ইংগিতে প্রতিক্রিয়া ও ঠাট্টা মস্করা করেই ক্ষান্ত হন তবে সেটা তাদের দয়া। কিন্তু আমার মত বৃদ্ধ তালিবে ইলম যার বয়স দৃশ্যত খুব অল্পই বাকী আছে তার পক্ষে এসব কাটা ছেড়ার অংশীদার না হয়ে এবং পান্ডিত্যপূর্ণ সাহিত্য উপভোগ করে সালাম ও দোয়া করতে করতে চলে যাওয়া উচিৎ।

অতএব শেষ যে দু'প্রকার লেখায় ব্যাক্তিগত আক্রমণ ও সমালোচনা প্রাধান্য পেয়েছে সেগুলোর ব্যাপারে আমি কিছু উপস্থাপন করতে অপারগ। দলিল প্রমাণ ইত্যাদীর দুর্বলতাকে ঢাকার জন্যও অনেক সময় এ ধরনের সাহিত্য ও আবেগপূর্ণ ভাষা এবং একই কথাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিভিন্নভাবে বলার প্রয়োজন পড়ে। আলহামদুলিল্লাহ এখানে এগুলোর কোন প্রয়োজন নেই। তাই এ বিষয়ে আমার সমস্ত আলোচনা ইলমী পরিমন্ডলে সীমাবদ্ধ থাকবে। ফলতঃ এটাকে কারো কাছে প্রাণহীন মনে হলে আমি আগে থেকেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

অনেকে আমার কাছে এ প্রস্তাবও রাখেন যে, এক সমালোচনামূলক
' খুব জোরালোভাবে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা যা কিছু
সবই ঐকমত্যের ভিত্তিতে এবং এটা অধিকাংশ উলামাদের
'ন্য সব মত নগন্য সংখ্যকদের; অতএব, এ বিষয়েও কিছু

লেখা উচিৎ। যদিও আমার কাছে কমপক্ষে দেড় শতাধিক উলামা ও মুফতী সাহেবানদের লিখিত মতামত এসেছে যে, তাঁরা তাদের এই অবস্থানের সাথে একমত নন। এতদসত্ত্বেও আমি এ বিষয়ে কিছু লেখা অনুচিত মনে করি। এটাতো আল্লাহ পাকের ফয়সালা যে, তাঁর সন্তুষ্টিবিরুদ্ধ কোন মতামত অল্প সময়ের জন্য জোরদার হলেও পরিশেষে উম্মতে ইসলামীয়া ঐক্যবদ্ধভাবে তা প্রত্যাখ্যান করে এবং তা ইতিহাসের পাতায় হারিয়ে যায়। সুতরাং আমি বা অন্য কেউই নিজের কথাকে শেষ কথা বলে গণ্য করতে পারে না। কোন কথাটি আল্লাহর সন্তুষ্টি মোতাবেক এবং পরিণতিতে তা সাধারণ্যে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পাবে আর কোন কথাটি তাঁর সন্তুষ্টিবিরুদ্ধ যা পরিণতিতে মুছে যাবে– এ ফয়সালাতো আল্লাহ ছাড়া কেউই দিতে পারেন না। আমি মহান আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করি, আমি যা কিছু বুঝছি এবং লিখছি তা যদি তাঁর সন্তুষ্টি মোতাবেক না হয় তবে তিনি যেন তাকে ধুলিস্যাত করে দিয়ে এই উম্মতকে তার অমঙ্গল থেকে বাঁচান এবং আমাকেও তা থেকে ফিরে আসার সুযোগ দেন। আর যদি তা তাঁর সন্তুষ্টি মোতাবেক হয় তবে তাকে যেন তিনি ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা প্রদানের মাধ্যমে ঐ উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করে দেন যা বাস্তবায়নের জন্য লেখাটি লিপিবদ্ধ হয়েছে। আর এটিকে যেন উম্মতকে সুদের অভিশাপ থেকে বাঁচানোর উসিলা বানিয়ে দেন। আমীন সুম্মা আমীন!!!

১১ জুমাদাল উলা ১৪৩০ হি.
৮ মে, ২০০৯ ইং

মুহাম্মদ তক্বী উসমানী আফাল্লাহু আনহু
দারুল উলুম, করাচী-১৪

সুদী ব্যাংকের বিকল্প কি সম্ভব?

সর্বপ্রথম এই বিষয়টি পরিস্কার হওয়া দরকার যে, সুদী ব্যাংকের পরিবর্তে ইসলামী ব্যাংকিং অথবা সুদবিহীন ব্যাংকিংয়ের জন্য বিকল্প ব্যবস্থার অনুসন্ধান জরুরী অথবা কমপক্ষে উত্তম কি না? কেননা ইসলামী ব্যাংক অথবা সুদবিহীন ব্যাংকের কল্পনা ও বাস্তবতা যদি গোড়াতেই ভূল হয় তাহলে এর কর্মপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করাটা অনর্থক হয়ে যাবে। এখন পর্যন্ত আমার সামনে যেসব সমালোচনামূলক লেখা এসেছে সেগুলোতে সুদী ব্যাংকিংয়ের বিকল্প ব্যবস্থার ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন ও বিপরীতমূখী অবস্থান নেয়া হয়েছে। একটি অবস্থানতো এমন যে "ব্যাংক এবং ইসলাম দু'টি সম্পূর্ন বিপরীতমূখী বাস্তবতা; এ দু'টি কখনো একত্রিত হতে পারে না"। কোথাও বলা হয়েছে "যেমনিভাবে ইসলামী মদ এবং ইসলামী জুয়া হতে পারে না তেমনিভাবে ইসলামী ব্যাংকও হতে পারে না"। কোথাও বলা হয়েছে "বিকল্প পেশ করা আমাদের দায়িত্ব নয়"। আবার কোথাও বলা হয়েছে "সুদী ব্যাংকিংয়ের বিকল্প হলো শিরকাহ ও মুদারাবাহ। কিন্তু বর্তমান সময়ে এর উপর আমল করা প্রায় অসম্ভব"। কোথাও বলা হয়েছে "পুরোপুরি অসম্ভব না হলেও অবশ্যই অনেক কঠিন"।

এসব মতামতের পরস্পর বিরোধীতার প্রতি লক্ষ্য না করেই একটি প্রশ্নের উত্তর খোঁজা জরুরী যে, 'দুনিয়ার সকল নাজায়েয বিষয়ের বিকল্প পেশ করার জন্য আমরা দায়বদ্ধ কি না?' প্রশ্নটি শুধু এখনই প্রথমবারের মত সামনে এসেছে তা নয়; বরং ইতোপূর্বেও এর উপর বিশদভাবে গভীর চিন্তা ভাবনা করা হয়েছে। আমি নিজেও 'ইসলাম আওর জাদীদ মায়ীশাত ওয়া তিজারাত' নামক কিতাবে এর উপর আলোচনা করেছি। যার সারাংশ হলো, যেসব বিষয় মানুষের বাস্তব প্রয়োজনয়ীতার ভিত্তিতে অস্তিত্ব লাভ করেনি সেগুলোর বিকল্প খোঁজার কোন প্রয়োজন নেই এবং এর জন্য আমরা দায়বদ্ধও নই। সুতরাং কেউ যদি লটারী ও জুয়া'র বিকল্প চায় তা দেয়া আমাদের জন্য জরুরী নয়। কেননা মানুষের বাস্তব প্রয়োজনের সাথে এগুলোর কোন সম্পর্ক নেই। এগুলো শুধুই বিলাসিতার কাজ। কিন্তু যেসব বিষয় মানুষের বাস্তব প্রয়োজনীয়তার অন্তর্ভূক্ত এবং মানুষ সেগুলো অর্জনের জন্য নাজায়েয পথ অবলম্বন করছে সেসব বিষয়ের জায়েয বিকল্প অনুসন্ধান করা শুধু উত্তমই নয়; নিদেন পক্ষে অবশ্যই 'মাসনূন' হবে। যেমনটি সামনে বর্ণিত হবে।

এই মূলনীতিকে সামনে রেখে প্রচলিত ব্যাংক সমূহের পর্যালোচনা করা হলে দেখা যাবে এর অনেক কাজই মানুষের প্রয়োজনের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। বর্তমানে প্রতিটি মানুষ তার সঞ্চিত অর্থ ব্যাংকে জমা রাখতে প্রায় বাধ্য হয়ে পড়ে। এই প্রয়োজনীয়তাটা না থাকলেতো কারেন্ট একাউন্টে অর্থ জমা রাখাকে জায়েয বলার কোন প্রয়োজনই হতো না। অনুরূপভাবে আন্তর্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্যে সকল ব্যবসায়ীই ব্যাংকের মুখাপেক্ষী। মুদ্রা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত করার জন্য ব্যাংক ছাড়া অন্য কোন নিরাপদ পথ নেই। এছাড়াও মানুষের সঞ্চয় সমূহ একত্রিত করে রাষ্ট্রের শিল্প ও বাণিজ্যে খাটানোটাও একটি ভাল লক্ষ্য। এসব জায়েয বা বৈধ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো বাস্তবায়নে সুদের যে পথ অবলম্বন করা হয়েছে তা হারাম এবং ক্ষতিকর। অতএব, এমন একটি পথ বের করতে আমরা দায়বদ্ধ যার মাধ্যমে সুদের হারাম থেকে মুক্ত থেকে এসব বৈধ উদ্দেশ্যগুলো অর্জন করা যায়। তাই হযরত আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ ইউসুফ বিন্নুরী রহ. লেখেন, "ব্যাংকের প্রচলিত ব্যবস্থা 'সুদ' ছাড়া চলতে পারে না। তাই ব্যাংকের বিকল্প ব্যবস্থা মুদারাবাহ, ওয়াকালাহ,

শিরকাহ ইত্যাদীর উপর গবেষণা করা দরকার। যা সুদ ছাড়া চলতে পারে এবং আধুনিক অর্থনীতির বিভিন্ন সমস্যাগুলো যার মাধ্যমে সমাধান হতে পারে। এ সিদ্ধান্ত আপনাদের পক্ষে দেয়া সম্ভব নয় যে, বৃহৎ পরিসরে ব্যবসা অথবা আমদানী রপ্তানী সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেবেন অথবা বর্তমান প্রজন্ম তা মেনে নিয়ে দেশের অভ্যন্তরেই কেবল ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে। ইসলামী ফিকহের আলোকে গবেষণা করে এসব সমস্যার সমাধান বের করতে আপনারা অবশ্যই বাধ্য। যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এই ভুল বুঝে না বসে যে, বর্তমান যুগে ইসলাম সমস্যাসমূহের সমাধানে ব্যর্থ।" –(মাসিক বাইয়্যিনাত, জুমাদাল উলা ১৩৮৩ হিঃ, অক্টোবর ১৯৬৩ ইং, পৃঃ২)

তিনি আরো লিখেন, "একথা স্পষ্ট যে, সভ্যতার যত উন্নতি হবে ততই নিত্য নতুন সমস্যার সৃষ্টি হবে এবং অনৈসলামিক রাষ্ট্রসমূহের সাথে যতই সম্পর্ক ও যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে ততই নতুন সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। মুসলমানদের মধ্যে বিশাল একটি শ্রেণী এখনো বিদ্যমান আছেন যারা ব্যবসা বাণিজ্য ও দ্বিপাক্ষিক লেনদেনসমূহে ইসলামী মূলনীতির আলোকে তাদের সমস্যাগুলোর সমাধান দেয়া হলে এবং ফিক্বহী নিয়মনীতির আলোকে এমন কর্মপদ্ধতি বাতলে দেয়া হলে যা অনুসরন করলে শরয়ী সীমারেখা লঙ্ঘন করার প্রয়োজন হবে না –তবে তারা তা সাদরে গ্রহণ করতে এবং সর্বান্তকরনে এ কর্মপদ্ধতি অনুসরন করতে দ্বিধা করবে না। মোট কথা, আমাদের পূর্বসূরীরা যেভাবে বিভিন্ন নামে দৈনন্দিন নিত্যনতুন সমস্যাসমূহ একত্রিত করে ইসলামী ফিক্বহের আলোকে এর সমাধান দিয়েছেন তেমনিভাবে বর্তমান সময়ের উলামায়ে কেরাম ও ফিক্বহ বিশারদদেরও দায়িত্ব হচ্ছে ইসলামী ফিক্বহের আলোকে নিত্যনতুন সমস্ত বিষয়গুলোর সমাধান অনুসন্ধান করা।"

(বাইয়্যিনাত, রবিউল আউয়াল ১৩৮৩ হিঃ, আগষ্ট ১৯৬৩ ইং, পৃঃ৩)

ডক্টর ফজলুর রহমানের নেতৃত্বাধীন 'ইদারায়ে তাহক্বীক্বাতে ইসলামী' তৎকালীন সময়ে ব্যাংকের সুদকে হালাল করার চেষ্টায় নিমগ্ন ছিল। হযরত বিন্নুরী রহ. এক জায়গায় তার উল্লেখ করে বলেন, "বহিঃরাষ্ট্রসমুহে অনৈসলামিক জীবনপদ্ধতি প্রচলিত। যার ভিত্তি হলো সুদ এবং বীমা'র

উপর। তাছাড়া ব্যাংক ব্যাতিরেকে কোন ব্যবস্থা আজ চলতে পারে না। অতএব, আমাদের এমন একটি ব্যবসাপদ্ধতির কথা চিন্তা করতে হবে এবং এমন একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করতে হবে যা সুদ ছাড়া চলতে পারে। মুদারাবাহ ও শিরকাহ'র মূলনীতিগুলো হবে যার ভিত্তি। 'ব্যাংকের সুদকে ইসলামে নিষিদ্ধ সুদ নয়' এ কথা প্রচার করে ব্যাংকের সুদকে জায়েয করার প্রচেষ্টা পরিহার করতে হবে।" –(বাইয়্যিনাত, রবিউস সানী ১৩৮৪ হিঃ, সেপ্টেম্বর ১৯৬৪ ইং, পৃঃ১৩)

'ইসলাম আওর জাদীদ মায়ীশাত ওয়া তিজারাত' নামক কিতাবে আমি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছি যে, সুদী ব্যাংক যেসব কাজ করে তার প্রত্যেকটির বিকল্প পেশ করা আমাদের দায়িত্ব নয়। যেমন– ঋনের বেচা কেনা, Derivatives (উদ্ভুত অর্থ) Ges Futures (ভাবীপণ্য) ইত্যাদি।

আমি সেখানে উল্লেখ করেছি "(২) যেহেতু সুদ নিষিদ্ধ করলে এর প্রভাব সম্পদের পুরো বন্টন ব্যবস্থার উপর পড়বে সেহেতু এই আশা করা ভূল হবে যে, সুদের শরয়ী বিকল্প কার্যকর করার পরও সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের মুনাফার হার তাই থাকবে যা সুদী ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকাকালে পাওয়া যায়। বাস্তবতা হচ্ছে, ইসলামী আহকাম সঠিকভাবে কার্যকর করতে গেলে এই পরিমাণসমূহে বড় ধরনের মৌলিক পরিবর্তন আসতে পারে। বরং বলা যায়, এই পরিবর্তন একটি আদর্শ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার জন্য কাম্য।

(৩) আজকাল ব্যাংক যেসব সেবা প্রদান করে থাকে তার মধ্যে মানুষের বিক্ষিপ্ত সঞ্চয়সমূহকে একত্রিক করে শিল্প ও বাণিজ্যে ব্যবহার করার মাধ্যম হিসেবে কাজ করার বিষয়টি শুধু কল্যাণকরই নয় বরং বর্তমান অর্থব্যবস্থায় খুবই জরুরীও বটে। এসব সঞ্চয় যদি প্রত্যেকের নিজের কাছেই থেকে যেত তাহলে শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি সাধনে তা কোন কাজে আসত না। এটা স্পষ্ট যে, অতিরিক্ত সম্পদ অলস পড়ে থাকা শরয়ী দিক থেকে মোটেই কাম্য নয়। সাধারণ বিবেক এবং অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকেও এটাকে কখনো মঙ্গলজনক বলা যায় না।

এসব সঞ্চয়কে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধিতে খাটানোর জন্য ব্যাংক যে পথ অবলম্বন করে তা হল 'ঋণ'। সুতরাং এসব প্রতিষ্ঠান পুঁজিপতিদের

উৎসাহিত করে যেন তারা নিজেদের মুনাফার জন্য অন্যের আর্থিক মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে এমনভাবে ব্যবহার করে যাতে ঐ মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের অধিকাংশই তাদের কাছে থেকে যায় এবং পুঁজির আসল মালিকরা প্রবৃদ্ধির যথাযথ সুযোগ না পায়।

অতএব, প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ব্যাংক এমন একটি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় যা শুধু আর্থিক লেনদেন করে। এই অর্থ দ্বারা পরিচালিত কারবারে কী পরিমাণ লাভ হল এবং কে লাভবান হল কে ক্ষতিগ্রস্থ হল তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। ইসলামী আহকাম অনুযায়ী ব্যাংক শুধু আর্থিক লেনদেনের ভূমিকায় সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না; বরং একে এমন একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হয় যা অনেক মানুষের সঞ্চয়কে একত্রিত করে সরাসরি কারবারে বিনিয়োগ করবে।

যে সকল পুঁজিপতির সঞ্চয় কারবারে খাটানো হয়েছে তারা সবাই সরাসরি ঐ কারবারের এবং কারবারে লাভ ক্ষতির সমানভাবে অংশীদার হবেন। অতএব, সুদী ব্যাংকের বিকল্প হিসেবে যে পদ্ধতি পেশ করা হবে তার ব্যাপারে এই অভিযোগ উথাপন করা অনুচিত হবে যে, ব্যাংক তার পূর্ব স্বকীয়তা হারিয়ে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। কেননা, যেজন্য বিকল্প ব্যবস্থা অনুসন্ধান করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল তা এ পদ্ধতি ছাড়া পূরণ করা সম্ভব নয়।"

(ইসলাম আওর জাদীদ মায়ীশাত ওয়া তিজারাত, পৃঃ ১৩৩-১৩৪)

এখন আলোচ্য বিষয় হলো, বিকল্প পেশ করার প্রচেষ্টা চালানো উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব কি না? এ ব্যাপারে কুরআন ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ থেকে দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়। কুরআনে করীমে আল্লাহ পাক حرم الربوا পরে أحل الله البيع আগে ইরশাদ করেছেন। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এক সা' খেজুরকে দুই সা' খেজুরের বিনিময়ে বিক্রয় করাকে সুদ হিসেবে সাব্যস্ত করে এর হারাম হওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন তখনই এর বিকল্প পথও বাতলে দিয়েছেন। আর তা এভাবে যে, প্রথমে দুই সা' খেজুর মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রয় করো পরে ঐ মুদ্রা দিয়ে এক সা' উত্তম খেজুর ক্রয়

করো। হাদীসটির বিস্তারিত বিবরণ "কৌশলের শরয়ী অবস্থান" শিরোনামে আলোচিত হবে।

আল্লামা সারাখসী রহ. একটি ঘটনার এভাবে বর্ননা করেছেনঃ

عَنْ أَبِي جَبَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَبدَاللهِ بنَ عُمَرَرضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقُلْتُ: إِنَّا نَقْدَمُ أرضَ الشَّامِ وَمَعَنَا الْوَرقُ الثِّقَالُ النَّافِقَةُ وَعِنْدَهُمْ الْوَرقُ الخِفَافُ الكَاسِدَةُ. أَفَنَبْتَاعُ وَرَقَهُمُ العَشَرَةَ بِتِسْعَةٍ وَنِصْفٍ فَقَالَ: لاَتَفْعَلْ، وَلَكِنْ بِعْ وَرَقَكَ بِذَهبٍ، وَاشْتَرِ وَرَقَهُم بِالذَّهبِ وَلاَتُفَارِقْهُ حَتّى تَسْتَوْفِي وَإنْ وَثَبَ فَثِبْ مَعَه.

"হযরত আবু জাবালাহ রহ. বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাজি.কে জিজ্ঞেস করলাম, আমরা যখন শাম সফরে যাই তখন আমাদের কাছে ভারী রৌপ্যমুদ্রা (দিরহাম) থাকে যা বাজারে খুব বেশী চলে। আর তাদের কাছে হালকা রৌপ্র মুদ্রা (দিরহাম) থাকে যা কম চলে। অতএব আমরা কি তাদের দশ দিরহাম আমাদের সাড়ে নয় দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করতে পারবো? তিনি বললেন, না! তোমরা এরূপ করো না। তবে তোমরা তোমাদের মুদ্রা স্বর্ণের বিনিময়ে বিক্রি করো এবং তাদের রৌপ্যমুদ্রা স্বর্ণ দিয়ে কিনে নাও এবং হস্তগত না হওয়া পর্যন্ত পৃথক হয়ো না। যদি সে দ্রুত উঠে যায় তোমরাও তার সাথে দ্রুত উঠে যাও"।

এই ঘটনার উপর পর্যালোচনা করতে গিয়ে শামসুল আইম্মাহ সারাখসী রহ. বলেন,

وَفِيهِ دَلِيلُ رُجُوعِ إبنِ عُمَرَ رضي الله عنه عَنْ قَولِه فِي جَوَازِ التَّفَاضُلِ كَمَا هُوَ مَذهَبُ إبْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما وَأَنَّه لاَقِيْمَةَ لِلْجَوْدَةِ فِي النُّقُودِ، وأنَّ المُفتِيَّ إذَا تَبَيَّنَ جَوابَ مَا سُئِلَ عَنْهٌ فَلاَ بَأسَ أنْ يُبَيِّنَ لِلسَّائِلِ الطَّرِيقَ الَّذِي يَحْصُلُ بِه مَقصُودُه مَعَ التَّحَرُّزِعَنِ الحَرَامِ، وَلاَيَكُونُ هذَا مِمَّا هُوَ مَذْمُومٌ مِن تَعْلِيمِ الحِيَلِ بَل هُوَ إقْتِدَاءٌ بِرَسُولِ اللهِ صَلّى الله عليه وسلّم حَيْثُ

قَالَ لِعَامِلِ خَيْبَرَ: هَلاَّ بِعْتَ تَمرَكَ بِسِلعَةٍ ثُمَّ اشْتَرَيْتَ بِسِلعَتِكَ هذاالتَّمر!

—(المبسوط للسرخسي ج:١٦ص:٢٧٠)

"এই ঘটনা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, কম বেশী করে বেচাকেনা করা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাজি.-এর যে মত ছিল হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাজি. তা থেকে সরে এসেছেন। এটাও প্রমাণিত হয় যে, মুদ্রা উত্তম ও নিম্নমানের হওয়াতে কোন তারতম্য হয় না। আরো প্রমাণিত হয় যে, মুফতী সাহেবানদের কাছে কেউ কোন প্রশ্ন করলে তার সুস্পষ্ট উত্তর দেয়া এবং এমন পদ্ধতি বাতলে দেয়াতে কোন দোষ নেই যা দ্বারা সে হারাম থেকে বেঁচে নিজের উদ্দেশ্য অর্জনে সক্ষম হয়। এটা নিন্দনীয় কৌশল শেখানোর পর্যায়ে পড়ে না; বরং এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরনই হয়।" (মাবসূতে সারাখসী, খন্ডঃ১৬, পৃঃ২৭০)

এই একই কথা হযরত আল্লামা ইবনুল হুমাম রহ.ও বলেছেন। তিনি এর সাথে আরো সংযুক্ত করে বলেছেন, وَإِنَّمَا الْمَحْظُورُ تَعْلِيمُ الْحِيَلِ الْكَاذِبَةِ لإِسْقَاطِ الْوُجُوبَاتِ "যেসব কৌশল মিথ্যা হয় এবং ওয়াজিবকে বাদ দেয়ার লক্ষ্যে গ্রহণ করা হয় কেবল সেগুলোই নিষিদ্ধ"।

(ফাতহুল ক্বাদীর, খন্ডঃ৭, পৃঃ১৩৭, ছাপাঃ দারুল ফিকর)

এটা ঠিক যে, উলামায়ে কেরাম কুরআন ও সুন্নাহ'র আলোকে শুধু মূলনীতিগুলো বাতলে দেবেন। বর্তমানে বিদ্যমান জটিল জীবনব্যবস্থার সব বিষয়ে উলামায়ে কেরামের দক্ষতার আশা করাটাও বাস্তবতা বিবর্জিত। অতএব পদ্ধতি হচ্ছে, উলামাদের নির্দেশিত মূলনীতি অনুসারে সকল ধারার লোকেরা তাদের নিজস্ব কর্মপন্থা নির্ধারণ করবে। উলামায়ে তাদের তদারকি করবেন। তারা লক্ষ্য রাখবেন যেসব কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হয়েছে তাতে শরীয়তের কোন হুকুম লঙ্ঘিত হচ্ছে কি না। উলামাদের এ দায়িত্ব আদায়ে অবহেলা করা মোটেই সমীচীন নয়। হযরত আল্লামা ইউসুফ বিন্নুরী রহ. বলেন, "ইসলামী ও ইউরোপীয় সভ্যতা সংস্কৃতির সংঘর্ষের এই সময়ে পৃথিবী সম্পূর্ণরূপে দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। একদিকে, সেসব উলামায়ে কেরামের অবস্থান যারা দ্বীন ও

শরীয়তের উপর নিজেদের এমন দৃঢ়ভাবে নিবিষ্ট রেখেছেন যে, বর্তমান সময়ে ইলম ও দ্বীনের খেদমতের জন্য যেসব মাধ্যম ও চাহিদার প্রচন্ড প্রয়োজন সেগুলো থেকেও সম্পূর্ণরূপে বিমূখ। অন্যদিকে সেসব উদারপন্থী নাস্তিকদের অবস্থান যারা বর্তমান সময়ের জটিল বিষয়গুলো সম্পর্কে সম্যক অবগত হলেও ধর্মীয় জ্ঞান, ঈমানী অন্তর্দৃষ্টি ও সঠিক দ্বীনি ইলম না থাকার কারণে এসব জটিলতা সঠিকভাবে সমাধানে অপারগ। অতএব, সন্দেহ নেই এই উভয় শ্রেণীই উম্মতের চাহিদা পূরণে অক্ষম। এসব জটিল ও আধুনিক মাসায়িলগুলোর সমাধান তাদের কোন এক শ্রেণীর হাতে ছেড়ে দিয়ে আশান্বিত হওয়া বিরাট ভূল ও বোকামী ছাড়া আর কিছুই নয়। এতে না দ্বীনের কোন ফায়দা হবে আর না জনসাধারণের তৃষ্ণা নিবারণ হবে।" (বাইয়্যিনাত, সফর ১৩৮৪ হিঃ, পৃঃ১৫,১৭)

প্রচলিত ব্যাংকসমূহের বিকল্প পেশ করা এমন কোন নতুন বিষয় নয় যে, তা আজ প্রথমবারের মতো আলোচিত হচ্ছে। আমাদের বুযুর্গানেদ্বীন এ ব্যাপারে অনেক প্রস্তাব পেশ করেছেন এবং এর জন্য অনেক প্রচেষ্টাও চালিয়েছেন। আমার শ্রদ্ধাভাজন পিতা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ. তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআনে লিখেন, "এখানে প্রথম কথা হচ্ছে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে ব্যাংকিংয়ের মূলনীতিসমূহের দিকে তাকালে সাধারণভাবে বুঝা যায় যে, ব্যাংকিংয়ের মূলভিত্তি হচ্ছে সুদ। এটা ছাড়া ব্যাংক চলতে পারে না। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণভাবে ভুল। সুদ ছাড়াও ব্যাংক সমানভাবে চলতে পারে; বরং এরচেয়েও অধিক উত্তম ও কার্যকরভাবে চলতে পারে। তবে এর জন্য প্রয়োজন শরীয়তের কিছু বিশেষজ্ঞ আলেম এবং ব্যাংকিং সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ কিছু ব্যাক্তির পারস্পরিক পরামর্শ ও সহযোগীতা। এভাবে তারা ব্যাংকিংয়ের কিছু মূলনীতি তৈরী করতে পারলে সফলতা বেশী দুরে নয়। শরয়ী মূলনীতির ভিত্তিতে যেদিন ব্যাংকিং সিস্টেম প্রতিষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ সেদিন দুনিয়াবাসী প্রত্যক্ষ করতে পারবে যে, দেশ ও জাতির স্বার্থে এটা কত কল্যাণকর। সুদবিহীন ব্যাংকিং সিস্টেম যে মূলনীতির উপর পরিচালিত হবে এখানে তার আলোচনার সুযোগ নেই।"

এর টিকায় তিনি আরো লিখেন, "আমি অধম কিছু উলামায়ে কেরামের পরামর্শে বেশ কিছুদিন পূর্বে সুদবিহীন ব্যাংকিংয়ের খসড়াও প্রস্তুত

করেছি। ব্যাংকিং বিষয়ে অনেক অভিজ্ঞ ব্যাক্তিবর্গ এটাকে কার্যকর বলে সম্মতিও প্রদান করেছেন। অনেকে এটাকে সামনে রেখে কাজও শুরু করতে চেয়েছেন। তবে সাধারণ ব্যবসায়ীদের মনযোগ আকৃষ্ট না হওয়া ও সরকারের পক্ষ থেকে অনুমোদন না পাওয়ায় তা বাস্তবায়ন করা যায়নি।"فإلى الله المشتكى"। (মা'আরিফুল কুরআন, খন্ডঃ১, পৃঃ৬৭৮)

হযরত আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ ইউসুফ বিন্নুরী রহ. এর বক্তব্য আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। যেখানে তিনি সুদী ব্যাংকিংয়ের বিকল্প ব্যবস্থার উপর খুবই গুরুত্বারোপ করেছেন। এখানেই শেষ নয়। যেমনটি আমি ভূমিকাতে উল্লেখ করেছি যে, জনাব আহমদ এরশাদ সাহেব তাঁর ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করার পর হযরত রহ. খুবই খুশি হয়েছিলেন। যদিও আহমদ এরশাদ সাহেব পশ্চিমা ভাবধারার একজন আধুনিক শিক্ষিত ব্যাক্তি ছিলেন। কিন্তু তাঁর মধ্যে সুদবিহীন ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠার আগ্রহ দেখে হযরত রহ. তাঁকে বেশ উৎসাহিত করেছিলেন। এমনকি তাঁর ব্যাংকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পর্যন্ত হযরত রহ. অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং 'বাইয়্যিনাত'এ এ বিষয়ে একটি সম্পাদকীয় লিখেছিলেন যার শিরোনাম ছিল "হতাশার অন্ধকারসমূহের মাঝে আশার একটি আলো"। তিনি সেখানে লিখেন, "অত্যন্ত খুশির বিষয় হল, পাকিস্তানের একজন যোগ্য ও সৎ যুবক শেখ আহমদ এরশাদ এম.এ যিনি বেশ কয়েক বছর দেশের ভিতরে ও বাইরে থেকে ব্যাংকিং বিষয়ে পরিপূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করে ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও সুদী কারবারের ধ্বংসাত্মক দিক এবং ইসলামী অর্থব্যবস্থার কল্যাণকর দিকগুলোর উপর 'সূদবিহীন ব্যাংকিং' নামে একটি গ্রহনযোগ্য কিতাব রচনা করেছেন। গত বছর কিতাবটির ইংরেজী সংস্করণ এবং এ বছর উর্দূ সংস্করণ বের হয়েছে। তিনি The Co-operative Investment &Finance Corporation Limited নামে একটি প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপন করেন। যাতেকরে খুব দ্রুত ইসলামী ব্যবস্থার অভিজ্ঞতাও সামনে চলে আসে। আলোচিত ব্যাক্তি সবধরনের ধন্যবাদ ও উৎসাহ পাবার যোগ্য এবং পাকিস্তানের জন্য গর্বের বিষয় যে, পৃথিবীর অন্যসব ইসলামী দেশসমূহের আগে পাকিস্তানে ইসলামী ব্যবস্থার সম্মানে তিনি সময়োপযোগী এই পদক্ষেপ গ্রহণ করে সুন্নাতে হাসানা'র ভিত্তি রচনা করেছেন। এখন পাকিস্তানের কর্মজীবি মানুষের উচিৎ, মন খুলে তাঁকে

সহযোগীতা ও উৎসাহিত করা। আর এই সহযোগীতা হবে تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى এর সত্যায়ন। আর যারা, ডিপোজিট হিসেবে ব্যাংকসমূহে সুদবিহীনভাবে কোটি কোটি টাকা ফেলে রেখেছেন তাদের উচিৎ, এর একটি বড় অংশ এই কর্পোরেশনে খাটিয়ে উভয় জাহানের স্বার্থকতা অর্জন করা। এই সময়ে কায়রোর প্রসিদ্ধ ব্যক্তি উস্তায মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল আরবী বর্তমান ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও ইসলামী অর্থব্যবস্থার উপর আরবীতে المعاملات المصرفية الحاضرة ورأي الإسلام فيها নামে একটি গবেষণামূলক ও বিশ্লেষণধর্মী কিতাব রচনা করেছেন। একই বিষয়ের উপর مجمع البحوث الإسلامية এর কায়রো সম্মেলনে আরবীতে একটি জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। যেখানে সম্পদ কুক্ষিগত করার খারাপ দিকগুলি এবং বিপরীতে ইসলামী অর্থব্যবস্থার সৌন্দর্যসমূহের উপর সারগর্ভ আলোচনা করা হয়েছে।

মোট কথা, বর্তমান সময়ের এসব প্রচেষ্টাসমূহ অবশ্যই হতাশাচ্ছন্ন মেঘমালার মাঝে আনন্দ ও সফলতার একটি চমক এবং প্রতিক্ষিত গায়েবী সাহায্যের ভূমিকা। আল্লাহ পাক এ নিষ্ঠাবান লোকগুলোর প্রচেষ্টাকে সফল ও ফলপ্রসু করে দিন। শুধু উম্মতে মুহাম্মদীয়াই নয়; বরং পুরো মানবতা যাতে তাদের বরকতসমূহ থেকে উপকৃত হয়ে পুঁজিবাদ ও সুদের অভিশাপ থেকে মুক্তি পায় এবং দুনিয়া-আখেরাতে মুসলমানদের মুখ উজ্জ্বল হয়।"

(মাসিক বাইয়্যিনাত, সফর ১৩৮৫ হিঃ, জুলাই ১৯৬৫ ইং, পৃঃ ৮, ৪০)

প্রকাশ থাকে যে, হযরত বিন্নুরী রহ. শুধু এ কথার উপর আনন্দ প্রকাশ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন যে, সুদবিহীন ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় একটি প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। নয়তো হযরত রহ. এরশাদ সাহেবের যে কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা আমার সামনে আছে। এতে এমন কিছু বিষয় আছে যেগুলো শরয়ী দৃষ্টিকোণে প্রশ্নবিদ্ধ।(যেমন, ডিপোজিটরদের লোকসান থেকে রক্ষা করা যেমনটি ঐ কিতাবের ৮১ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে)। এটা স্পষ্ট যে, হযরত রহ. এসব প্রশ্নবোধক কথার সমর্থন করতে পারেন না। কিন্তু এসব প্রশ্নবোধক কথার কারণে তার মূল লক্ষ্যকে ভুল বুঝে তার বিরুদ্ধে কোন তৎপরতাও তিনি চালাননি। হযরত

রহ. তাঁর যথাযোগ্য অবস্থান থেকে চিন্তা করেছেন যে, পরবর্তীতে সংশোধনের সুযোগতো থাকছেই। যেহেতু সুদবিহীন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা একটি উত্তম পদক্ষেপ তাই তাকে উৎসাহিত করতে হবে। তিনি হয়তো এসব আপত্তিকর বিষয়ের সংশোধনও করেছেন। অন্যদিকে আমার শ্রদ্ধাভাজন মহান পিতা রহ.ও এই ব্যাংককে উৎসাহিত করেছেন। কিন্তু তিনি প্রকাশ্য ঘোষণা দেয়ার পূর্বে অন্যান্য উলামাদের সাথে *মতবিনিময় করাটা সমীচীন* মনে করেছিলেন। তিনি আমার মুহতারাম বড় ভাই হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ রফী' উসমানী সাহেবকে নির্দেশ দিলেন, এ ব্যাপারে একটি প্রশ্নপত্র তৈরী করে উলামাদের কাছে পাঠানো হোক। অতএব, তিনি প্রশ্নপত্র পাঠিয়েও ছিলেন যা 'মাসিক আল হক' এর এপ্রিল ১৯৬৬ ই সংখ্যায় ৫৫নং পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল।

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ রশীদ আহমদ রহ.ও 'আহসানুল ফাতাওয়া' নামক কিতাবে এমন কিছু প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করেছেন যেখানে সুদবিহীন ব্যাংক ব্যবস্থার কর্মপদ্ধতি নির্ধারন করা হয়েছে। (দেখুন আহসানুল ফাতাওয়া, খন্ডঃ৭, পৃঃ১১৪-১১৫)।

হযরত মাওলানা মুফতী ওয়ালী হাসান রহ. লিখেন, "এ দু'টি কথার সমাধান হল, সুদবিহীন ব্যাংকের প্রচলন করতে হবে। যার ভিত্তি হবে শিরকাহ ও মুদারাবাহ। এতে পুঁজির সংরক্ষণের সাথে সাথে বৈধভাবে সম্পদের বৃদ্ধি ঘটবে। ইসলামের অর্থব্যবস্থাকে যারা ভালভাবে অধ্যয়ন করেছে তারা এটা বুঝতে পারবেন যে, ইসলাম সম্পদ কুক্ষিগত করা সমর্থন করে না। টাকা এক জায়গায় জমা হবে এবং ব্যবসা ছাড়াই তা লভ্যাংশ অর্জিত হবে এবং টাকা থেকে টাকা অর্জন করা ইসলামের দৃষ্টিকোনে শুদ্ধ নয়। যারা পুঁজির বৃদ্ধি ঘটাতে চান তাদের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যের মহাসড়ক খোলা আছে। ব্যবসাতে পুঁজিপতিরও লাভ যে, পুঁজির বৃদ্ধি ঘটে। যাকাত সম্পদকে শেষ করে না। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার দেশ ও জাতির জন্যও মঙ্গলজনক। এতে পুঁজি মানুষের সিন্দুক থেকে বের হয়ে হাটে বাজারে পৌছবে, শিল্প ও কলকারখানার প্রসার ঘটবে, শ্রমিক ও পেশাজীবিদের কর্মসংস্থান হবে। প্রকাশ থাকে যে, ইসলাম তার অর্থব্যবস্থার ভিত্তি রচনা করেছে যাকাতের উপর। বিপরীতে পুঁজি

ব্যবস্থার মেরুদন্ড হল সুদ। কুরআনে কারীম খুব সংক্ষেপে ইসলামী অর্থব্যবস্থার বর্ণনা এভাবে দিয়েছে كي لايكون دولة بين الأغنياء منكم

(সুরা হাশর, ২৮পারা)

আয়াতে কারীমার সারমর্ম হল, এসব ব্যয়ের খাত (যা ইতোপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে) এজন্যই বলা হয়েছে যাতে করে সবসময় এতিম, গরীব, নিঃস্ব এবং সাধারণ মুসলমানদের খোঁজ খবর হতে থাকে। আর যাতে সাধারণ ইসলামী প্রয়োজনসমূহ সম্পাদিত হয়। এ সম্পদ যাতে কিছু সম্পদশালী ব্যাক্তির কাছেই বারবার ঘুরে ফিরে গিয়ে তাদের তালুকে পরিণত না হয়। এতে পুঁজিপতিরা নিজেদের সিন্দুককে স্ফীত করবে আর গরীব না খেয়ে মরবে। সুদবিহীন ব্যাংকের বাস্তবায়ন শুধু কল্পনা নয়; বরং একটি বাস্তবতা যাকে খুব সহজেই কার্যকর করা যায়।"

(বীমায়ে যিন্দেগী, পৃঃ ৪৫-৪৬)

এখানে হযরত মুফতী সাহেব রহ. সঞ্চয়ের দিক থেকে ব্যাংক সমুহকে শিরকাহ ও মুদারাবাহ'র ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। সাথে সাথে সঞ্চিত অর্থকে ব্যবসায় খাটানোর প্রস্তাবও করেছেন। যেখানে সবধরনের ব্যবসাই অন্তর্ভূক্ত।

টিকায় তিনি আরো লিখেন, "মাসিক আল মুসলিমুন যা জেনেভা থেকে জনাব সাঈদ রমজানের সম্পদনায় প্রকাশিত হয় তাতে সুদবিহীন ব্যাংকের উপর প্যারিসের ড. হামিদুল্লাহ সাহেবের একটি প্রবন্ধ ছাপানো হয়েছে। যেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, হায়দারাবাদে একবার এর বাস্তব পরীক্ষা চালানো হয়েছিল এবং তা অনেকটা সফলতাও লাভ করেছিল।"

এসব আলোচনার সার কথা হল, সুদী ব্যাংকসমূহের কর্মপদ্ধতিকে পাল্টিয়ে এগুলোকে শরয়ী মূলনীতির উপর ঢেলে সাজানোর জন্য বিকল্প ব্যবস্থা পেশ করা কুরআন-সুন্নাহ এবং আমাদের আকাবিরদের চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতির পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন ছাড়া আর কিছু নয়। এটাকে ইসলামী মদ বা ইসলামী জুয়া বলে প্রত্যাখ্যান করার কোন সুযোগ নেই।

সুদবিহীন ব্যাংকিংয়ের ব্যাপারে আমার অবস্থান

পূর্বের বিস্তারিত আলোচনার পর এখন ঐসব সুক্ষ্ম ইলমী বিষয়গুলোর উপর আলোচনা করা দরকার, যেগুলো সমালোচনার জন্য উত্থাপন করা হয়েছে। তবে এসব সুক্ষ্ম ইলমী বিষয়ের উপর আলোচনা শুরু করার পূর্বে সুদবিহীন ব্যাংকিং তথা ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ব্যাপারে আমার অবস্থানটা পরিস্কার করা দরকার। কেননা আলোচ্য সমালোচনামূলক লেখাগুলোতে আমার অনেক প্রবন্ধ ও বক্তব্যের পুরো যোগসূত্র ও প্রেক্ষাপট উল্লেখ না করে শুধু কিছু নির্বাচিত অংশের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে এবং তারা নিজেদের মত করে আমার উদ্দেশ্যের ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছেন; যা জনমনে ভুল ধারণা সৃষ্টি করেছে। অনেকে আমার অনেক প্রবন্ধ যা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছিল তার কিছু অংশকে একত্রিত করে বার বার এর উদ্ধৃতি দিয়ে এ কথা বুঝানোর চেষ্টা করেছেন যে, আমি নিজেই সুদবিহীন ব্যাংক সমূহের প্রচলিত পদ্ধতিকে নাজায়েয বলে আসছি। অথচ ঐসব প্রবন্ধের লেখক এখনো জীবিত আছেন; বরং মাত্র একটি টেলিফোন কলের দুরত্বে অবস্থান করছেন, আর এমনও নয় যে, তাদের সাথে কথা বার্তাও বন্ধ হয়ে গেছে, তাই আমার কাছ থেকে উদ্দেশ্য সম্পর্কে জেনে না নিয়ে নিজেরা এর ভুল ব্যাখ্যা দেয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। যাই হোক, যেহেতু এসব লেখার ভুল ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে তাই এখানে আমার নিজের অবস্থান পরিপূর্ণভাবে পরিস্কার করে দেয়া উচিৎ।

প্রথমেই বুঝা দরকার ব্যাংকিংয়ের বিকল্প পেশ করতে গিয়ে সাধারণভাবে বলা হয়েছে যে, ব্যাংকগুলোকে শিরকাহ ও মুদারাবাহ'র ভিত্তিতে পরিচালনা করা উচিৎ। এর ব্যাখ্যা হল, ব্যাংকের কার্যক্রম দুই ভাগে বিভক্ত। একদিকে ব্যাংক জনসাধারণের অর্থ নিয়ে নিজের কাছে রাখে। অন্যদিকে এগুলোকে লাভজনক কাজে ব্যবহার করে। সুদী ব্যাংক সমূহে এই উভয় কাজই সুদের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। অর্থাৎ, ব্যাংক মানুষের কাছ থেকে সুদের ভিত্তিতে অর্থ সংগ্রহ করে আবার অন্যদেরকে সুদের ভিত্তিতে সেই অর্থ সরবরাহ করে। কিন্তু সূদবিহীন ব্যাংকসমূহে কার্যক্রমের প্রথমাংশ অর্থাৎ মানুষের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করা পরিপূর্ণভাবে মুদারাবাহ'র ভিত্তিতে হয়। (এ বিষয়ের উপর উত্থাপিত প্রশ্নসমূহের উপর সামনে জায়গামত পর্যালোচনা করা হবে)। আর

দ্বিতীয়াংশ অর্থাৎ অর্থকে লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করার জন্য ঐসমস্ত পথ অবলম্বন করা যেতে পারে যা শরীয়তসম্মত।

শুরু থেকে এখন পর্যন্ত আমার অবস্থান এটাই- যেহেতু সাধারণভাবে ব্যাংক জনসাধারণের সঞ্চয়কে একত্রিত করে ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের সরবরাহ করে তাই তাদের জন্যও সর্বোত্তম পন্থা হল এ কাজটি তারা শিরকাহ ও মুদারাবা'র নিয়মনীতির উপর করবে। কেননা এতে করে ইসলামী অর্থব্যবস্থার সেসব মহান উদ্দেশ্য অর্জিত হতে পারে যার মাধ্যমে সমাজে সম্পদের সুষম বন্টন ব্যবস্থায় ভাল প্রভাব পড়ে এবং এই ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর মুনাফার একটি যৌক্তিক অংশ ব্যাংকের মাধ্যমে জনগনের কাছে পৌছুতে পারে। এভাবে সম্পদের সুষম বন্টন ব্যবস্থায় এমন এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসতে পারে যা পুঁজিবাদী ও সমাজবাদী ব্যবস্থার মন্দ দিকগুলো থেকে পবিত্র হবে। আমি শুরু থেকেই এ কথা বলে আসছিলাম। এখনো বলছি। বিশেষত যখন আমি কোন ব্যাংকারকে সম্বোধন করি তখন কথাগুলো আরো গুরুত্বসহকারে বলি। আর যদি সরকারকে সম্বোধন করি তাহলে আরো জোরদারভাবে এর তাগিদ দেই। কেননা, উদ্দেশ্য হাসিলের যে উপকরণ তাদের হাতে রয়েছে তা অন্য কারো কাছে নেই।

শিরকাহ ও মুদারাবা'র বিপরীতে مرابحة موجلة মুরাবাহা মুয়াজ্জালাকে কম গুরুত্ব দেয়ার কারণ হল, মুরাবাহা মুয়াজ্জালা যদি সঠিকভাবে শরয়ী পদ্ধতিতে বাস্তবায়িত হয় তাহলে তা নিশ্চিতভাবে একটি জায়েয লেনদেন। কিন্তু এটা ঋণভিত্তিক লেনদেন হবার কারণে খরিদদারের যিম্মায় ঋণ সৃষ্টি করে। ঋণভিত্তিক লেনদেন শরয়ী দৃষ্টিতে জায়েয হলেও ইসলামের অর্থনৈতিক শিক্ষার সামগ্রিক চরিত্র হল- সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো ঋণভিত্তিক লেনদেনের উপর কম এবং লাভ লোকসানের ভিত্তিতে শিরকাহ বা অংশীদারী কারবারের উপর বেশী হবে। পুঁজিবাদের ঋণভিত্তিক লেনদেন এবং ইসলামের ঋণভিত্তিক লেনদেনের মধ্যেও আকাশ পাতাল পার্থক্য আছে। ইসলামের ঋণভিত্তিক লেনদেনসমূহের মধ্যে ঋণের বিক্রয়, হস্তগত হবার পূর্বে বিক্রয় এবং মুদ্রাবিনিময় ইত্যাদিতে এমন খোদায়ী বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে যা অর্থব্যবস্থাকে পুঁজিবাদের ধ্বংসাত্মক দিকসমূহ থেকে পবিত্র রাখে। এ কারণেই বর্তমানে পৃথিবীব্যাপী মন্দার যে

বিধ্বংসী থাবা বিস্তার লাভ করেছে তা শরীয়ত অনুযায়ী পরিচালিত সুদবিহীন প্রতিষ্ঠানসমূহকে খুব কমই প্রভাবিত করতে পেরেছে। এসব প্রতিষ্ঠানে বেশীর ভাগ মুরাবাহা' ইত্যাদির ঋণভিত্তিক লেনদেনসমূহের উপর কার্যক্রম পরিচালিত হয়। তবে তা শরয়ী বিধি-নিষেধের মধ্যে থাকার কারণে ঐসব ক্ষতি ও ধ্বংসাত্মক বিষয়ের মুখোমুখি হয়নি যা আমেরিকা ও ইউরোপের বড় বড় অর্থনৈতিক পরাশক্তিসমূহকে পর্যন্ত অন্তঃসারশুন্য করে দিয়েছে।

যাই হোক! একটি উত্তম অর্থনৈতিক কর্মকৌশলের প্রতি আহ্বান হিসেবেই শিরকাহ ও মুদারাবা'র উপর জোর দেয়া হয়েছে। ফিক্বহী বাধ্যবাধকতার কারণে নয়। তাই এর উদ্দেশ্য এটা নয় যে, লাভজনক খাতে পুঁজি বিনিয়োগ করার জন্য ব্যাংকগুলোর জন্য শিরকাহ ও মুদারাবাহ ছাড়া অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করা জায়েয নয়। ব্যাংক যখন জনসাধারনের 'মুদারিব' (শ্রমের বিনিময়ে অংশীদার) হয়ে যায় তখন শরীয়তের জায়েয সীমারেখার মধ্যে থেকে সব ধরণের ব্যবসা করা তার জন্য বৈধ। সুতরাং ব্যাংক যদি কারো সাথে শিরকাহ ও মুদারাবা'য় না গিয়ে সরাসরি ব্যবসা করে তাতে শরয়ী দিক থেকে কোন বাধা নেই। বরং ফিক্বহবিদগন বলেছেন, 'মুদারিব' এর মূল দায়িত্বই হলো সরাসরি বেচাকেনা করা। কাউকে মুদারাবা'র ভিত্তিতে অর্থ যোগান দেয়া মুদারিবের মূল কাজ নয়। তাই ফিক্বহবিদগণ বলেছেন, তার জন্য উচিৎ 'রাব্বুল মাল' বা পুঁজির মালিকের অনুমতি নেয়া। হেদায়া কিতাবে উল্লেখ আছে ঃ

"(وإذا صحت المضاربة مطلقة جاز للمضارب أن يبيع ويشتري ويوكل ويسافر ويبضع ويودع) لإطلاق العقد، والمقصود منه الاسترباح ولايتحصل إلا بالتجارة، فينتظم العقد صنوف التجارة وماهومن صنيع التجار.... (ولايضارب إلا أن يأذن له رب المال أويقول له: إعمل برأيك) لأن الشيء لايتضمن مثله لتساويهما في القوة فلا بد من التنصيص عليه أو تفويض المطلق إليه. (هداية مع فتح القدير جـ ٧ صـ ٤٢١ و٤٢٢)

অর্থাৎ, "শর্তহীন মুদারাবা যখন সঠিক হলো তখন মুদারিবের জন্য বেচাকেনা করা, কাউকে প্রতিনিধি বানানো, সরফ করা, কাউকে মূলধন হিসেবে দেয়া, কারো কাছে জমা রাখা ইত্যাদি সবই জায়েয। কেননা আসল উদ্দেশ্য হল মুনাফা অর্জন করা। ব্যবসা ছাড়া মুনাফা অর্জন করা যায় না। সুতরাং মুদারাবা সব ধরনের ব্যবসা এবং ব্যবসায়ীর সকল কর্মকান্ডকে অন্তর্ভূক্ত করবে।...... মুদারিবের এই অধিকার নাই যে, সে পুঁজির মালিকের সরাসরি অনুমতি বা পুঁজি মালিকের পক্ষ থেকে নিজের ইচ্ছামত কাজ করার ক্ষমতা পাওয়া ছাড়া মুদারাবা'র ভিত্তিতে অন্যকে পুঁজি হস্তান্তর করবে। কেননা কোন বস্তু তার সমান শক্তিসম্পন্ন অন্যকোন বস্তুকে আয়ত্তে নিতে পারে না। তাই পুঁজির মালিকের পক্ষ থেকে স্পষ্ট অনুমতি অথবা অর্পিত ক্ষমতা থাকতে হবে।"

(হেদায়া-ফাতহুল ক্বাদীর, খন্ডঃ৭, পৃঃ৪২১-৪২২)

অতএব, এই কথা কীভাবে বলা যাবে যে, মুদারিব হিসেবে কাজ করার পরও ব্যাংকের জন্য বৈধ পদ্ধতি শিরকাহ ও মুদারাবা'র মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং সরাসরি ব্যবসা করার কোন পদ্ধতি তার জন্য শরীয়তসম্মত নয়? ব্যবসায়িক লেনদেনের মধ্যে বেচাকেনা, মুরাবাহা (অর্থাৎ লাভের উপর বিক্রয়), ইজারা, استصناع ইস্তেস্না'(অর্থাৎ অর্ডার দিয়ে কিছু তৈরী করা) ইত্যাদি সবকিছুই অন্তর্ভূক্ত। শরীয়তে এমন কোন শর্ত নেই যে, মুদারিবকে পরেও মুদারাবাহ বা শিরকাহ ভিত্তিক লেনদেন করতে হবে। সুতরাং আমার যেসব বক্তব্য ও লেখায় ব্যাংকের পুঁজি গঠনের জন্য শিরকাহ ও মুদারাবা'র উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং মুরাবাহা ও ইজারা ইত্যাদির ব্যাপক ব্যবহারের সমালোচনা করা হয়েছে তার এই ব্যাখ্যা প্রদান করা কোনভাবেই ঠিক নয় যে, আমি শিরকাহ ও মুদারাবাহ ছাড়া ব্যাংকের জন্য অন্য সকল লেনদেনকে নাজায়েয মনে করি। দু'টি কথা সবসময় আমি একসাথেই বলি। একটি হল, সুদবিহীন ব্যাংকসমূহ পুঁজি গঠনের জন্য শিরকাহ ও মুদারাবা'র ভিত্তিতে দৃষ্টান্তমূলক পথ অবলম্বন করবে। দ্বিতীয়টি হল, এ দৃষ্টান্তমূলক পথ অবলম্বন করা বা শিরকাহ ও মুদারাবা'র পদ্ধতিসমূহ বাস্তবায়ন সম্ভব না হলে অন্যপথ যেমন- মুরাবাহা, ইজারা, সলম, ইস্তেস্না' ইত্যাদি পদ্ধতিসমূহ পরিপূর্ণ শরয়ী শর্তসহকারে অবলম্বন করা জায়েয। এতে কমপক্ষে এতটুকু লাভ

হবে যে, মানুষ সুদের হারাম থেকে বের হয়ে শরীয়তের জায়েয পরিসীমার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে।

বর্তমান সময়ে সারা পৃথিবী সুদের যে আগ্রাসী থাবায় আক্রান্ত, সেখানে এ সামান্য লাভটুকুও কম কিছু নয়। অর্থনৈতিক দিক থেকেও এর ফলাফল সুদী লেনদেনের তুলনায় অনেক উত্তম প্রমাণিত হয়। যেমনটি বর্তমান বৈশ্বিক মন্দায় স্পষ্ট হয়ে গেছে।

শিরকাহ ও মুদারাবা'র দৃষ্টান্তমূলক পদ্ধতির উপর জোর দিতে গিয়ে আমি এই শব্দও ব্যবহার করেছিলাম "মুরাবাহা, ইজারা ইত্যাদি মাধ্যমিক পদ্ধতি"। এটাও বলেছি "এ পদ্ধতিগুলোকে সাময়িক সময়ের জন্য ব্যবহার করা উচিৎ এবং এগুলোর উপর সন্তুষ্টচিত্তে বসে থাকা উচিৎ নয়"। কোন কোন সময় এর কিছু পদ্ধতিকে 'কৌশল' বলে আখ্যায়িত করেছি; যার অর্থ ছিল জায়েয কৌশল। এসব কথাগুলো এই ব্যবস্থাকে একটি দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থায় পরিণত করার লক্ষ্যে বলা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এটা ছিল না যে, মুদারাবা ও শিরকাহ ছাড়া বাকী সব পদ্ধতি নাজায়েয। এটাও উদ্দেশ্য ছিল না যে, এগুলো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জায়েয, সেই সময় অতিবাহিত হবার পর আপনাআপনি নাজায়েয হয়ে যাবে। কারণ, ফিক্বহে এমন কোন বিষয় নেই যা এক দুই বছরের জন্য জায়েয হয়ে পরবর্তীতে এমনিতেই নাজায়েয হয়ে যায়। জায়েয কিংবা নাজায়েয হওয়াটা ঐ লেনদেনের বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে। বেশীর চেয়ে বেশী এতটুকু বলা যায় যে, কিছু বিষয় এমন আছে যেগুলো জায়েয হওয়ার জন্য প্রয়োজনের শর্ত যুক্ত হতে হয়; যার কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। 'সাময়িক' কথাটি জায়েয-নাজায়েয হিসেবে নয়; বরং কর্মকৌশল হিসেবে বলা হয়েছে।

এর একটি উদাহরণ এভাবে দেয়া যায়, যেমন- বুযুর্গ ব্যক্তিবর্গ দ্বীনি মাদরাসাসমূহের ব্যাপারে পুরোপুরি নিষ্ঠার সাথে সমালোচনা করেন যে, মাদরাসাগুলোতে শিক্ষার মান নিম্নমুখী হচ্ছে, চরিত্র গঠনের দিকে বেশী মনোযোগ দেয়া হচ্ছে না, শিক্ষকেরা শুধু পাঠদান করেই ক্ষান্ত, ছাত্রদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং তাদের শিক্ষা ও চরিত্রের উন্নতিকল্পে যথেষ্ট মনোযোগ দেন না, ফলে শিক্ষাদান একটি গতানুগতিক কাজে পরিণত হয়েছে, মাদরাসাসমূহের কল্যাণকর দিক সংকুচিত হয়ে আসছে। এসব সমালোচনা যারা করেন তাদের ব্যাপারে এই ধারণা পোষন করা ভূল যে,

তারা মাদরাসার এই ব্যবস্থাকে নাজায়েয এবং শরীয়তবিরোধী মনে করেন।

ব্যবসা থেকে এর একটি উদাহরণ দেয়া যায়, যেমন- কোন ব্যবসায়ী বেশী মূল্যে পণ্য বিক্রয় করে। তার ব্যাপারে এই সমালোচনা করা সম্পূর্ণভাবে ঠিক যে, সে জনস্বার্থবিরোধী কাজ করছে। কিন্তু তার ব্যবসায় যদি হালাল জিনিসের বিক্রয় হয় এবং কোন শরয়ী দূর্বলতাও না থাকে তাহলে তার বিরুদ্ধে সমালোচনার অর্থ এটা নয় যে, তার ব্যবসা হারাম। বরং হারাম পণ্যের ব্যবসায়ীদের মোকাবেলায় তাকে অবশ্যই প্রাধান্য দিতে হবে। আল্লামা হিসকাফী রহ. 'দুররে মুখতার' কিতাবে এবং আল্লামা শামী রহ. এর ব্যাখ্যাগ্রন্থে ঐসব লোকদের প্রচন্ড সমালোচনা করেছেন, যারা কমমূল্যে কৃষকদের সাথে 'বাইয়ে সালাম' করে (অর্থাৎ আগে মূল্য পরিশোধ করে পণ্য একটি নির্দিষ্ট সময় পর নেয়)। তিনি বলেছেন, সরকারের উচিৎ এদের জন্য একটি উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণ করে দেয়া। (দেখুন 'দুররে মুখতার ও রদ্দে মুহতার' খন্ডঃ৫, পৃঃ ১৬৭-১৬৮, বাবুর রিবার পুর্বে)। কিন্তু কেউ তার এ মতামতের ব্যাখ্যায় একথা বলেননি যে, তিনি 'সালাম' কে হারাম এবং নাজায়েয বলেছেন।

মোট কথা, অর্থনৈতিক কর্মকৌশলের ভিত্তিতে যদি কোন লেনদেনের সমালোচনা করা হয় তাহলে তার এই ব্যাখ্যা প্রদান করা ঠিক হবে না যে, ঐ লেনদেনকে শরয়ী দৃষ্টিকোণে নাজায়েয বা হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। মুরাবাহা ও ইজারাভিত্তিক লেনদেনে সীমাবদ্ধ থেকে শিরকাহ ও মুদারাবা'র দিকে অগ্রসর না হওয়াকে আমি এই দৃষ্টিকোণ থেকেই সমালোচনা করেছি। এর অর্থ এটা নয় যে, আমি মুরাবাহা ও ইজারা ইত্যাদিকে নাজায়েয মনে করি। তবে এগুলোকে যখন শরীয়তনির্ধারিত শর্তাদী লংঘন করে ব্যবহার করা হয়েছে তখন আমি নাজায়েয বলেছি।

১৯৮১ ইং-এর "সুদবিহীন কাউন্টার" এবং বর্তমান সুদবিহীন ব্যাংকিং

আমার যে প্রবন্ধের বারংবার উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে তা ১৯৮১ ইং সালে অর্থাৎ আজ থেকে ২৮ বছর পূর্বে "সুদবিহীন কাউন্টার" নামে ঐ সময় প্রকাশিত হয়েছিল যখন রাষ্ট্রপতি জিয়াউল হকের শাসনামলে প্রথমবার সুদবিহীন ব্যাংকিং কার্যকর করার ঘোষণা প্রদান করা হয়েছিল। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে তখন আলাদা সুদবিহীন কাউন্টার তৈরী করা হয়েছিল। তৎকালীন সময়ে আমি তাদের কর্মপদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করার পর দেখতে পেলাম যে, ইসলামী নযরিয়াতী কাউন্সিলের প্রস্তাবসমূহকে বিকৃত করে কার্যকর করা হয়েছে। সেখানে মুরাবাহা ও বাইয়ে মুয়াজ্জাল নামেমাত্র থাকলেও কার্যক্ষেত্রে কল্পনা ও কাগজে কলমে সীমাবদ্ধ ছিল। বাস্তবে সেখানে নগদ অর্থের লেনদেন হতো; যা সুদেরই একটি রূপ। সেসময় আমি আমার প্রবন্ধে এই কর্মপদ্ধতির জোরালো প্রতিবাদ করে বলেছি- এখানে মুরাবাহা মুয়াজ্জালা'র শর্তসমূহ পূরণ হচ্ছে না বিধায় এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ নাজায়েয। এই প্রবন্ধে আমি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গৃহিত পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ নাজায়েয বলেছি। মুরাবাহা মুয়াজ্জালা'র সঠিক পদ্ধতিকে মোটেই নাজায়েয বলিনি। তবে উক্ত প্রবন্ধে আমার সম্বোধন যেহেতু সরকার ছিল তাই উপরে উল্লেখিত আমার অবস্থান অনুযায়ী আমি খুব জোরালোভাবে এই দাবীও উত্থাপন করেছি যে, এসব পদ্ধতির ব্যবহার কমিয়ে শিরকাহ ও মুদারাবা'র ব্যবহার বাড়ানো হোক। যে কর্মপদ্ধতিকে পরিপূর্ণ নাজায়েয বলা হয়েছিল তার কিয়দাংশ স্টেট ব্যাংক নিউজ-এর উদ্ধৃতি দিয়ে ঐ প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছিল। তা ছিল এরূপ "যেসমস্ত জিনিস সংগ্রহের জন্য ব্যাংকের পক্ষ থেকে অর্থ সরবরাহ করা হয়েছে সেগুলোর ব্যাপারে বুঝে নিতে হবে যে, তা ব্যাংক তার সরবরাহকৃত অর্থের বিনিময়ে বাজার থেকে ক্রয় করে নব্বই দিন পর আবশ্যকীয়ভাবে আদায়যোগ্য অতিরিক্ত অর্থের বিনিময়ে ঐসব প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রয় করেছে যারা ব্যাংক থেকে অর্থ নিতে আসে।"

(আল বালাগ, রবিউস সানী ১৪০১ হিজরী, সূত্র- স্টেট ব্যাংক নিউজ ১ জানুয়ারী, ১৯৮১ ইং, পৃঃ ৯)

এখানে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, বাস্তবে ব্যাংক কোন বেচাকেনা করেনি; বরং কল্পনা করেছে, কোন জিনিস বাজার থেকে ক্রয় করে তা গ্রাহকের কাছে বিক্রি করেছে, যার মূল্য নব্বইদিন পর অবশ্যকীয়ভাবে আদায়যোগ্য। তাছাড়াও ঐ কর্মপদ্ধতিতে অনেকসময় এই কল্পিত বেচাকেনাটাও 'عينة' (অর্থাৎ কোন জিনিস বাস্তব মূল্যের চেয়ে বেশী মূল্যে বাকীতে বিক্রয় করে পূণরায় ক্রেতার কাছ থেকে কম মূল্যে নগদে ক্রয় করে নেয়া।) এর ভিত্তিতে সম্পাদিত হতো। যেমন- কোন ব্যক্তি নিজের কোন জিনিস ব্যাংকের কাছে নগদে বিক্রি করতো আবার একই সময় ব্যাংক থেকে ঐ জিনিস বেশী দামে বাকীতে ক্রয় করে নিতো। এই বেচাকেনাও কাল্পনিক ও কাগজে কলমে সীমাবদ্ধ থাকত। তাই আমি কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ করে এঁকে শুধু নাজায়েয নয়; বরং সুদের ভিন্নরূপ বলে আখ্যায়িত করেছি।

আমার ঐ প্রবন্ধকে এখন অনেকে মুরাবাহা মুয়াজ্জালা'র সঠিক পদ্ধতিগুলোকেও পরিপূর্ণ নাজায়েয সাব্যস্ত করার জন্য দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। যে পদ্ধতিগুলো বর্তমানে সুদবিহীন ব্যাংকসমূহে প্রচলিত আছে। তারা দাবী করেছেনঃ "এই কৌশলগুলোর মাধ্যমে অর্জিত মুরাবাহা'র 'লাভ' এবং ইজারা'র 'ভাড়া' ১৯৮১ ইং-এর সুদবিহীন ব্যাংকিংয়ের 'মার্কআপ' থেকে মোটেই ভিন্ন কিছু নয়। যেমনিভাবে ঐ 'মার্কআপ' শরয়ী দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট সুদ এবং পুঁজি বিনিয়োগের ইসলামী ব্যবস্থার উপর একটি দৃষ্টিকটু দাগ, বর্তমানে প্রচলিত মুরাবাহা'র 'লাভ' এবং ইজারা'র 'ভাড়া'ও ঠিক তেমনিভাবে বরং তার চেয়েও বেশী সুদ।"

(মুরাওয়াজাহ ইসলামী ব্যাংকারী, পৃঃ ৮০)

আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে, ১৯৮১ সালে বাস্তবে কোন বেচাকেনাই হতো না; শুধু ধরে নেয় হতো যে, কোন জিনিস কেনা হয়েছে এবং সাথে সাথে তা বিক্রি হয়েছে। আর এই কল্পিত বেচাকেনাও অধিকাংশ সময় 'عينة' এর ভিত্তিতে হতো। পক্ষান্তরে বর্তমানে প্রচলিত সুদবিহীন ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ব্যাংক বাস্তবেই ঐ সমস্ত মালামাল খরিদ করে যা গ্রাহকের প্রয়োজন হয় এবং তা বাস্তবেই বিক্রি করে। এখানে عينة 'ঈনা' থেকে পরিপূর্ণরূপে বিরত থাকতে হয়। যেমনটি সামনে আরো বিস্তারিতভাবে

আলোচিত হবে। এতদসত্ত্বেও এটাকে "১৯৮১'র ব্যবস্থা থেকে মোটেই ভিন্ন কিছু নয়' এবং 'দৃষ্টিকটু দাগ" ইত্যাদি বিশেষণের উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার মত কোন শব্দ আমার কাছে নেই।

আমার ঐ প্রবন্ধের সম্বোধন যেহেতু সরকারের প্রতি ছিল, যার কাছে ব্যাংকসমূহকে শিরকাহ ও মুদারাবা'র ভিত্তিতে বিনিয়োগে বাধ্য করার সব উপকরণ ছিল, তাই আমি উপরে উল্লেখিত অর্থনৈতিক কর্মকৌশলের ভিত্তিতে পুরো ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে মুরাবাহা ও ইজারায় আবর্তিত করার পরিবর্তে শিরকাহ ও মুদারাবাহ'র প্রচলন দেয়ার উপর অধিক গুরুত্বারোপ করেছিলাম। এই উদ্দেশ্যেই আমি সঠিক মুরাবাহা মুয়াজ্জালা ও ইজারা'র ব্যাপক প্রচলনকে নিরুৎসাহিত করেছি। এগুলো নাজায়েয বলা কখনোই আমার উদ্দেশ্য ছিল না। আর যেহেতু আমার উদ্দেশ্য ছিল সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা এবং প্রবন্ধটিও এমন এক পরিস্থিতিতে রচিত হয়েছে যখন সরকার মুরাবাহা'র ভূল ব্যবহার করে একে 'ঈনা' তে পরিবর্তন করে ফেলেছিল, সেহেতু আমার প্রবন্ধে ব্যবহৃত একটি বাক্যে অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিদের ভূল ধারণা হতে পারে যে, আমি মুরাবাহা মুয়াজ্জালাকে প্রচলিত করাটা শরয়ী দৃষ্টিতে নাজায়েয মনে করি। বাক্যটি ছিলঃ "এজন্যই আমাদের ফিক্বহবিদগন স্পষ্টভাবে বলেছেন, দুয়েক জায়গায় কোন আইনগত সংকীর্ণতা দূর করার জন্য শরয়ী হীলা বা কৌশল অবলম্বনের সুযোগ আছে। কিন্তু শরীয়তের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয় এমন কোন কৌশল অবলম্বন করার কোন অনুমতি নেই।" যদিও এই প্রবন্ধ আগাগোড়া পড়লে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, 'অনুমতি নেই' শব্দটি এমনসব কৌশলের ব্যাপারে বলা হয়েছে যা শরয়ী উদ্দেশ্যসমূহ ব্যাহত করে। যে সরকার মুরাবাহা'র নামে সম্পূর্ণ নাজায়েয ও কাল্পনিক লেনদেনের প্রচলন ঘটিয়েছিল তার কাছে এই দাবী করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল যে, হিলা বা কৌশল ইত্যাদির পরিবর্তে গুরুত্ব সহকারে দৃষ্টান্তমূলক ইসলামী পদ্ধতিসমূহের যেন প্রচলন ঘটানো হয়। কিন্তু আমার ঐ অস্পষ্ট ব্যাখ্যার কারণে যদি কোন ভূল বুঝাবুঝি হয়ে থাকে তাহলে আমি পরিষ্কার করে দিচ্ছি যে, শরয়ী শর্তসহ সঠিকভাবে পরিচালিত মুরাবাহা মুয়াজ্জালাকে শরয়ীভাবে নাজায়েয বলা আমার উদ্দেশ্য নয়; বরং একে অর্থায়ন ও বিনিয়োগের সাধারণ ও বিশেষ পলিসি বানানো থেকে সরকারকে বাধ্য

দেয়াই আমার উদ্দেশ্য ছিল। উপরোক্ত বাক্যে 'ফিকহবিদগণ' বক্তব্যের সম্পর্ক 'শরয়ী উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়' কথাটির সঙ্গে। 'কাল্পনিক ঈনা' ইত্যাদির মত নাজায়েয কৌশল সমূহেই শরয়ী উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। জায়েয বা বৈধ কৌশলে তা হয় না যেমনটি সামনে ('কৌশলের শরয়ী অবস্থান' শিরোনামে) বিস্তারিতভাবে আলোচিত হবে ইনশাআল্লাহ। আমার এই উদ্দেশ্য প্রবন্ধের গতিধারা থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায়। কেননা ঐ প্রবন্ধে 'মার্কআপ' এর কর্মপদ্ধতির কিছু সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। সুদবিহীন ব্যাংকিং ব্যবস্থায় এগুলোর ব্যবহারকে সম্পূর্ণ নাজায়েয বলাটাই আমার উদ্দেশ্য হলে এসব সংশোধনী প্রস্তাব দেয়াটাই মূল্যহীন হয়ে পড়ে। পরে সরকার এসব সংশোধনী প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করার ঘোষণা দিলে আমি তাদের সাধুবাদও জানিয়েছিলাম। সুতরাং সরকারের পক্ষ থেকে স্টেট ব্যাংক এই ঘোষণা দেয় যে, "ব্যাংক বিভিন্ন জিনিস ক্রয় করে তা গ্রাহকের কাছে 'বাইয়ে মুয়াজ্জাল'এর ভিত্তিতে সুবিধাজনক মার্কআপসহ বিক্রি করবে। কিন্তু অনাদায়ের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত মার্কআপ সংযুক্ত হবে না।" –(স্টেট ব্যাংক নিউজ, খন্ডঃ ২৩, সংখ্যাঃ ১৩)। অতঃপর আমি একে সাধুবাদ জানিয়ে 'আল বালাগ'-এ লিখি ঃ "মার্কআপের কর্মপদ্ধতির এই সংশোধন সব দিক থেকে আনন্দদায়ক এবং ভবিষ্যতের জন্য খুবই আশাব্যঞ্জক।" –(মাসিক আল বালাগ, সফর ১৪০৫ হিজরী সংখ্যার সম্পাদকীয়)। আমি যদি মুরাবাহ মুয়াজ্জালা অথবা ব্যাংকিং কার্যক্রমে এর প্রচলন ঘটানোকে নাজায়েয মনে করতাম তাহলে একে কীভাবে সাধুবাদ জানালাম?

বেসরকারী পর্যায়ে সুদবিহীন ব্যাংকিংয়ের প্রচেষ্টা

এখানে আরেকটি বিষয় স্পষ্ট করা দরকার বলে মনে করছি। তা হল, সুদবিহীন ব্যাংকিং ব্যবস্থার ব্যাপারে আমাদের ইচ্ছা, আহ্বান ও প্রচেষ্টা সবসময় এটাই ছিল– যেন অর্থায়নের ভিত্তিটা যতবেশী সম্ভব শিরকাহ ও মুদারাবাহ'র উপর হয়। কিন্তু যে সুদের বিরুদ্ধে আল্লাহ পাক সরাসরি যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছেন সেই জঘন্য হারাম থেকে বাঁচাটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। যেকোন জায়েয পদ্ধতির মাধ্যমে এর প্রচেষ্টাকে কখনো অবমূল্যায়ন করা যাবে না। একটি দেশের পুরো ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করা

সরকারের কাজ। যে দৃষ্টান্তমূলক অর্থনৈতিক কর্মকৌশলের কথা উপরে উল্লেখিত হয়েছে, তা সত্যিকার অর্থে তখনই বাস্তায়িত হতে পারে যখন সরকার তার সকল মাধ্যমগুলোকে কাজে লাগিয়ে এই অর্থনৈতিক পলিসি কার্যকর করবে। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে শুধু অর্থনৈতিক কাঠামোতে নয়; বরং অনেক আইনে ও কর ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন আনতে হবে।

কিন্তু সরকার যেহেতু এই দায়িত্ব আদায় করছে না তাই কিছু ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যদি চায়, কোনভাবে আমরা সুদের অভিশাপ থেকে নিজেদের ও অন্য মুসলমানদের বাঁচানোর লক্ষ্যে এমন একটি প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করবো যা পরিপূর্ণভাবে উপরোক্ত অর্থনৈতিক কর্মকৌশলের অনুরূপ না হলেও শরীয়তের জায়েয পরিসীমার মধ্যে থাকবে, তাহলে তাদের কি একথা বলা যাবে, যতক্ষণ সেই অর্থনৈতিক পলিসি বাস্তবায়ন করা না যায় ততক্ষণ সুদ থেকে বাঁচার সকল উপায় ভুলে যাও এবং সুদের বাজার গরম থাকতে দাও? নাকি একজন মুসলমান হিসেবে তাদের এই ইচ্ছা ও প্রচেষ্টাবে সাধুবাদ জানিয়ে তাদের সাহায্য করার চেষ্টা করতে হবে? তাদের জন এমন কোন পদ্ধতির প্রস্তাব করা কি উচিৎ নয়, যা অর্থনৈতিব কর্মকৌশলের মত দৃষ্টান্তমূলক না হলেও শরীয়তের বৈধ পরিসীমার মধে থেকে সুদ থেকে বাঁচাতে পারবে? সাথে সাথে উক্ত কর্মকৌশলের যতটুব বাস্তবায়ন করা সম্ভব ততটুকু করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ‹ দুই কর্মপন্থার মধ্যে কোনটি সঠিক তা ন্যায়নিষ্ঠার সাথে ভেবে দেখ উচিৎ।

আমার ধারণা, সকল ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিই দ্বিতীয়োক্ত কর্মপন্থাটিরই সমর্থ করবেন। সুতরাং মুসলিম বিশ্বের সরকারদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ নিরা হবার পর আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন মুসলমানেরা এবং উলামায়ে কেরাম এ দ্বিতীয় পথটিই অবলম্বন করেছেন। তারা প্রাইভেট পর্যায়ে মুদারাবা' ভিত্তিতে এমনসব প্রতিষ্ঠান তৈরী করেছেন যা বাস্তব ক্ষেত্রে সুদবিহী কারবার পরিচালিত করবে। এসব প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুঁ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শিরকাহ্ ও মুদারাবাহ'র প্রতি যথাসম্ভব সর্বোচ্চ গুরু প্রদানের জন্য বারবার উৎসাহ ও তাগিদ দেয়া হয়েছে। সাথে সাথে শর শর্তসমূহ পরিপূর্ণভাবে মেনে মুরাবাহা ও ইজারা ইত্যাদি লেনদেনের অনুমতি দেয়া হয়। যেহেতু তাদের কাছে সরকারের মত মাধ্যম

সুযোগ-সুবিধা নেই এবং সুদী ব্যাংকসমূহের তুলনায় এসব প্রতিষ্ঠানগুলো সমুদ্রে পানির ফোটার মত, তাই মুদারাবাহ ও শিরকাহভিত্তিক লেনদেনের জন্য তাদের প্রতি দাবী ততটা জোরদার করা হয়নি যতটা সরকারের কাছে করা হয়েছিল, যা আমার লেখাগুলোতেও স্থান পেয়েছে। বরং উপরোক্ত কারণেই সে প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে যথাসম্ভব সহযোগীতার কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। অতএব, এটাকে আমার পূর্বের অবস্থানের বিপরীত মনে করা সঠিক নয়। কেননা কোন মানুষের বক্তব্য, লেখা এবং কর্মপন্থাকে ন্যায়ের সাথে পর্যালোচনা করার সময় ولكل مقام مقال অর্থাৎ প্রত্যেক অবস্থানেরই একটি ব্যাখ্যা আছে- কথাটি ভুলে যাওয়া উচিৎ নয়।

বিন্নুরী টাউনের দারুল ইফতা'র একটি ফতোয়া

এখন জামেয়াতুল উলুম আল ইসলামীয়া বিন্নুরী টাউনের একটি সাম্প্রতিক ফতোয়া দেখুন, যা প্রশ্নকর্তা আমার কাছে সত্যায়নের জন্য প্রেরণ করেছেন। এই ফতোয়ায় এমন এক ব্যক্তি যিনি সুদের হারাম থেকে বাঁচতে চান এবং শিরকাহ ও মুদারাবা'র ঝুকিপূর্ণ লেনদেন পরিহার করে পুঁজি বিনিয়োগ করতে চান, তার জন্য এমন একটি কৌশলের প্রস্তাব করা হয়েছে, যা শরয়ী দৃষ্টিকোন থেকে জায়েয হওয়াটা শুধু সন্দেহযুক্তই নয়; বরং নাজায়েয হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

প্রশ্ন

আস্সালামু আলাইকুম

মহোদয়! আমি একটি অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন। শরয়ী আহকামের ভিত্তিতে আপনাদের কাছে এ সমস্যার সমাধান চাই।

আমার সমস্যাটি হল, আমার পিতার পক্ষ থেকে আমি কিছু টাকা পেয়েছি। এদিকে আমার অবস্থা হল, আমি লেখা পড়া বেশী জানি না। ঘরের সমস্ত দায়-দায়িত্বও আমার কাঁধে। আমার এক বন্ধু এই টাকাগুলো ব্যাংকে রাখার পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু আমি সুদের অভিশাপ থেকে বাঁচতে চাই। আমার লেখা পড়া ও কোন অভিজ্ঞতা না থাকায় এগুলো নিয়ে আমি কোন কারবার করতে পারছি না।

কারো উপর আমার ভরসা না থাকায় অংশীদারী ভিত্তিতেও কিছু করতে পারছি না। ফলে, আমার এক বন্ধু আমাকে একটি কাজের পরামর্শ দিলে আমি তা শুরু করি। আমার এই কাজটির শরয়ী অবস্থান কী? সে ব্যাপারে আপনাদের কাছে মাসআলা জানতে চাই। আমার কাজের ধরণ সম্পর্কে নিম্নে উল্লেখ করছিঃ-

আমার এক বন্ধুর একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। যেখানে ছাত্ররা লেখা পড়া করার জন্য আসে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় যে ফিস আদায় করে তা একসাথে ছয়মাসের হয় এবং অগ্রিম আদায় করে। অতএব, বিশ্ববিদ্যালয়টির ফিস অগ্রিম এবং অনেক বেশী হয়। যা অনেক ছাত্রের পক্ষে একসাথে আদায় করা সম্ভব হয় না। ফলে অনেক ছাত্র সেখানে চাইলেও অধ্যয়ন করতে পারে না।

অতএব, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকের সাথে একটি প্রতিনিধিত্ব চুক্তি করেছি। যার ফলে কিছু নির্বাচিত ছাত্রের ফিস আমি আদায় করি এবং তারা প্রতিনিধি হিসেবে সেসব ছাত্রকে নিজেদের প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার সুযোগ দেয়। শুরুতেই ছাত্রদের ফিস হিসেবে আমি তাদেরকে ১৫০০০ টাকা আদায় করি। এসব ছাত্র তা প্রতিমাসে তিন হাজার করে আমাকে পরিশোধ করে। এভাবে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে সহজেই ছাত্ররা ভর্তির সুযোগ লাভ করে ও ফিস আদায়ে সক্ষম হয়। অন্যদিকে ছাত্রপ্রতি আমার ৩০০০ টাকা লাভ হয়। ছাত্রদেরকে শুরুতে ফিস হিসেবে ১৮০০০ টাকার কথাই বলা হয়। কিন্তু আমি বিশ্ববিদ্যালয়কে তাদের প্রত্যেকের জন্য পরিশোধ করি ১৫০০০ টাকা।

(১) এখন আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই, এভাবে আমার ৩০০০ টাকা কামানো জায়েয হবে কী? যেখানে আমি এ কাজে শুধু আমার টাকা বিনিয়োগ করছি তা নয়; বরং বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষের সাথে আমার এই চুক্তিনামাও আছে যে, তারা প্রতিনিধি হিসেবে সেসব ছাত্রকে শিক্ষার সুযোগ দেয়ার ব্যাপারে আমার পক্ষ থেকে বাধ্য। ছাত্ররা যে ফিস আদায় করে তা সরাসরি আমাকেই করে। শুরুতেই আমি তাদের বিস্তারিত বলে দেই যে, প্রতিমাসে তাদের প্রত্যেককে ৩০০০ টাকা করে দিতে হবে এবং মোট ফিসের পরিমান হবে ১৮০০০ টাকা।

(২) আরেকটি মাসআলা হল, এক্ষেত্রে কোন ছাত্র ফিস আদায়ে বিলম্ব করলে তার কাছ থেকে কি জরিমানা নেয়া যাবে?

অনুগ্রহপূর্বক আমাকে এব্যাপারে দিকনির্দেশনা প্রদান করলে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো।

মুহাম্মদ ইরফান
আখতার কলোনী, করাচী।

উত্তর

প্রশ্নকর্তা যে পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন– ছাত্রদের ফিস তিনি একসাথে আদায় করেন এবং পরে মাসের হিসেবে ছাত্রদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থসহ আদায় করেন– তা ঋণ। আর ঋণের হুকুম হল, তার সমপরিমান আদায় করা ওয়াজিব। অতএব, ছাত্রদের অভিভাবক থেকে ফিসের অতিরিক্ত টাকা আদায় করা হারাম এবং সুদ হবে।

বাদায়ে' সানায়ে' কিতাবে আছেঃ–

إن الواجب في ذمة المستقرض مثل المستقرض (ج:٧ ص:٣٩٤ ط: سعيد)

অন্যত্র আছে

وأما الذي يرجع إلى نفس القرض: فهو أن لايكون فيه جر منفعة فإن كان لم يجز نحو ما إذا أقرضه دراهم غلة على أن يرد عليه صحاحا أو أقرضه وشرط شرطا له فيه منفعة، لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قرض جر نفعا، ولأن الزيادة المشروطة تشبه الربا، لأنه فضل لايقابله عوض والتحرزعن حقيقة الربا وعن شبهة الربا واجب.

(بدائع الصنائع كتاب القرض ج:٧ ص:٣٩٥ ط: سعيد)

ফাতাওয়া কামেলীয়াতে আছে

والمقبوض على وجه القرض مضمون بمثله وفيها نقلاعن جامع الفصولين والواجب في القرض رد المثل.

(فتاوى كاملية باب القرض ص:٩٢ ط: حقانية)

অতএব, উপরোক্ত পদ্ধতি নাজায়েয এবং সুদ, যা হারাম। এধরনের লেনদেন পরিহার করে তা কোন জায়েয কারবারে ব্যবহার করা উচিৎ।

অথবা,যদি এই পন্থা অবলম্বন করা যায় যে, যেসব ছাত্র নগদ ফিস আদায় করতে পারে না প্রশ্নকর্তা তাদের থেকে সরাসরি এই অঙ্গিকার গ্রহণ করবে যে, আমি তোমাদেরকে এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দেয়াবো এবং প্রতিষ্ঠানের যা ফিস হবে তা আমি আদায় করবো। তোমরা আঠারো হাজার টাকা হিসাবে মাসিক ভিত্তিতে এত মাসের মধ্যে আমাকে আদায় করবে। এতে ঐ ছাত্র কিংবা তার অভিভাবক সম্মত হলে ওয়াদা অনুযায়ী তাদের থেকে আঠারো হাজার টাকা হিসেবে ফিস আদায় করা যাবে। প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রশ্নকর্তার যা নির্ধারিত হবে পনের হাজার কিংবা কমবেশী তা তাদের মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। والله اعلم

লেখক-

ফজলুররহমান

২০-২-২০০৮ইং/ ১২-২-১৪২৯হিঃ

উত্তর সঠিক

মুহাম্মদ আব্দুলমজিদ দ্বীনপূরী

উত্তর সঠিক

মুহাম্মদ আব্দুল কাদের

উপরোক্ত ফতোয়ায় প্রশ্নকর্তা স্পষ্ট করেছেন যে, শিরকাহ ও মুদারাবা'র ভিত্তিতে পুঁজি বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে তিনি লোকজনের দ্বীনদারীর উপর আস্থাশীল নন এবং তার পুঁজি ঝুকির মধ্যে থাকে। অতএব, তিনি এমন কোন পদ্ধতি চান যা তার পুঁজিকে নিরাপদ রাখবে এবং ঘরে বসে তার লাভ অর্জিত হতে থাকবে। ফতোয়ায় পদ্ধতি প্রস্তাব করা হয়েছে যে, যেসব ছাত্র শিক্ষার জন্য নগদ পনের হাজার টাকা ব্যয় করতে অক্ষম তাদেরকে তিনি বলবেন, আমি তোমাদেরকে অমুক প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা প্রদান করাবো এবং এই 'সেবা'র বিনিময়ে কিস্তিতে আঠারো হাজার টাকা (মাসিক তিনহাজার হিসাবে) উসুল করব। অতঃপর তিনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের

সাথে পনের হাজার টাকায় লেনদেন করেন। অর্থাৎ, তিনি পনের হাজার টাকা পুঁজি খাটিয়ে ছাত্রদের কাছ থেকে ঘরে বসে আঠারো হাজার টাকা উসুল করে নেন।

এই ফতোয়ায় ঐ সৎ আবেগই কাজ করেছে ইতোপূর্বে যার আলোচনা হয়েছে। যে ব্যাক্তি সুদ থেকে বাঁচতে চায় তাকে এমন একটি বিকল্প পথ দেখানোই উদ্দেশ্য ছিল, যাতে সুদ হবে না এবং উদ্দেশ্যও অর্জিত হবে। কিন্তু এজন্য যে কৌশল অনুমোদন করা হয়েছে তাতে এ বিষয়টি লক্ষ্য করা হয়নি যে, মুরাবাহা মুয়াজ্জালাতে এমন জিনিসের ক্রয় বিক্রয় হতে পারে যা বিক্রেতার আয়ত্তে থাকে। এতে তার লাভ নেয়াও বৈধ হয়। কিন্তু এখানে তো কোন জিনিস না ক্রয় করা হচ্ছে না বিক্রয়। ফতোয়ায় 'শিক্ষা দেয়াবো' কথাটির কোন ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়নি। সুতরাং প্রশ্নোত্তরের বর্ণনাধারা থেকে 'শিক্ষা দেয়াবো' কথাটির উদ্দেশ্য এটাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রশ্নকর্তা ছাত্রদের পক্ষ থেকে পনের হাজার টাকার ফিস জমা দিবেন এবং ছাত্ররা কিস্তিতে আঠারো হাজার টাকা পরিশোধ করবে। (অর্থাৎ ছয়মাসে শতকরা বিশ ভাগ লাভ অর্জিত হবে এবং বছরে হবে শতকরা চল্লিশ ভাগ)। এটা স্পষ্ট যে, তিনি যে টাকা জমা দিয়েছেন তা ছাত্রদের জন্য ঋণ হিসেবে গণ্য হবে এবং এই ঋণের বিনিময়ে তিনি আঠারো হাজার টাকা উসুল করবেন। এটাকে সুদ ছাড়া আর কী বলা যায়? আর যদি ধরে নেয়া হয় যে, 'শিক্ষা দেয়াবো' কথাটির উদ্দেশ্য শুধু ফিস জমা করা নয়; বরং ছাত্রদের ভর্তি করিয়ে দেয়ার সেবাও এর অন্তর্ভূক্ত, তাহলে বলতে হয়, প্রথমত ফতোয়ায় এ ধরনের স্পষ্ট কোন ব্যাখ্যা বা শর্ত উল্লেখ করা হয়নি। দ্বিতীয়ত এটা মেনে নিলেও বলা যায়, ভর্তি করিয়ে দেয়ার সেবাতো একবারেই সম্পন্ন হয়ে যায়। অথচ তিন হাজার টাকার লাভ লাগাতার অর্জিত হতে থাকে। এটাকে কীভাবে বৈধ বলা যাবে? তৃতীয়ত ভর্তি করানোর সেবার উপর যদি এই লেনদেন সম্পন্ন হয়ে থাকে, তাহলে তা 'ইজারা' হবে। এর সাথে এই শর্ত লাগানো যে, তুমি আমার ফিসও তোমার পকেট থেকে দিবে অর্থাৎ, আমাকে পনের হাজার টাকা কর্জ দিবে– এটা স্পষ্টত: اجاره بشرط القرض অর্থাৎ শর্তভিত্তিক ইজারায় পরিণত করে দেয়। এ ধরনের ইজারা কি জায়েয ? আর যদি জায়েয হয়

তাহলে এ ধরনের ইজারায় (যাতে ঋণও থাকে) اجرت مثل বা সমপরিমাণ মজুরী/বিনিময়-এর শরয়ী বাধ্যবাধকতা কি জরুরী নয়? নাকি যতবেশী মজুরী/বিনিময় নির্ধারিত হবে তাই জায়েয হবে, যদিও তা 'قرض جرّ نفعا' (লাভজনক ঋণ) হয় এবং এর মাধ্যমে বার্ষিক শতকরা চল্লিশ ভাগ লাভ অর্জিত হয়? উপরোক্ত ফতোয়ায় এসব প্রশ্নের কোন উত্তর দেয়া হয়নি। আর এই ফতোয়া সেসব 'দারুল ইফতা সহকর্মী' দের পক্ষ থেকে জারী করা হয়েছে যারা তাদের কিতাব "মুরাওয়াজা ইসলামী ব্যাংকারী"তে 'কৌশল'সমূহের বিরুদ্ধে এত অবজ্ঞা ও ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন যে, এগুলোকে اكل بالباطل (অন্যায় ভক্ষণ) হিসেবে অভিহিত করেছেন। অথচ এসব কৌশলের বৈধতা সম্পর্কে সাহাবা, তাবেঈন থেকে শুরু করে প্রসিদ্ধ চার ইমামেরও সুস্পষ্ট মত আছে। সামনে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ।

সার কথা, উল্লেখিত ফতোয়ায় যে কৌশল বাতলে দেয়া হয়েছে শরয়ী দৃষ্টিকোণ ব্যাতিরেকে তার পিছনে এই আবেগই কাজ করেছে যে, সুদ যেভাবে পরিবেশকে শক্তভাবে গ্রাস করেছে এবং দ্বীনদারী ও আমানতদারীর মান যেরূপ নিম্নগামী, তাতে একজন মুসলমানকে পুঁজি বিনিয়োগের জন্য শিরকাহ ও মুদারাবা ছাড়া অন্য কোন বিকল্প দেয়া যায় কিনা। এ ধরনের আবেগ ভুল নয়; বরং প্রশংসনীয়। তবে এ ধরনের পথ অনুমোদনের সময় প্রয়োজনীয় শরয়ী আহকাম ও শর্তসমূহের পরিপূর্ণ লক্ষ্য রাখতে হবে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল, একই চিন্তা চেতনা যখন সুদবিহীন ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠায় গ্রহণ করা হয় তখন তাকে সুদের চেয়েও নিকৃষ্ট হারাম বলে অভিহিত করা হয়। বলা হয়, প্রচলিত সুদবিহীন ব্যাংকিং ব্যবস্থায় যেসব লেনদেন অনুমোদিত হয়েছে তা শরয়ী শর্তসমূহ পালন করলেও তাকে নাজায়েয কৌশল বলে আখ্যায়িত করা হবে!!!

প্রচেষ্টার বিভিন্ন ধাপ

আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল- ব্যাংকিং ব্যবস্থার সুদী নিয়মনীতি সমূহ শরয়ী ভিত্তিতে পরিবর্তন এমন কাজ নয় যে, একটি সুইচ চাপ দিলাম আর সব কিছু শরীয়ত সম্মত হয়ে গেল। সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা বিগত চারশত বছর যাবৎ যেভাবে সারা দুনিয়ায় জাল বিস্তার করেছে তাতে

জীবনের প্রতিটি বিভাগ প্রভাবিত হয়েছে। শত শত বছর ধরে এই ব্যবস্থাকে দৃঢ়তা দানের জন্য সর্বস্তরে বহু প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। এজন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা তৈরী করা হয়েছে। হিসাব কিতাবের বিশেষ পদ্ধতি উদ্ভাবন করে দুনিয়াজোড়া তাকে কার্যকর করা হয়েছে। এর জন্য উপযুক্ত আইন রচনা করা হয়েছে। করসমূহের এমন ব্যবস্থা তৈরী হয়েছে যা সুদকে উৎসাহিত করে এবং সুদবিহীন ব্যবসাকে নিরুৎসাহিত করে। সুতরাং লেনদেনসমূহ শুদ্ধ করার জন্য শুধু একটি ব্যবস্থা অনুমোদন করলেই চলবে না; বরং একে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোর প্রয়োজন ছিল। যার মধ্যে সর্বপ্রথম কাজ ছিল- এমন কিছু ব্যাক্তি সৃষ্টি করা, যারা এই ব্যবস্থাকে সঠিকভাবে বুঝতে সক্ষম হবে এবং দ্বীনদারীর সাথে একে বাস্তবায়ন করবে।

যারা সুদী ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষিত, তাদেরকে এই নতুন ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা ও এর স্পর্শকাতরতা সম্পর্কে বুঝানো একটি পৃথক কাজ ছিল। যার জন্য ইসলামী বিশ্বে বেশকিছু স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রশিক্ষণকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। হিসাব কিতাবের প্রচলিত পদ্ধতির পরিবর্তন ছাড়া এই নতুন পদ্ধতিকে সঠিকভাবে চালানো সম্ভব নয়। কেননা হিসাব কিতাব, একাউন্টিং এবং অডিটের যে মান বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত, তদনুযায়ী একাউন্টিং ও অডিটিং করা হলে লেনদেনসমূহ এমনিতেই শরীয়তপরিপন্থী হয়ে যাবে। সুতরাং বাহরাইনে একাউন্টিং ও অডিটের একটি নতুন মানদন্ড তৈরী করা হয়েছে, যা বিরাট বিরাট খন্ডে বাহরাইন থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

এদিকে সুদের যেসব শরয়ী বিকল্প বিদ্যমান রয়েছে তা মুষ্টিমেয় হলেও অনেক ক্ষেত্রে তার বাস্তবিক সমন্বয়ে কিছু সমস্যা তৈরী হয়, যা শরয়ী এবং বাস্তব উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই চিন্তা করা প্রয়োজন। মোট কথা, এই ব্যবস্থাকে বাস্তবে কার্যকর করার জন্য এত বেশী দিক থেকে কাজ করতে হয়েছে, যার ব্যাপকতা সেসব ব্যাক্তিরাই অনুমান করতে পারে যারা এর সাথে কার্যক্ষেত্রে সম্পৃক্ত ছিল।

যখন কোন নতুন কাজ শুরু হয় তখন স্বাভাবিকভাবে তাতে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি থাকে। মানুষ বাধাগ্রস্ত হয়। কিছু লোক সরলতার কারণে ভুল বোঝাবুঝির শিকার হন। অসৎ উদ্দেশ্যের কিছু লোক সুযোগ বুঝে ফায়দা

লুটার জন্য জেনে শুনে কিছু ভুল করেন। আবার যেহেতু অনেক জায়গায় সুদবিহীন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করছিল, সেহেতু এই আশংকাও পুরোপুরি বিদ্যমান ছিল যে, কোন ঐক্যবদ্ধ মানদন্ড না থাকার ফলে নিজেদের মনমত শরয়ী পদ্ধতিসমূহের ব্যাখ্যা দিয়ে ভুল পদ্ধতিকে শরয়ী পদ্ধতি বলে চালিয়ে দেয়া হবে। এজন্য একটি ঐক্যবদ্ধ শরয়ী মজলিস এসব প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি ঐক্যবদ্ধ শরয়ী মানদন্ড তৈরী করেছে। যাতে করে এসকল প্রতিষ্ঠানকে এই মানদন্ডে কাজ করতে বাধ্য করা যায়। সুতরাং এখনো পর্যন্ত যেসব মানদন্ড রচিত হয়েছে সেগুলোকে পাকিস্তানসহ বিশ্বের বিভিন্ন ইসলামী দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদবিহীন প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে।

এ ধরনের দীর্ঘ প্রচেষ্টার সময়কালে স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করতে হয়। যেখানে কখনো সফলতা আসে যাতে মানুষ আনন্দ প্রকাশ করে, আবার কখনো কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয় যখন মন বিচলিত হয়ে পড়ে। এ অবস্থা প্রায় সকল বড় পরিবর্তনের প্রচেষ্টাতেই হয়ে থাকে। আমিও বিগত ত্রিশ বছর যাবত এই প্রচেষ্টার সাথে কোন না কোনভাবে সম্পৃক্ত ছিলাম। আমি নিজেও এ ধরনের বিভিন্ন অবস্থার সম্মুখীন হয়েছি। উদাহরণ স্বরূপ: মধ্যপ্রাচ্যে যেহেতু সুদবিহীন ব্যাংকিং আন্দোলন খুবই জোরদার ছিল, তাই সুদী ব্যাংকের সাথে পাল্লা দিতে গিয়ে কিছু লোক এমন কিছু পদক্ষেপ নিয়েছেন যা আমার দৃষ্টিতে শরীয়ত সম্মত ছিল না। আমি এসবের বিরুদ্ধে কথা বললাম (আল্লাহর মেহরবানীতে আমার এসব কথাকে আল্লাহ পাক প্রভাব বিস্তারকারী বানালেন)। এমনি কোন এক সময়ে আমি মক্কা মুকাররমায় অবস্থানকালে আমার কাছে কিছু লোক হয়তো সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। আমি তাদের সামনে আমার কিছু প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করি যে, মানুষ কৌশলের বাহানায় চাকা উল্টো দিকে চালাতে শুরু করেছে। আমার সে কথাগুলো সম্ভবত রেকর্ড করা হয়েছিল। এখন এগুলোকে এমনভাবে প্রচার করা হচ্ছে যেন কোন অপরাধীর স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীর রেকর্ড পাওয়া গেছে। এগুলোকে দোষ প্রমাণের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। অথচ আমার এই কথাগুলো যেই মাসিক "নেদায়ে শাহী" এর উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করা হয় তার আকার আকৃতিও আমি কোন দিন দেখিনি। এটাকে আমার

ইন্টারভিউ বলা হচ্ছে। আমার এখনো জানা নেই, সেখানে আমার কোন কথাকে কোন ধারাবাহিকতায় আমার দিকে সম্বোধিত করা হচ্ছে এবং এই সম্বোধন কতটুকু সঠিক?

আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, কেন একজন ভাইয়ের ব্যাপারে এই কর্মপন্থা অবলম্বন করা হয়েছে? তার কাছে কেন জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে না যে, তুমি অমুক সময় যে কথা বলেছো তার প্রেক্ষাপট কী? আমার কোন কথা বা কাজ যদি ঐ কথার বিরোধী হয়ে থাকে তাহলে নিজে নিজে তার ব্যাখ্যা না করে আমার কাছ থেকে কেন নেয়া হচ্ছে না? এর প্রকৃত রহস্য কী?

সুদবিহীন ব্যাংকসমুহের ব্যাপারে আমার অবস্থান

আরেকটি কথা স্পষ্ট হওয়া জরুরী বলে মনে করছি। সুদবিহীন ব্যাংকিংয়ের ধারণা এক জিনিস এবং এই ধারণা বাস্তবে কার্যকর করার জন্য যে ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় তা ভিন্ন জিনিস। আমার লেখাসমূহ সুদবিহীন ব্যাংকিংয়ের চিন্তাধারাসংশ্লিষ্ট ছিল। যেখানে আলোচনা করা হয়েছে- এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কোন কোন পথ অবলম্বন করা শরয়ী দৃষ্টিতে জায়েয? এতে অনেকে মনে করেন যে, যত অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান সুদবিহীন হওয়ার দাবী করে, আমি তাদের সবকটিকেই জায়েয হওয়ার ফতোয়া দিয়ে দিয়েছি। বিষয়টি সঠিক নয়।

এই অবস্থায় যখন জোরালোভাবে এ দাবী উত্থাপিত হচ্ছিল যে, সুদ ছাড়া কোন অর্থব্যবস্থা সফলভাবে চলতে পারে না এবং ব্যাংক থেকে সুদের বিদায় অসম্ভব, তখন আমি আমার লেখাসমূহে উল্লেখ করেছি, কীভাবে ব্যাংকগুলোকে সুদ থেকে পবিত্র করা যায়। লেখাগুলোতে আমি সুস্পষ্টভাবে এও উল্লেখ করেছি যে, এ পদ্ধতিসমূহের শরয়ী বৈধতার জন্য সেসব আহকাম ও শর্তাদী অবশ্যই পালন করতে হবে, যা ঐসব লেনদেনের জন্য শরয়ী দিক থেকে জরুরী। যতক্ষণ এ বাধ্যবাধকতা পালনের ব্যাপারে আমি নিশ্চত না হই ততক্ষণ কোন প্রতিষ্ঠানের লেনদেন জায়েয হওয়ার ফতোয়া আমি দেই না। সুতরাং সকল প্রতিষ্ঠানের দায়-দায়িত্ব আমার উপর বর্তায় না।

যেসব প্রতিষ্ঠানের অবস্থা ও লেনদেনসমূহ সম্পর্কে আমি নিজে অথবা নির্ভরযোগ্য কোন আলেমের মাধ্যমে পর্যাপ্ত ধারণা পাই কেবল তাদের বৈধতার ফতোয়া আমি দেই। আর যেসব প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য জানা না থাকে তাদের ব্যাপারে হ্যাঁ কিংবা না সূচক কোন মন্তব্যই আমি করি না। তবে কখনো কখনো তাদের শরয়ী অভিভাবকদের সাথে মতবিনিময় করতে বলি। যেসব প্রতিষ্ঠানে কোন নির্ভরযোগ্য আলেম থাকে না সেসব প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত হতে আমি লোকজনকে পরামর্শ দেই না। যেসব ব্যাংকের লেনদেনকে আমি জায়েয মনে করি তাদের ব্যাপারেও কেউ আমার কাছে পরামর্শ চাইলে আমি বলি, ব্যাংকের অর্থায়ন ছাড়া যদি কাজ চালানো যায় তাহলে ভাল। আর যদি তা করতেই হয় তাহলে সুদী ব্যাংকের পরিবর্তে এই ব্যাংকেই করুন। আর ব্যাংকের সাথে যাদের সম্পর্ক রাখতেই হয় তাদের জন্য জায়েয পথ বের করার চেষ্টা করা হয়েছে। যদি তা নিষ্ঠার সাথে চলমান থাকে এবং সহায়তাপ্রাপ্ত হয় তাহলে এর মাধ্যমে ইসলামী অর্থব্যবস্থার উত্তম লক্ষ্যসমূহের দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। আর যে বিশাল জনগোষ্ঠী ব্যাংকে অর্থ জমা রাখতে বাধ্য তাদের জন্যও সুদ থেকে বাঁচা সম্ভব হবে।

অনেক সম্মানিত ব্যাক্তি আমার ব্যাপারে বলেছেন যে, আমি সুদবিহীন ব্যাংকিংয়ের উদ্ভাবক বা প্রতিষ্ঠাতা। এ কথাটিও সঠিক নয়। সুদবিহীন ব্যাংক যখন প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করেছে তখন তাতে আমার কোন কৃতিত্ব ছিল না। আমি শুধু 'ইসলামী নযরিয়াতী কাউন্সিল' এর সদস্য ছিলাম। যারা এ বিষয়ে একটি রিপোর্ট তৈরী করেছিল। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যে এর আগেই দু' তিনটি সুদবিহীন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। পরবর্তীতে এ ধরনের ব্যাংকের সংখ্যা আরো বাড়তে শুরু করল। আমি লক্ষ্য করলাম যে, এর বেশীরভাগই মুরাবাহা ও ইজারা'র ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে, অথচ এর কোন অবশ্য পালনীয় নিয়মনীতিও উদ্ভাবিত হয়নি। আমার আশংকা হল, এ ধরনের কোন কিতাবের অনুপস্থিতিতে এসব প্রতিষ্ঠান শুরুতেই ভুল পথে পড়তে পারে। তখন আমি অহ Introduction to Islamic Finance নামে একটি কিতাব রচনা করি। এটা আমি ইংরেজী ভাষায় লিখেছি যাতেকরে যেখানেই সুদবিহীন ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় সেখানেই তা পঠিত হতে পারে। পরে মাওলানা মুহাম্মদ যাহেদ সাহেব 'ইসলামী ব্যাংকারী কি বুনিয়াদীঁ' নামে উর্দূ ভাষায় এর অনুবাদ করেছেন। যেহেতু

কিতাবটি সংক্ষিপ্ত পরিসরে সুদবিহীন ব্যাংক ব্যবস্থার আহকামের বিষয়ে সম্ভবত প্রথম রচনা ছিল, তাই আল্লাহর মেহেরবাণীতে তা ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পায়। ফলে অনেকেই মনে করতে শুরু করেন যে, এ কাজের আমিই সূচনা করেছি।

অনেকেই মনে করেন, অন্ততপক্ষে পাকিস্তানে যত সুদবিহীন ব্যাংক আছে, সবই আমার তত্ত্বাবধান ও পরামর্শে পরিচালিত হয়। এই ধারণাটিও সঠিক নয়। এখনো পর্যন্ত পাকিস্তানে সরাসরি তিনটি ব্যাংকের সাথে আমার সম্পর্ক আছে। মিযান ব্যাংক, ব্যাংক ইসলামী ও খায়বার ব্যাংক। (খায়বার ব্যাংকের শরীয়া কমিটিতে আমার সদস্যপদের মেয়াদ ফুরিয়ে আসছে এবং দৃশ্যত: নতুন সরকারের পক্ষ থেকে তার নীতিমালা পরিবর্তনের প্রচেষ্টার কারণে হয়তো এর সদস্যপদ আর গ্রহণ নাও করতে পারি)।

অনেকেই মনে করেন, আমি এসব ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা বা মালিক বা শেয়ারহোল্ডার বা প্রশাসক। এ ধারণাটিও সঠিক নয়। আমি এগুলোর তিষ্ঠাতা নই। এগুলোর সাথে আমার কোন প্রশাসনিক সম্পর্কও নেই। মালিক কিংবা শেয়ারহোল্ডারও নই, এগুলোর মালিকানায়ও আমার অংশীদারিত্ব নেই। পরিতাপের বিষয়, অনেক অপবাদের কারণে আম কথাও স্পষ্ট করতে হচ্ছে যে, এ তিনটি ব্যাংকের কোনটির সাথেই আর্থিক স্বার্থ জড়িত নেই।

এখন ক্ষভাবে মাসায়িল গবেষণাকারী উলামায়ে কেরামের প্রতি আমার আবে হল, তারা শুধু আমার উপর ভরসা না করে, ব্যাংকসমূহকে সুদমুক্ত করার জন্য যেসব প্রস্তাব আমার অতীতের কিতাবগুলোতে দেয়া হয়েছে এবং যেগুলোর উপর বক্ষমান কিতাবে আলোচিত হয়েছে, তার উপর যেন ফিক্বহী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গবেষণা করেন। যদি এগুলো সঠিক হয়ে থাকে তাহলে কোন প্রতিষ্ঠানের লেনদেনকে বৈধ ফতোয়া দেয়ার পূর্বে ঐসব প্রস্তাবের উপর সঠিকভাবে কাজ করা হচ্ছে কিনা নিজে অথবা কোন নির্ভরযোগ্য আলেমের মাধ্যমে যাচাই করে নিন।

এসব প্রারম্ভিক আবেদনের পর আমি সেসব ইলমী আপত্তিসমূহের দিকে যাচ্ছি, যা বিভিন্ন লেখায় প্রচলিত সুদবিহীন ব্যাংক ব্যবস্থার উপর উত্থাপিত হয়েছিল।

যথাযথ যাচাই ছাড়া উত্থাপিত আপত্তিসমূহ

অনেক আপত্তি এমন, যেগুলো ঘটনার বাস্তবতা ও মাসআলা'র সঠিক অবস্থা সম্পর্কে ভুল ধারণার উপর ভিত্তি করে উত্থাপিত।

বাস্তবতা হল- ফিক্বহী মাসায়িল জীবনপদ্ধতি কিংবা অর্থনৈতিক লেনদেন যে সম্পর্কেই হোক না কেন তার শরয়ী হুকুম জানা ও বর্ণনা করার জন্য কোন মুফতীকে অর্থনীতিবিদ, ব্যাংকিং বিশেষজ্ঞ কিংবা ইংরেজী ভাষায় পারদর্শী হতে হয় না। তবে একটি কথা অন্যান্য মাসায়িলের ক্ষেত্রে যেমন জরুরী এখানেও জরুরী। তা হল- যে বিষয়ে ফতোয়া দেয়া হচ্ছে তার সঠিক অবস্থা সুস্পষ্টভাবে জানা থাকা। কেননা প্রাপ্ত তথ্য থেকে ধারণার উপরই ফতোয়ার হুকুম আবর্তিত হয়, যেমনটি বলা হয়েছে- 'الحكم على الشيء فرع عن تصوره'। কোন মুফতীর সামনে ঘটনার ভুল বর্ণনা দেয়া হলে তাঁর ফতোয়াও সেই ভুল অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রদত্ত হবে। বাস্তবতার সাথে যার কোন মিল থাকবে না। তাই ফতোয়ার মৌলিক মূলনীতিগুলোর অন্যতম হল, মুফতীর সামনে কোন প্রশ্ন আসলে যদি অস্পষ্ট হয় তাহলে সর্বাগ্রে যাচাই বাছাই করে প্রকৃত অবস্থা জানার [illegible] করার পর জবাব দেয়া। এটি একটি স্পষ্ট বিষয় যার জন্য কোন যুক্তি [illegible]য়োজন নেই।

সুদ[illegible] ব্যাংকিং ব্যবস্থার ব্যাপারে কিছু ফতোয়া ও লেখা আমার সামনে এ[illegible] তাতে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে যে, এর বিস্তারিত কর্মপদ্ধতি সম্[illegible]ক ধারণা লেখকদের নেই। কোন কোন লেখায় বলা হয়েছে, তাঁরা [illegible] লেনদেনসমূহের কাগজ পত্র পাওয়ার চেষ্টা করেও পাননি। আমি জ[illegible] কাগজ পাওয়ার এই চেষ্টা কোন ধরণের ছিল। অথচ আমাকে খেদম[illegible]র সুযোগ দেয়াটাই ছিল তা পাওয়ার সহজতম পথ। যারা আমাকে এই খেদমতের সুযোগ দিয়েছেন তারা কখনো কাগজপত্র না পাওয়ার অভিযোগ করেননি।

আরেকটি নিবেদন হল- যদি কোন মাসআলা'র সঠিক অবস্থা স্পষ্ট না হয় তাহলে কি ধারণা ও শোনা কথার ভিত্তিতে ফতোয়া দেয়া জায়েয হবে? অন্ততপক্ষে মাসআলা'র যথাযথ যাচাই বাছাই শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন নিশ্চিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রকাশ না করাটা কি জরুরী ছিল না? সুদী

ব্যাংকসমূহে সব লক্ষ্যেই সুদের উপর ঋণ দেয়া হয়। তাই সেখানে শুধুমাত্র সুদভিত্তিক ঋণের লেনদেন হয়। পক্ষান্তরে সুদবিহীন ব্যাংকিং কোন একটি নির্দিষ্ট লেনদেনের নাম নয়; বরং এখানে বিভিন্ন ধরণের লেনদেন সম্পাদিত হয়। এগুলোর প্রত্যেকটির জন্য পৃথক পৃথক চুক্তি ও কর্মপদ্ধতি বিদ্যমান রয়েছে। এসকল লেনদেনের পর্যালোচনা করার পূর্বে এগুলোর বিস্তারিত কর্মপদ্ধতি কোন নির্ভরযোগ্য সূত্রের মাধ্যমে বুঝে নেয়া দরকার ছিল। যতক্ষণ পরিপূর্ণভাবে এসব কাজ করা যায়নি ততক্ষণ এ বিষয়ে কোন ফয়সালা না দেয়াটাই যুক্তিযুক্ত ছিল। পুরো বিষয় সুস্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত যেমনটি করা একজন দায়িত্বশীল মুফতীর কর্তব্য।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য ফতোয়া শুধুমাত্র কোন একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠানের কর্মপদ্ধতির বিষয়ে নয়; বরং সুদবিহীন ব্যাংকিং ব্যবস্থার সকল প্রচলিত পদ্ধতিসমূহের উপর প্রদান করা হয়েছে। যেজন্য প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানই পৃথক পৃথকভাবে নিজস্ব ব্যবস্থাপনা তৈরী করে নিয়েছে। তাই এ বিষয়ে কোন ফতোয়া প্রদানের পূর্বে সকল প্রতিষ্ঠানের সকল লেনদেনের পরিপূর্ণ যাচাই করাটা আরো বেশী প্রয়োজনীয় ছিল। কিন্তু যেহেতু তা করা হয়নি তাই অনেক আপত্তি ও প্রশ্ন শুধুমাত্র ভুল ধারণাভিত্তিক নয়; বরং বাস্তবতা বিবর্জিত এবং অপবাদমূলকও। আলোচ্য রচনাগুলো এ ধরণের ধারণা ভিত্তিক কথাবার্তায় ভরা। নিম্নে কতক বিষয় উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা হল, যাতে করে তারা কিরূপ বেপরোয়া, তা আন্দাজ করা যায়।

১	বলা হয়েছে : বিদ্যমান ইসলামী ব্যাংকসমূহে এমন বেশ কিছু লেনদেন ও চুক্তি পাওয়া যায় যা নাজায়েয হওয়ার ব্যাপারে কারো কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। যেমন, সুদী ঋণের লেনদেন। ব্যাংকিং কাউন্সিলের রুলস অনুসারে ইসলামী ব্যাংক স্টেট ব্যাংক থেকে সুদী ঋণ গ্রহণ এবং অনেক সরকারী বেসরকারী	এই বাক্যে এমন ভুল বরং অপবাদের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে যে, এর উপর إنا لله وإنا إليه راجعون পড়া ছাড়া আর কি করা যেতে পারে? এ কথাগুলো শতভাগ ভুল এবং বাস্তবতাবিবর্জিত। কোন ইসলামী ব্যাংক স্টেট ব্যাংক থেকে না কোন সুদীঋণ গ্রহণ করে, না কোন সরকারী বা বেসরকারী সংস্থাকে সুদীঋণ সরবরাহ করে, না

	সংস্থাকে ঋণ সরবরাহ, এমনকি সরকারী ঋণপত্র ক্রয় ইত্যাদিতে বাধ্য। মোট কথা, সুদ গ্রহণ ও প্রদান দুটোই নাজায়েয। সুদ প্রদানকে আইনী বাধ্যবাধকতা বলে চালিয়ে দিলেও এর অবৈধতা ও গুনাহ কখনো উঠে যাবে না। -(মুরাওয়াজাহ ইসলামী ব্যাংকারী পৃ:৩০৬-৭)	কোন সরকারী ঋণপত্র ক্রয় করে এবং এতে না কোন বাধ্যবাধকতা আছে। পরিতাপের বিষয় হল- সুদী লেনদেনের মতো এত কঠিন অপবাদ আরোপের সময়ও ঘটনার সঠিক যাচাইয়ের প্রয়োজনীয়তাটুকুও অনুভুত হয়নি।
২	উপরোক্ত কথাটির বাস্তব রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে এক লেখায় উল্লেখ করা হয় : "স্টেট ব্যাংকের আইন অনুযায়ী পুঁজির একটি অংশ সুদীঋণ হিসেবে স্টেট ব্যাংকে জমা রাখা জরুরী। যার ফলে সকল অংশীদারই সুদীঋণ প্রদানকারী সাব্যস্ত হয়"।	এই কথাটির উদ্দেশ্য হল- সুদবিহীন ব্যাংকগুলোও এই অর্থ স্টেট ব্যাংকে জমা রেখে সুদ আদায় করে। আফসোস! এই কঠিন অপবাদ আরোপকালেও বাস্তবতা যাচাই করার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করা হয়নি। বাস্তবতা হচ্ছে, প্রত্যেক ব্যাংকেরই স্টেট ব্যাংকে ডিপোজিটের কিছু অংশ জমা রাখার বাধ্যবাধকতা আছে। কিন্তু সুদবিহীন ব্যাংকগুলো এর উপর এক পয়সাও উসুল করে না। বরং এগুলো এমনভাবে জমা রাখে যেমনভাবে কোন মুসলমান কারেন্ট একাউন্টে নিজের টাকা জমা রাখে।
৩	একই লেখায় আরো উল্লেখ করা হয়েছে : "বর্তমানে বিদ্যমান সকল ইসলামী ব্যাংক স্টেট ব্যাংক থেকে সুদীঋণ নিতে বাধ্য। যার ফলে সকল অংশীদারই সুদীঋণ নেয়ার গুনাহে লিপ্ত"। আমি নিজে লেখককে জিজ্ঞাসা	এই ছোট বাক্যটিতে যে দু'টি কথা বলা হয়েছে তার উভয়টিই ভুল এবং বাস্তবতার সম্পূর্ণ বিপরীত। স্টেট ব্যাংকের পক্ষ থেকে এ ধরণের কোন বাধ্যবাধকতা কোন ব্যাংকের উপরই নেই যে, তার থেকে অবশ্যই সুদীঋণ নিতে হবে। তবে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ব্যাংকগুলোকে পুঁজি

	করি, আপনি কিসের ভিত্তিতে এটা লিখেছেন। তিনি আমাকে আমার কিতাব 'ইসলাম আওর জাদীদ মায়ীশাত ওয়া তিজারাত' এর ১১৬ নম্বর পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি দিলেন। যেখানে আমি সুদী ব্যাংকসমূহের কর্মপদ্ধতির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তা বলেছিলাম। সুদবিহীন ব্যাংকগুলোর সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। সুদবিহীন ব্যাংকিংয়ের আলোচনা এর আরো পরে 'সুদী ব্যাংকের বিকল্প ব্যবস্থা' শিরোনামে করা হয়েছে। যেখানে এসব কথার কিছুরই উল্লেখ নেই।	সংগ্রহ করার অনুমতি দেয়া হয়। কিন্তু সুদবিহীন ব্যাংকসমূহের জন্য শিরকাহ ভিত্তিক পৃথক ব্যবস্থা আছে যেখানে সুদ নেই। জনাব মুফতী হামীদুল্লাহ জান সাহেবের লেখায় আরো বলা হয়েছে, এই সুদবিহীন ব্যাংকগুলো বিশ্বব্যাংক থেকে সুদ ভিত্তিক ঋণ নেয়। অথচ বিশ্বব্যাংক থেকে ঋণ নেয়ার কোন ব্যবস্থাই নেই।
৪	আরো বলা হয়েছে : "এসব কৌশলের মাধ্যমে অর্জিত মুরাবাহা'র 'রিবাহ' বা লাভ এবং ইজারা'র 'উজরত' বা ভাড়া ১৯৮১'র সুদমুক্ত ব্যাংকিংয়ের 'মার্কআপ' থেকে মোটেই ভিন্ন কিছু নয়"।	বাস্তবতা হল, দু'টোর মাঝে আকাশ পাতাল পার্থক্য বিরাজমান। "১৯৮১ ইং-এর সুদবিহীন কাউন্টার এবং বর্তমান সুদবিহীন ব্যাংকিং" শিরোনামে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।
[illegible]	বলা হয়েছে : "অনেক লেনদেন চুক্তি'র অংশ হয় না। কিন্তু হিসাবধারীদের তা ভুগতে হয়। যেমন- মুদারাবাহ ফিসের সুস্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও তা উসুল করা হয়"। - (পৃ:৭৯)	এ কথাটিও বাস্তবতা বিবর্জিত। 'মুদারাবাহ ফিস' নামক কিছুর চুক্তিতেও উল্লেখ থাকে না, উসুলও করা হয় না। কথাটি কিসের ভিত্তিতে লেখা হয়েছে জানি না।
[illegible]	আরো বলা হয়েছে : "এভাবে যদি কোন হিসাবধারী	কথাটিও ভুল। হ্যাঁ! কয়েক বছর পূর্বে কিছু সময় এটার প্রচলন ছিল।

	ডলার জমা করে তাহলে ক্লায়েন্ট থেকে তার ফিস নেয়া হয়"।	এর কারণ ছিল, দেশে ডলারের মাধ্যমে পুঁজি বিনিয়োগের আইনগত অনুমতি ছিল না। তাই কোন ব্যক্তি ডলারে হিসাব খুললে তার ডলারগুলোকে রুপীতে পরিবর্তন করতে হতো অথবা সেই ডলার বাহিরে পাঠিয়ে পুঁজি বিনিয়োগ করতে হতো। এই রূপান্তর-স্থানান্তরের যে ব্যয় তা ফিস হিসেবে উসুল করা হতো। এ নিয়ম কিছুকাল চলার পর শরীয়া বোর্ডের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী বন্ধ করে দেয়া হয়।
৭	হযরত মাওলানা মুফতী হামীদুল্লাহ জান সাহেব দা: বা: তাঁর ফতোয়ায় বলেন : "এই চুক্তিতে 'ربح ما لم يضمن' এর বিরাট দোষ পাওয়া যায়। এটা এভাবে যে, ব্যাংক গ্রাহকের সাথে মুরাবাহা'র লেনদেন 'তাআতী' (ইজাব কবুলহীন আদান প্রদানের) ভিত্তিতে করে"। 'মুরাওয়াজাহ ইসলামী ব্যাংকারী' নামক কিতাবের ২৩৮ পৃষ্ঠাতেও কমবেশী একথাই বলা হয়েছে।	অথচ মুরাবাহা'র লেনদেন 'তাআতী' (ইজাব কবুলহীন আদান প্রদানের) ভিত্তিতে কখনো হয় না। আমার জানামতে এ ধরণের মুরাবাহা করে এমন কোন ব্যাংক নেই। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা আগামীতে করা হবে ইনশাআল্লাহ।
৮	বলা হয়েছে : "প্রচলিত মুরাবাহায় ইজাব-কবুল টেলিফোনের মাধ্যমে মৌখিকভাবে সম্পাদন করা হয়"। -(পৃ:২৩৮)	একথাটিও বাস্তবতা বিরোধী। যেমনটি সামনে আলোচিত হবে। বেচাকেনার চুক্তি নিয়মতান্ত্রিকভাবে লিখিত ইজাব-কবুলের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। টেলিফোনের মাধ্যমে নয়।

৯	বলা হয়েছে : "ব্যাংকসমূহে প্রচলিত মুরাবাহায় ব্যাংক প্রথমে মূল্য আদায় করে না। অথবা মূল্যের কোন অস্তিত্বই থাকে না। তাই ব্যাংকের মুরাবাহা পারিভাষিক মুরাবাহাতো দুরের কথা কোন সাধারণ বেচাকেনার আওতায় ও পড়ে না। বাস্তবতা হল, এই লেনদেনকে 'মুরাবাহা' নাম দেয়া শরয়ী দৃষ্টিতে খেয়ানত বলা যায় এবং তা নাজায়েয হিসেবে গণ্য হয়। –(মাসিক 'বাইয়িনাত' রমজান ও শাওয়াল সংখ্যা ১৪২৯ হিঃ পৃ:৮৮)	এটিও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও বাস্তববিরোধী কথা। যেমনটি সামনে আলোচিত হবে।
১০	বলা হয়েছে : "ব্যাংক এবং গ্রাহকের মাঝখানে টেলিফোন যোগাযোগের কারণে পূর্বের লেনদেনে বাস্তবে কোন নতুন চুক্তি সৃষ্টি হয়নি। যার উদ্দেশ্য হল, একই ব্যক্তি (গ্রাহক) ব্যাংকের পক্ষ থেকে ক্রয়ের প্রতিনিধি, আবার নিজের জন্য ক্রয় করছে বলে নিজে মূলব্যক্তিও"। –(পৃ: ২৪১–২৪২)	টেলিফোনের মাধ্যমে কোন আক্বদ বা চুক্তি কেন সৃষ্টি হতে পারে না সেদিকে না গিয়েই বলতে হয়, বাস্তবতা হল, এই লেনদেন টেলিফোনেই হয় না। যেমনটি উপরে উল্লেখিত হয়েছে। সুতরাং প্রতিনিধি ও মূলব্যক্তি একজন হবার প্রশ্নই আসে না।
১১	বলা হয়েছে: "ব্যাংকের মুরাবাহায় আগেভাগে চুক্তির কারণে গ্রাহক তাৎক্ষনিকভাবে মাল নিজের আয়ত্ত ও হেফাজতে আনতে বাধ্য। এমনকি দেরী করা হলে	এটাও বাস্তবতাবিবর্জিত কথা। যতক্ষণ পর্যন্ত বেচাকেনা সম্পন্ন না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত বিক্রয়পণ্যের দায়দায়িত্ব ব্যাংকের উপরই থাকে। (স্পষ্ট থাকা দরকার যে, 'ব্যাংক নিজের যিম্মায় নেয় না'

Contents

	ব্যাংককে ক্ষতিপূরণ দিতেও বাধ্য। -(পৃ: ২৩৯)	কথাটা প্রমান করার জন্য একটি ব্যাংকের পুরো বাক্যের অর্ধেক ২৩৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে। এর প্রয়োজনীয় অংশটুকু ফেলে দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা 'পণ্যদ্রব্য ব্যাংকের জামানতে আসা' শিরোনামে করা হবে।)
১২	বলা হয়েছে : "ইসলামী ব্যাংক সিকিউরিটি ডিপোজিটকে আসল মূল্যের মধ্যে গণ্য করে না। আলাদা রাখে। হিসাবধারীর পুরো সম্পদ থেকেই সুবিধা গ্রহণ করে। লাভের পরিমাণ পুরো অর্থের হিসাবে নির্ধারণ করে এবং নিজের অংশ উসুল করে"।	এটাও বাস্তব অবস্থার ভুল ব্যাখ্যা। বাস্তবতা এ রকম নয়।
১৩	বলা হয়েছে : "কোন হিসাবধারী যখন কোন ইসলামী ব্যাংকে একাউন্ট খুলতে যায় তখন তাকে বলা হয় না যে, তার ও ব্যাংকের মাঝে সম্পাদিত লেনদেনটি মুশারাকা, মুদারাবা না অন্য কিছু।"	এ কথাটিও সম্পূর্ণ বাস্তবতা বিরুদ্ধ। যে ফরমের মাধ্যমে একাউন্ট খোলা হয় তাতে সুস্পষ্টভাবেই উল্লেখ থাকে যে, ব্যাংকের সাথে তার মুদারাবা'র চুক্তি হচ্ছে এবং এর শর্তাবলীও পরিস্কারভাবে লেখা থাকে।
১৪	বলা হয়েছে : "কোন গ্রাহক ব্যাংকের এগ্রিমেন্ট চাইলে তাকে তা দেয়া হয় না। ফলে এখানে প্রথমতঃ চুক্তির সম্পর্কে অজ্ঞতার দোষ পাওয়া যায়"।	এ কথাটিও সম্পূর্ণ বাস্তবতা বিবর্জিত। যার সাথে যে চুক্তি হয় তার এগ্রিমেন্ট তাকে শুধু দেয়া হয় না; বরং এর উপর তার স্বাক্ষরও থাকে। এটা ছাড়া কারবারের কল্পনাই করা যায় না। যেহেতু ডিপোজিটরের সাথে মুদারাবার চুক্তি করা হয় তাই তাকে

		চুক্তিনামা সরবরাহ করে তাতে তার স্বাক্ষরও নেয়া হয়। আর যাদের সাথে মুরাবাহা, ইজারা অথবা মুশারাকা'র চুক্তি করা হয় তাদেরকেও ঐসব চুক্তিনামা সরবরাহ করা হয়। মুদারাবায় কাজের পুরো দায়িত্ব যেহেতু মুদারিবের উপর থাকে তাই ডিপোজিটর (রাব্বুল মাল)কে চুক্তিনামা সরবরাহ করার তেমন কোন প্রয়োজন পড়ে না। তবে কেউ দেখতে চাইলে তাকে বারণ করা হয় না। আর যদি কোন ব্যাংক তা দেখাতে না চায় বিশেষত তাদেরকে যারা এর শরয়ী দিক বুঝতে চায় তাহলে তা তাদের ভুল। কিন্তু এতে চুক্তি সম্পর্কে অজ্ঞতার দোষ পাওয়া যায় না। কেননা এ চুক্তিতে সে পক্ষ নয়।
১৫	বলা হয়েছে : "ব্যাংক লভ্যাংশ থেকেই তার পরিচালনা ব্যয়, পরিচালনা ফিস অথবা মুদারাবা ফিস ইত্যাদি পুরণ করবে। এর পর অবশিষ্ট লভ্যাংশ গ্রাহক ও ব্যাংকের (রাব্বুল মাল ও মুদারিবের) মধ্যে বন্টিত হবে। -(পৃ: ২০৪-২০৫)	এটিও সম্পূর্ণ বাস্তবতাবিবর্জিত কথা। ব্যাংক তার পরিচালনা ব্যয় লভ্যাংশ থেকে পুরণ করে না। যেই বাক্যাংশ থেকে এ ফলাফল বের করা হয়েছে তার সাথে লভ্যাংশ বন্টনের কোন সম্পর্ক নেই। এটা ব্যাংকের অন্যান্য সেবা যেমন- চেকবই, ড্রাফট ইত্যাদি ইস্যু করার সাথে সম্পৃক্ত। এখানে আবার মুদারাবা ফিসের উল্লেখ করা হয়েছে বাস্তবে যার কোন অস্তিত্বই নেই।

১৬	বলা হয়েছে : "ওয়েটেইজ (Weightage) এর প্রকৃত উদ্দেশ্য যার ব্যাখ্যা 'মেয়াদকালের ভিত্তিতে অর্থের মূল্যমান নির্ধারণ করা' হতে পারে"।	ওয়েটেইজ'র এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ভুল। ওয়েটেইজের (Weightage) উদ্দেশ্য এটা ছাড়া আর কিছু নয় যে, এক অংশীদারের লভ্যাংশের পরিমাণ অন্য অংশীদারের তুলনায় কমবেশী হবে। এই পার্থক্য যেকোন ভিত্তিতেই হতে পারে।
১৭	সামনে আরো বলা হয়েছে : "কোন ফার্ম কিংবা প্রজেক্টে অংশীদার হিসেবে দেরীতে যোগদানকারী অথবা নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বের অংশীদারকে ওয়েটেইজ (ডবরমযঃধমব) এর ভিত্তিতে লভ্যাংশ প্রদান করা মূলত 'শুবহাতুর রিবা' (সন্দেহজনক সুদ) এবং ফলতঃ বাস্তবিক পক্ষে যথাযথ লভ্যাংশের পরিবর্তে কাল্পনিক ও সন্দেহযুক্ত লভ্যাংশ প্রদানের শামিল। −(পৃ: ২১৬)	বাস্তবতা হল- ওয়েটেইজ বা ভার প্রত্যেক অংশীদারী কারবারের শুরুতেই নির্ধারিত হয়ে যায়। কারো দেরীতে বা পরে আসার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।
১৮	বলা হয়েছে : "আইনগত ব্যক্তি (অথবা তার কোন সদস্য) যখন নির্ধারিত সময়ের পূর্বে মুশারাকা সমাপ্তকারী কোন ব্যক্তির অংশ বাকী অন্য অংশীদারদের জন্য ক্রয় করবে তখন কি তা অন্য অংশীদারদের অংশে সংযোজন করা হয়? তাদেরও কি এর অংশ দেয়া হয়? −(পৃ: ২১৯)	প্রশ্নবোধক বাক্য দিয়ে কথাটি বলা হয়েছে। যার মাধ্যমে এটা বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, এতে অন্যান্য অংশীদারদের অংশে কিছু সংযোজিত হয় না। অথচ বিষয়টি সম্পূর্ণ বিপরীত। সম্মিলিত মাল দিয়েই ঐ অংশ কেনা হয় বিধায় তাতে সব অংশীদাররাই শরীক থাকেন। জানি না কিসের উপর ভিত্তি করে

		তাদেরকে অংশীদার করা হয় না বলে ধরে নেয়া হয়েছে?
১৯	বলা হয়েছে : "যতক্ষণ লাভ হয় ততক্ষণ ব্যাংক এবং ব্যাংকার বরাবর অংশীদার থাকে। আর যখন ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে যায় তখন কিছু সীমিত দায়িত্ব আদায় করে অনেক হক থেকে মুক্তিলাভ করে"। -(পৃ:৬৯)	এ কথাটিও 'সীমিত দায়িত্ব' এর উদ্দেশ্য না বুঝার কারণে বলা হয়েছে। সীমিত দায়িত্বের ধারণার মাধ্যমে বাস্তবে মুদারাবা হিসাবধারীদের লেনদেনে কোন প্রভাব পড়ে না। মুদারাবা'র মধ্যে এটাতো অবধারিত যে, যতক্ষণ কারবারে লাভ হবে ততক্ষণ রাব্বুল মাল এবং মুদারিব তাতে অংশীদার হবে, আর যদি বাস্তবেই লোকসান হয় তাহলেতো মুদারিব দায়িত্বমুক্ত হবেই। এখানে সীমিত দায়িত্বের কথা আসবে কেন? হ্যাঁ! মুদারিবের অবহেলা কিংবা বাড়াবাড়ির কারণে লোকসান হলে তাতে সে ক্ষতি পুষিয়ে দেয়া মুদারিবের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। সীমিত দায়িত্বের ধারণা এই দায়িত্বকে অস্বীকার করে না। আগামীতে এ ব্যাপারে আরো সবিস্তার আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ।
২০	হযরত মুফতী হামীদুল্লাহ জান সাহেব আরো লিখেছেন : "যেহেতু চুক্তির শুরুতে লভ্যাংশের পরিমাণ জানা যায় না তাই দৈনন্দিন ভিত্তিতে লভ্যাংশ বন্টনের একটি ফর্মূলা তারা পেশ করেছেন"।	এ কথাটিও বাস্তবতার বিপরীত। প্রত্যেক নির্দিষ্ট সময়ের শুরুতেই লভ্যাংশের পরিমাণ নির্ধারিত হয়ে যায় যে, শতকরা কতভাগ পুঁজির মালিক পাবে আর কতভাগ মুদারিব অর্থাৎ ব্যাংক পাবে। এটা প্রত্যেক নির্দিষ্ট সময়ের শুরুতেই নির্ধারিত হয়ে যায়। তবে এই

		পরিমাণ অনুযায়ী লভ্যাংশ বন্টনের জন্য দৈনন্দিন উৎপাদনের একটি হিসাবপদ্ধতি অনুমোদিত হয়েছে। এই পদ্ধতি সম্পর্কে জায়গামত বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ। এই পদ্ধতির কারণে লভ্যাংশের পরিমাণে কোন অজ্ঞতা সৃষ্টি হয় না। সর্বাবস্থায় নির্ধারিত অংশ অনুযায়ী লভ্যাংশ বন্টিত হবে। তবে লাভের পরিমাণ জানা যায় না। শরয়ী দৃষ্টিতে তা না জানাই উচিৎ। অন্যথায় সুদ হয়ে যাবে।
২১	এক লেখায় গাড়ীর মুরাবাহা মুয়াজ্জালা'র ত্রুটি বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, এতে জুয়া ইত্যাদি পাওয়া যায়। –(তাকমিলাতুর রাদ্দিল কিকহী পৃ:৪৫)	এখানে কিন্তু বলা হয়নি জুয়া কীভাবে হয়। মুরাবাহা মুয়াজ্জালা'র সাথে জুয়া'র কি সম্পর্ক? অনেক চিন্তা করেও মুরাবাহা মুয়াজ্জালা'র সাথে জুয়া'র দূরতম সম্পর্কও খুঁজে পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে মুরাবাহা মুয়াজ্জালা সংক্রান্ত আলোচনায় অধ্যয়ন করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।
২২	মুরাবাহা মুয়াজ্জালা'র এই ত্রুটিও বর্ণনা করা হয়েছে : "খরিদদারের মনে কষ্ট দেয়া। বিশেষত কিস্তি অনাদায়কালে যখন গাড়ী জব্দ করা হবে তখন অবশ্যই তার মনে কষ্ট দিতে হবে"। –(প্রাগুক্ত পৃ:৪৫-৪৬)	প্রথমত গাড়ীতে মুরাবাহা মুয়াজ্জালা হয় না; বরং ইজারা হয়, যেখানে গাড়ী ব্যাংকের মালিকানায় থাকে। সুতরাং জব্দ করার প্রশ্নই আসে না। আর যদিও মুরাবাহা মুয়াজ্জালা হয় তবুও গাড়ীর কাগজপত্র মূল্যের নিরাপত্তার জন্য রেখে দেয়াটাকে জব্দ বলা যায় না। বরং এটা

Contents

		বিক্রি করে আদায়যোগ্য মূল্য উসুল করে বাকী টাকা খরিদদারকে ফেরৎ দেয়া হয়।
২৩	মুরাবাহা মুয়াজ্জালা'র আরেকটি ত্রুটি বলা হয়েছে : "মিথ্যা ও ঘুষের আশ্রয় নেয়া। কেননা খরিদদার নিজের বিশ্বস্ততা বহাল রাখার জন্য ব্যাংকের সামনে নিজের কাল্পনিক সম্পদ প্রকাশ করবে। নির্ভরযোগ্য সূত্রে এটিও জানা যায় যে, ব্যাংক নিজেই গ্রাহককে বলে, তোমরা নিজেদের কাল্পনিক সম্পদ প্রকাশ করো। অতপর আজকাল যাচাইকারী মিথ্যা ও ঘুষ গ্রহণের মতো ঘৃণ্য কাজের গুনাহেও লিপ্ত হয়। -(প্রাগুক্ত পৃ:৪৬)	এই বক্তব্যটি পাঠকদের খেদমতে কোন মন্তব্য ছাড়াই রেখে দিলাম।

এসমস্ত কথাগুলো ইজতেহাদ-ইস্তেম্বাতের সাথে সম্পৃক্ত নয় যে, এখানে মতভিন্নতার সুযোগ থাকবে। এগুলোর সম্পর্ক ঘটনাবলীর সাথে। যেকোন ব্যক্তি যখনই চায় এর সত্যতা যাচাই করতে পারবে যে, কথাগুলো সম্পূর্ণ ভুল ও ভিত্তিহীন।

আমার দিকে ভুল ইঙ্গিত

এমনিতে আমার অনেক লেখা এমনসব ব্যাখ্যাসহ বিভিন্ন জায়গায় উদ্ধৃত করা হয়েছে যা আমার কল্পনাতেও কখনো আসেনি। কিন্তু একটি জায়গায় এ বিষয়ের সকল সীমারেখা অতিক্রম করে বলা হয়েছে : "ইসলামী ব্যাংকসমূহের বৈধতা দানকারী সম্মানিত ব্যক্তিবর্গও এ বাস্তবতা স্বীকার করে নেন যে, প্রচলিত ইসলামী ব্যাংকসমূহ কখনোই পরিপূর্ণ হালাল ও খাটি ইসলামী নয়; বরং কিছুটা হালাল ও কিছুটা হারাম। তাদের বক্তব্য অনুযায়ী ইসলামী ব্যাংকগুলোতে সুদী এবং অনৈসলামিক লেনদেন

সাধারণ ব্যাংকের তুলনায় কম। তাই 'আহওয়ান সুদ' বা সহজ সুদ হওয়ার ভিত্তিতে এগুলো ইসলামী ব্যাংক এবং এগুলোর সাথে লেনদেন করা শরয়ী দৃষ্টিতে জায়েয হবে"।

এ বক্তব্যে বৈধতা দানকারী ব্যক্তিবর্গে যদিও পরিস্কারভাবে কারো নাম উল্লেখ করা হয়নি তবুও টিকায় মাসিক 'নেদায়ে শাহী'র কোন প্রবন্ধের উদ্ধৃতি আছে যা আমার দিকেই ইঙ্গিত করে। তাছাড়া সামনের বাক্যে আমার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাই উপরোক্ত বক্তব্যে আমাকেই সম্বোধন করা হয়েছে। আমার নিবেদন হল- আমার এমন কোন লেখা কি পেশ করা যাবে যাতে আমি উপরোক্ত কথাগুলো উল্লেখ করেছি? বাস্তবতা হল- আমি জীবনে কোন দিনই এ ধরণের কথা *বলিনি যে, যেসব সুদবিহীন ব্যাংক* জায়েয হওয়ার ফতোয়া আমি দিয়েছি তাতে কিছু হালাল আর কিছু হারাম লেনদেন রয়েছে বিধায় তা 'সহজ সুদ'। এক পয়সার সুদকেও কখনো 'সহজ সুদ' বলা থেকে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক দেরহাম পরিমাণ সুদকেও অনেক ব্যভিচারের চেয়েও জঘন্য বলে উল্লেখ করেছেন। ভিত্তিহীন কোন কথার ইঙ্গিত কোন মানুষের দিকে করে তা প্রকাশ করা বৈধতার কোন পর্যায়ে পড়ে? টিকায় মাসিক 'নেদায়ে শাহী' মুরাদাবাদ ফেব্রুয়ারী ২০০৪ ইং সংখ্যার যে উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে সেই মাসিক সাময়িকীতে আমি কখনো কোন প্রবন্ধ লিখিনি। এই মাসিকটি আজো আমি চোখেও দেখিনি। তবে আমি শুনেছি যে, মক্কা মুকাররামায় কিছু উলামার সাথে আমার কথোপকথন মাসিক 'নেদায়ে শাহী'র উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করা হচ্ছে। এ সম্পর্কে ইতোপূর্বে 'প্রচেষ্টার বিভিন্ন ধাপ' শিরোনামে আলোচনা হয়েছে। সেখানেও উপরে উল্লেখিত বক্তব্য কখনো প্রদান করা হয়নি। যেহেতু পুস্তি কাটি আমি এখনো দেখিনি এবং আপত্তি উত্থাপনকারী কেউ তা আমার কাছে পাঠিয়ে সেখানে প্রকাশিত ইন্টারভিউটি প্রকৃতপক্ষে আমার ছিল কিনা তার সত্যায়নও করেননি। তাই অনেক সমালোচক যারা এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাদের আমি অনুরোধ করেছি যে, আপনারা যার উদ্ধৃতি দিচ্ছেন তা নিশ্চয় আপনাদের কাছে আছে, মেহেরবানী করে আমাকে এর একটি কপি সরবরাহ করলে তাতে কি লেখা আছে তা আমি জানতে পারবো। কিন্তু তারা তা করেননি। প্রথমতঃ যতটুকু আমার মনে পড়ে এটা কোন

নিয়মমাফিক ইন্টারভিউ ছিল না। কিছু অনানুষ্ঠানিক কথাবার্তা ছিল। আর ইন্টারভিউ হলেও এই অভিজ্ঞতাওতো সবার সামনে আছে যে, অনেক সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী নিজের ভাষায় অন্যের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে অনেক ভুল করে ফেলেন। তাই এটাকে আমার বলে চালিয়ে দেয়ার আগে আমার পক্ষ থেকে সত্যায়ন করে নেয়া উচিৎ ছিল। যাই হোক ! আমি কোন জিনিসকে 'সহজ সুদ' বলে কখনো জায়েয বলিনি। এটা আমার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অপবাদ।

এখানে একটি দুঃখজনক ঘটনার উল্লেখ করতে কোন অসুবিধা নেই। যাকে সমালোচকেরা শুধু উল্লেখই করেননি; বরং একে তাঁদের সমালোচনামূলক বক্তব্যের পক্ষে বড় ভিত্তি বলে ধরে নিয়েছেন। জনাব ড. আরশাদ জামান আমার একজন বন্ধু। দেশের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদদের মধ্যে তাঁকে গণ্য করা হয়। আমি যখন অর্থনীতি বিষয়ক আমার কিছু বক্তব্য উপস্থাপন করি যা পরবর্তীতে 'ইসলাম আওর জাদীদ মায়ীশাত ওয়া তিজারাত' নামে প্রকাশিত হয় তখন তিনি আমার সহযোগীতাও করেছিলেন। প্রায় পাঁচ বছর পূর্বে তিনি সুদবিহীন ব্যাংকে একটি একাউন্ট খোলেন। তখন তিনি এর কাগজপত্র পর্যালোচনা করে দেখতে পান যে, সেখানে আমার লিখিত মূলনীতিসমূহের বিপরীত কিছু বিষয় বিদ্যমান। অতএব, তিনি আমার নামে একটি বিস্তারিত চিঠি লিখে আমার কাছে তাশরীফ আনলেন। আমার যতদুর মনে পড়ে তিনি চিঠিটি দেখিয়ে আমাকে বলেছিলেন, এগুলো হল আমার কিছু প্রশ্ন। আপনি যেহেতু অনেক ব্যস্ত থাকেন তাই আপনার সাহেবজাদা জনাব মাওলানা ইমরান আশরাফকে যদি এর দায়িত্ব দেন তাহলে আমি তাঁর সাথে কথা বলে নিতে পারব। প্রয়োজন হলে আপনার স্মরণাপন্ন হব।

সুতরাং তাঁর ইচ্ছানুযায়ী আমি তাঁর লেখাটি আমার ছেলে মৌলভী ইমরান আশরাফের দায়িত্বে অর্পন করলাম। আমি আশ্বস্ত হলাম যে, আলাপ আলোচনার কোন পর্যায়ে পরামর্শের প্রয়োজন হলে তাঁরা আমার সাথে কথা বলবেন।

বিষয়টি তাদের কাছে সোপর্দ করার পর আমার অত্যধিক ব্যস্ততা ও সফরের কারণে সেই লেখা সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞেস করতেও আমার মনে ছিল না। অন্যদিকে মৌলভী ইমরান আশরাফের বক্তব্য হল, ডক্টর সাহেব

এর পর আমার সাথে ব্যাংককে গেছেন, তাঁর সাথে কিছু বৈঠকও হয় এবং সম্ভবত ই-মেইল যোগে কিছু চিঠি বিনিময়ও হয়। এরপর ডক্টর সাহেবের সাথে আমার দেখা সাক্ষাৎ হতে থাকল এবং ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে অনেক সম্মেলনে তাঁর সাথে ছিলাম কিন্তু ঐ প্রশ্নাবলী সম্পর্কে আর কোন কথা উল্লেখ না করায় মনে হল, এর কোন লিখিত জবাব দেয়ার প্রয়োজন নেই এবং বিষয়টি এখানেই শেষ হয়ে গেছে। বাস্তবতা হল, উপরোক্ত কারণেই এই প্রশ্নাবলীর কোন উত্তর দেয়া হয়নি। এই ঘটনার প্রায় চার বছর পর এই প্রশ্নাবলী ঐসব সমালোচকদের হাতে পৌছে। তারা মনে করলেন- এটা এমন এক ব্যক্তির লেখা যিনি খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদ, আমার সাথে যাঁর সুসম্পর্ক আছে এবং যেহেতু আমার পক্ষ থেকে এর কোন লিখিত উত্তর দেয়া হয়নি তাই সেখানে লিখিত সকল বিষয়গুলো শতভাগ সঠিক। সুতরাং ঐ প্রশ্নাবলীতে যেসব কথা লেখা ছিল সেগুলোকে তারা সুদবিহীন ব্যাংকিংয়ের বাস্তব কর্মপদ্ধতির শেষ কথা মনে করে নিজেদের সমালোচনার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন। তারা এটা যাচাই করার কিংবা আমার পক্ষ থেকে এর লিখিত জবাব না দেয়ার কারণ জেনে নেয়ার প্রয়োজনীয়তাটুকুও অনুভব করলেন না। পরবর্তী সময়ে তাদের ফতোয়া প্রকাশিত হলে জনাব ড. আরশাদ জামান সাহেব আমার কাছে এসে এর উপর দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তিনি আমার কাছে একটি চিঠি লিখেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে তিনি আমাকে অনুমতি না দেয়ায় আমি তা এখানে উল্লেখ করতে পারছি না। এরপরও তিনি আমার সাথে দেখা করার জন্য তাশরীফ আনলেন এবং ফতোয়ার সূত্রে তার লিখিত চিঠিতে বর্ণিত বিষয়গুলো পুণঃরায় উল্লেখ করলেন।

এটাকে আপনারা আমার ভুল বলতে পারেন যে, প্রশ্নাবলী আমার ছেলের কাছে হস্তান্তর করার পর আমার আর খোঁজ খবর নেয়ার কথাও মনে ছিল না। কিন্তু পরে যখন আমি তা পড়ি তখন দেখতে পাই যে, সেখানে অধিকাংশ কথা ঐসব ভুল ধারণার উপর ভিত্তি করেই বলা হয়েছে, যা উপরে নকশায় উল্লেখিত হয়েছে। আর কিছু কথা ছিল যেগুলো সামনে আলোচিত হবে। কিছু কথা সঠিক ছিল, তবে তা এমন লেনদেন বিষয়ক ছিল, শরয়ী দৃষ্টিতে যেগুলোতে কোন অসুবিধা হয় না এবং পরবর্তীতে তা পরিবর্তনও করে দেয়া হয়েছিল। এই সমালোচনাগুলো লেখা হয়েছে

তারও চার বছর পরে। অথচ তা সেই পুরনো লেনদেনের উপর ভিত্তি করে লিখিত হয়েছে যা ড. আরশাদ জামান সাহেব তাঁর লেখায় উল্লেখ করেছেন।

যেসব সমালোচনা এ ধরণের বাস্তবতাবিবর্জিত, যাচাই বাছাই বিহীন কথা এবং ভুল ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ তার মান ও গ্রহনযোগ্যতা স্পষ্ট। তা সত্ত্বেও এতে কিছু শরয়ী ও ফিক্বহী মাসায়িল আলোচিত হয়েছে বিধায় এবং কিছু লেখা শুধু ইলমী আলোচনায় সীমাবদ্ধ ছিল বিধায় এগুলোর উপর আলোচনা করা উচিৎ বলে মনে করছি যা নিম্নে বর্ণিত হচ্ছে।

وأسأل الله تعالى أن يوفقني لما يحبه ويرضاه ويعصمني من الزلل والخطل

সুদবিহীন ব্যাংক এবং কৌশল

বর্তমান সুদবিহীন ব্যাংকসমূহ হারাম হওয়ার ব্যাপারে মৌলিকভাবে যে দলিল খুব জোরেশোরে উপস্থাপন করা হয় তা হল, এর সকল কার্যক্রম হীলা বা কৌশলের ভিত্তিতে চলে। সুতরাং এটা শুধু হারাম নয়; বরং সুদী ব্যাংকের চেয়েও বেশী হারাম।

এই দলিলের সুগরা বা প্রথমাংশ হল, সুদবিহীন ব্যাংকিংয়ের সকল পদ্ধতিই কৌশল নির্ভর। আর কুবরা বা শেষাংশ হল, সকল হীলা বা কৌশল নাজায়েয অথবা কৌশলকে কার্যক্রমের মাধ্যম বানানো নাজায়েয।

বর্তমানে সুদবিহীন ব্যাংকসমূহে সর্বাধিক প্রচলিত পদ্ধতি হল, মুরাবাহা মুয়াজ্জালা। যার সার সংক্ষেপ হল, কোন ব্যবসায়ীর কোন মাল খরিদ করতে হলে তিনি তা ব্যাংকের কাছ থেকে বাকীতে ক্রয় করেন এবং ব্যাংক তৎকালীন বাজার মূল্যের তুলনায় কিছু বেশী দামে তা বিক্রয় করে। যেমন- কোন শিল্পপতির তুলা কিনতে হচ্ছে। কিন্তু তার কাছে তাৎক্ষনিকভাবে পয়সা নেই। ঐ অবস্থায় সুদী ব্যাংক তাকে টাকা দিয়ে সুদ উসুল করে। আর সুদবিহীন ব্যাংক তাকে টাকা দেয়ার পরিবর্তে বাজার থেকে তুলা কিনে তার কাছে বেশী দামে বাকীতে বিক্রয় করে। এই বিক্রয়ে ব্যাংক যেহেতু নিজের বিনিয়োগের উপর একটি নির্দিষ্ট পরিমান লাভ নেয় তাই একে মুরাবাহা বলে। আবার যেহেতু এই বিক্রয় বাকীতে হয় তাই তাকে 'মুরাবাহা মুয়াজ্জালা' বলা হয়। অনেকে এটাকে সুদের কৌশল হিসেবে সাব্যস্ত করে নাজায়েয বলেন। কেননা, এখানে বাকীতে বিক্রয়ের মাধ্যমে নগদ টাকার তুলনায় বেশী উসুল করা হয়। বলা হয়- বাকীতে বিক্রয়ে দাম বাড়ানো হয় বলে তা সুদ কিংবা সুদের মত হবে।

অতএব বলা হয়েছে: "মুরাবাহা ও ইজারা'র প্রচলিত বিনিয়োগ পদ্ধতি শতভাগ ইসলামী ও হালাল হবার দাবীদার কেউই নন। কোন না কোন পর্যায়ে সুদের সন্দেহ বা সুদের সাদৃশ্য হবার ব্যাপারে প্রায় সবাই বলেছেন। যার সর্বনিম্ন হুকুম হল, সংশয়। তাই আমরা বলি, ইজারা ও মুরাবাহা'র ভিত্তিতে ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ সুদের সন্দেহ, সাদৃশ্য ও সংশয় সৃষ্টির কারণে নাজায়েয। কেননা সুদের ক্ষেত্রে 'সন্দেহজনক সুদ'ও 'খাটি সুদ' এর হুকুমে শামিল।"

এর পরে আরো বলা হয়েছে: “মুরাবাহা ও ইজারা'র কিছু চুক্তিকে পরিশুদ্ধ ও প্রশস্থকরণের মাধ্যমে কাজের উপযুক্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- বাধ্যতামূলক দান ইত্যাদি। অথচ চুক্তি পরিশুদ্ধ ও প্রশস্থকরণের নিয়মগুলো সেখানেই প্রযোজ্য হয় যেখানে চুক্তি শুদ্ধ হওয়ার অন্যান্য সবদিক গুলো পরিপূর্ণ থাকে এবং মাত্র একটা দিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। অর্থাৎ এই প্রতিবন্ধকতা আংশিক; সামগ্রিক কিংবা মৌলিক নয়। যে মাসআলা'র মূলভিত্তিই সঠিক ও পরিশুদ্ধ নয় এবং শুদ্ধতার তুলনায় অশুদ্ধতার আধিক্য থাকে সেখানে পরিশুদ্ধ ও প্রশস্থকরনের আশ্রয় নেয়া যেতে পারে না।”

আরো বলা হয়েছে: “ইজারা এবং মুরাবাহ কে যেহেতু একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ লেনদেন হিসেবে মেনে নেয়া যায় না তাই এর প্রচলন ও কার্যকর করা হীলা বা কৌশল ছাড়া অন্য কিছু নয়। আর কৌশলের জন্যও যদি আমাদের পরিশুদ্ধ ও প্রশস্থকরনের নীতির আশ্রয় নিতে হয় তাহলে তা ভিক্ষুকের কাছেই ভিক্ষা চাওয়ার নামান্তর হবে। যেমনিভাবে একথা মানতে হয় যে, ইজারা এবং মুরাবাহাকে কৌশল হিসেবেই গ্রহণ করা হয়েছে তেমনিভাবে এটা অস্বীকার করা যাবে না যে, যেসব চুক্তি কৌশলভিত্তিক তা অশুদ্ধ না হয়ে পারে না। চুক্তি সংঘটিত হওয়া, কার্যকর হওয়া ও পরিপূর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে এই অশুদ্ধতা কোন বাধা সৃষ্টি করুক বা না করুক। অশুদ্ধ লেনদেন সম্পর্কে উল্লেখিত হুকুমের দিক থেকে বলা যায়, মুরাবাহা ও ইজারাকে প্রচলিত ইসলামী ব্যাংকসমূহকর্তৃক বিনিয়োগের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা اكل بالباطـــل। তথা অন্যায়ভাবে অন্যের মাল হাতিয়ে নেবার শামিল।”-(মুরাওয়াজাহ ইসলামী ব্যাংকারী পৃ:২৩১)।

আসল ঘটনা হল- অতীতের সমস্ত ফিক্বহবিদগণের বিপরীতে অবস্থান নিয়ে আমাদের কিছু ব্যাক্তি এই দাবী করেন যে, বাকীতে বিক্রয়ে নগদের তুলনায় বেশী মূল্য সাব্যস্ত করা নাজায়েয। এই অবস্থানের পক্ষে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ত্বাসীন সাহেব তার বিভিন্ন প্রবন্ধে সবচেয়ে বেশী ওকালতি করেছেন। আর যারা 'মুরাওয়াজা ইসলামী ব্যাংকারী' নামে কিতাব লিখেছেন তারা এর উপর পর্যালোচনা করতে গিয়ে শুরুতে বলেছিলেন, “এই মতামত নিজস্ব অবস্থানে খুব ভারসাম্যপূর্ণ এবং উল্লেখিত হাদীসের ইঙ্গিতের প্রতি চিন্তার আহবান করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি

সুপরিচিত ইসলামী অর্থনীতিবিদ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ত্বাসীন সাহেব রহ. ও তাঁর মতাদর্শী উলামা(?)দের ।”

পরবর্তীতে যখন ‘মুরাওয়াজা ইসলামী ব্যাংকারী’ নামে বইটি প্রকাশিত হয় তখন তারা এখান থেকে সুপরিচিত ইসলামী অর্থনীতিবিদ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ত্বাসীন সাহেব রহ. এর নাম কোন কারণে ফেলে দেন। কিন্তু বাস্তবতা হল- এটা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি। ঐ কিতাবে এটাও আছে যে, তিনি শুধু মুরাবাহা মুয়াজ্জালা নয় বরং মুরাবাহা মুতলাকা বা সাধারণ মুরাবাহাকেও নাজায়েয বলেন।

সুতরাং এসব কথার ভিত্তি হল- (ক) হযরত মাওলানা ত্বাসীন সাহেব রহ. এর এই দৃষ্টিভঙ্গি যে, ‘বাকীতে বিক্রয়ে মূল্য বৃদ্ধি জায়েয নাই’ অথবা (খ) এটি একটি কৌশল যা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা শুধু অনুচিতই নয়; বরং সম্পূর্ণ নাজায়েয, হারাম এবং অন্যায়ভাবে অন্যের মাল হাতিয়ে নেয়ার শামিল।

অথচ বাস্তবতা হল, যদি বাস্তব বেচাকেনা অর্থাৎ টাকার বিনিময়ে মাল বিক্রয় করাটা উদ্দেশ্য হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে বাকীতে বিক্রয়ের কারণে নগদ বিক্রয়ের তুলনায় অতিরিক্ত মূল্য নির্ধারণ করাটা কোন কৌশল বা হীলা নয়; বরং এটা জায়েয বেচাকেনার একটা প্রকার। যার বৈধতার ব্যাপরে চার মাযহাবই একমত। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হল, বেচাকেনার সময়ই মূল্য নির্ধারিত হতে হবে এতে কোন রকম অস্পষ্টতা থাকতে পারবে না। কৌশল বা হীলা সাধারণত তাকেই বলা হয় যেখানে আসল উদ্দেশ্য থাকে অন্য কিছু কিন্তু শর্ত পূরণের জন্য অন্য একটি লেনদেন করা হয়। অনেকেই মুরাবাহা মুয়াজ্জালাকে এমনভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন যেখানে তার শর্তসমূহ পরিপূর্ণ করা হয়নি। যেমন, অনেক আরব দেশে একে ক্রেডিট কার্ডে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত হয়েছে। ১৯৮১ সনে পাকিস্তানে এর আকারই পরিবর্তন করে ফেলা হয়েছিল। সেসময় আমি এগুলোকে কৌশল আখ্যায়িত করে এর কঠোর সমালোচনা করেছিলাম। কিন্তু বাস্তবেই যদি বেচাকেনা উদ্দেশ্য হয় তাহলে এটাকে কৌশল বলা যাবে না।

সুদবিহীন ব্যাংকিংয়ে যাদের সাথে মুরাবাহা করা হয় তারা বাস্তবেই ঐ জিনিস খরিদ করতে চায়। আর ব্যাংক তাদের কাছে সে জিনিস বিক্রয়

করে। কেউ কেনাবেচা করতে না চাইলে তার সাথে মুরাবাহা করা যাবে না। তবে কেউ মুরাবাহাকে অর্থ ভোগ করার জন্য ব্যবহার করতে চাইলে তা অবশ্যই কৌশল হবে। যদিও শর্তসাপেক্ষে তা জায়েয।

বাকীতে বিক্রয়ে মূল্য বড়িয়ে দেয়া ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ে

যে বেচাকেনা বাকীতে হওয়ার কারণে অতিরিক্ত মূল্য উসুল করা হয় তার বৈধতা শুধু চার মাযহাবের দৃষ্টিতে নয়; বরং কুরআন থেকেও এর বৈধতা প্রমাণিত হয়। যেসব মুশরিকেরা সুদ হারাম হওয়াকে মানত না কুরআনে কারীম তাদের আপত্তি উত্থাপন করেছে এভাবে إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا (সুরায়ে বাক্বারা : ২ : ২৭৫) অর্থাৎ, "বেচাকেনাতো সুদের মতই"। তাদের বক্তব্য ছিল: বেচাকেনা যদি জায়েয হয় তাহলে সুদও জায়েয হওয়া উচিৎ। অনেক বর্ণনা থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, এখানে বেচাকেনা বলতে তাদের উদ্দেশ্য ঐ বেচাকেনাই ছিল যেখানে বাকীর কারণে বিক্রেতা দাম বাড়িয়ে দিত। তাদের কথা হল: বাকীতে বিক্রয়ের সময় মূল্য বাড়িয়ে দিলে আপনারা জায়েয বলেন।

কিন্তু ক্রেতা সময়মত মূল্য আদায় করতে না পেরে বিক্রেতার কাছে আরো সময় চাইলে বিক্রেতা যদি অতিরিক্ত সময়ের কারণে অতিরিক্ত মূল্য দাবী করে তাহলে আপনারা তাকে সুদ সাব্যস্ত করে অবৈধ বলেন। তাই এটাকে দ্বৈত অবস্থান বলে মনে হয়। এর উত্তরেই আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰوا অর্থাৎ, "বেচাকেনাকে আল্লাহ হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন"। এখানে بيع শব্দটি যদিও ব্যাপক এবং নগদ ও বাকী উভয় ধরণের বেচাকেনাকেই বুঝায় তবুও এর শানে নুযুল বা অবতরনের কারণ ঐ বেচাকেনা; যাতে বাকীতে বিক্রয়ের কারণে মূল্য বৃদ্ধি করা হয় এবং সুদের সাদৃশ্য মনে করে এর উপরই আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে। উক্ত আয়াতে কারীমার এই শানে নুযুল অনেক তাবেয়ীর কাছ থেকে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর রহ. এই আয়াতের তাফসীরে বলেন:

"فهو الرجل اذا حل ماله على صاحبه فيقول المطلوب للطالب: زدني في الأجل وأزيد على مالك. فإذا فعل ذلك قيل لهم: هذا ربا . قالوا سواء علينا ان زدنا في أول البيع أو عند محل المال فهما سواء.... فأكذبهم الله تعالى لقولهم ان زدنا في أول البيع أو عند محل المال فقال: أحلّ الله البيع وحرّم الربوا" —(تفسير ابن ابي حاتم ٢: ٥٤٥ مكتبة مصطفى الباز)

অর্থাৎ, "এই আয়াতের উদ্দেশ্য হল- যখন কোন মানুষের অবশ্যকীয়ভাবে আদায় করতে হবে এমন মাল আদায়ের সময় আসে তখন সে ঋণদাতার কাছে গিয়ে বলে, আমার সময় বাড়িয়ে দিন আমি আপনার মাল (মূল্য) বাড়িয়ে দিব। তারা এরকম করলে তাকে সুদ বলা হত। এতে তারা বলল, আমরা বেচাকেনার শুরুতে সময় দেই কিংবা মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে সময় দেই উভয়টিই বরাবর। কথাটাকে আল্লাহ পাক এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, 'তারা বলে বেচাকেনাতো সুদের মতই'। কেননা তারা বলেছে আমরা বেচাকেনার শুরুতে সময় দেই কিংবা মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে সময় দেই উভয়টিই বরাবর। সুতরাং আল্লাহ পাক এর উত্তরে বলেছেন, আল্লাহ বেচাকেনাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।"

হযরত ক্বাতাদা রহ. জাহিলিয়্যাতের সুদের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন :

"إن ربا أهل الجاهلية: يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمى، فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاؤه زاده وأخرعنه"

অর্থাৎ, "জাহিলিয়্যাতের সুদ ছিল এমন– কোন ব্যক্তি কোন বস্তু একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে বাকীতে বিক্রয় করত। যখন মেয়াদ শেষ হত এবং ক্রেতা মূল্য পরিশোধে অপারগ হত তখন বিক্রেতা মূল্য বাড়িয়ে দিয়ে সময় বৃদ্ধি করত।"

হযরত ক্বাতাদা রহ. এর জাহিলিয়্যাতী সুদের ব্যাখ্যা উল্লেখ করে হাফিয ইবনে জারীর ত্বাবারী রহ. মুশরিকদের উত্থাপিত আপত্তির ব্যাখ্যায় বলেন:

"يقولون: أنما البيع- الذي احله الله لعباده- مثل الربوا، وذلك أن الذين كانوا يأكلون من الربوا من أهل الجاهلية. كان إذا حل مال أحدهم على غريمه يقول الغريم لغريم الحق: زدني في الأجل وأزيدك في مالك. فكان يقال لهما إذا فعلا ذلك: هذا ربا لايحل، فإذا قيل لهما ذلك قالا: سواء علينا زدنا في أول البيع أو عند محل المال، فكذبهم الله في قيلهم فقال: وأحل الله البيع" (تفسيرابن جرير٣: ١٠١و١٠٣)

অর্থাৎ "তারা বলত: যে বেচাকেনাকে আল্লাহ তার বান্দাদের জন্য হালাল করেছেন তা সুদের মতই। কেননা জাহিলিয়্যাতে যারা সুদ গ্রহণ করত মেয়াদ শেষ হবার পর তাদের কাছে ঋণগ্রহীতারা এসে বলত আমাকে সময় বাড়িয়ে দিন আমার মাল (মূল্য) বাড়িয়ে দিব। তারা উভয়ে এ কাজ করলে তাদের বলা হত- এটা সুদ যা হালাল নয়। এর উত্তরে তারা বলত- বেচাকেনার শুরুতে মূল্যবৃদ্ধি কিংবা সময় শেষ হওয়ার পর মূল্যবৃদ্ধি উভয়টিই আমাদের কাছে সমান। আল্লাহ পাক তাদের মিথ্যায়ন করে ইরশাদ করেন- আল্লাহ বেচাকেনাকে হালাল করেছেন।"

এখান থেকে পরিস্কার বুঝা যায় যে, কুরআনে আল্লাহ যে বেচাকেনাকে হালাল করেছেন তা থেকে العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب 'নির্দিষ্ট কোন কারণ নয় শব্দের ব্যাপকতাই মূখ্য' এই মূলনীতির ভিত্তিতে সকল প্রকার বেচাকেনা উদ্দেশ্য হলেও শানে নুযুলের আলোকে বলা যায় আয়াতের প্রথম ও প্রধান ইঙ্গিত ঐ বেচাকেনার দিকে যাতে মূল্য বাকীতে পরিশোধ করা হয়। বাকীর কারণে যদিও মূল্যবৃদ্ধি করা হয়। অনুরূপভাবে কুরআনের আয়াত أحل الله البيع এর মাধ্যমে এই বেচাকেনার বৈধতা প্রমাণিত হয়।

সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনদের উদ্ধৃতি

অধিকাংশ সাহাবা, তাবেঈন এবং আইম্মায়ে মুজতাহিদীন সকলেই এই বেচাকেনাকে জায়েয বলেছেন। মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাতে আছে:

حدثنا أبوبكر قال نا يحي بن زكريا بن أبي زائدة عن أشعث عن عكرمة عن إبن عباس رضــ قال: لا بأس أن يقول للسلعة: هي بنقد بكذا وبنسيئة بكذا ولكن لايفترقا إلا عن رضا.

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাজি. বলেন, কোন পণ্যের ক্ষেত্রে একথা বলতে অসুবিধা নেই যে, নগদ হলে এত দাম আর বাকীতে হলে এত দাম। তবে উভয়ের সন্তুষ্টির ভিত্তিতেই হতে হবে।

حدثنا أبوبكر قال نا حفص بن غياث عن ليث عن طاوس أنه سمعه قال: لابأس به إذا أخذه على أحد النوعين.

অর্থাৎ, হযরত ত্বাউস রহ. বলেন, এই দুয়ের মধ্যে যেকোন একটি গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই।

حدثنا أبوبكر قال نا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس وعن عبدالرحمن ابن عمرو الأوزاعي عن عطاء قالا: لابأس أن يقول: هذا الثوب بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا ويذهب به على أحدهما .

অর্থাৎ, হযরত ত্বাউস ও আত্বা রহ. বলেন, একথা বলাতে অসুবিধা নেই যে, এই কাপড় নগদে এত আর বাকীতে এত। এর যেকোন একটি গ্রহণ করতে পারবে।

حدثنا أبوبكر قال نا هاشم بن القاسم قال نا شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن الرجل يشتري من الرجل الشيء فيقول: إن كان بنقد فكذا وإن كان إلى أجل فبكذا قال: لابأس إذا انصرف على أحدهما قال شعبة فذكرت ذلك لمغيرة فقال: كان إبراهيم لايرى بذلك بأسا إذا تفرق على أحدهما.

(مصنف ابن ابي شيبة، كتاب البيوع والآقضية، رقم الروايات بالترتيب:٤٩٤،٤٩٩،٥٠٠،٥٠٤، ج:٦ص:١١٩—١٢١)

অর্থাৎ, হযরত শু'বা রহ. বলেন, আমি হিকাম ও হাম্মাদ রহ.-কে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি যে অন্যের কাছে কোন জিনিস ক্রয় করার সময় বলে- যদি নগদ হয় তাহলে এত দাম আর বাকীতে হলে এত দাম। উত্তরে তারা বলেছিলেন, এ দু'য়ের যেকোন একটি গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই। হযরত শু'বা বলেন, বিষয়টি আমি হযরত মুগিরা'র কাছে উল্লেখ করলে তিনি বলেন, হযরত ইবরাহীম রহ. এ দু'য়ের যেকোন একটি গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা মনে করেননি।

মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাকে আছেঃ

أخبرنا عبدالرزاق قال: أخبرنا معمرعن أيوب عن ابن سيرين أنه كان يكره أن يقول: أبيعك بعشرة دنانيرنقدا وبخمسة عشرإلى أجل قال معمر: وكان الزهري وقتادة لايريان بذلك بأسا إذا فارقه على أحدهما.

(مصنف عبدالرزاق، رقم الروايات بالترتيب:١٤٦٢٦،١٤٦٢٧،١٤٦٣٠، ج:٨، ص:١٣٦–١٣٨)

অর্থাৎ, নগদ হলে দশ দিনারে বিক্রয় করব আর বাকীতে হলে পনের দিনারে বিক্রয় করব– এরকম বলাটা হযরত ইবনে সীরীন রহ. অপছন্দ করতেন। হযরত মা'অমার বলেন, হযরত যুহরী ও ক্বাতাদা রহ. এর যেকোন একটিতে কোন অসুবিধা দেখেন না।

উপরোক্ত উদ্ধৃতিসমূহ থেকে বুঝা গেল, নগদ ও বাকী দুটির পৃথক মূল্য নির্ধারণের পর বেচাকেনার মজলিসেই যদি ক্রেতা ও বিক্রেতা যেকোন একটিকে গ্রহণ করে নেয় তাতে কোন অসুবিধা নেই। যেমন- তারা ঠিক করে নিল যে, বাকীতে বেচাকেনা হবে এবং নগদের তুলনায় দাম বেশী হবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাজি, হযরত ত্বাউস, হযরত আত্বা ইবনে আবি রিবাহ, হযরত হিকাম, হযরত হাম্মাদ ইবনে আবি সুলায়মান, হযরত ইবরাহীম নাখায়ী, হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব, হযরত শুরাইহ এবং ইমাম যুহরী প্রমুখ রহ. এ বেচাকেনাকে জায়েয বলেছেন। হযরত মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন রহ. নগদ ও বাকী উভয়ের জন্য পৃথক মূল্য

নির্ধারণকে অপছন্দ করেছেন। কিন্তু ব্যাহ্যত এর উদ্দেশ্য হল- বেচাকেনার মজলিসে যেকোন একটিকে নির্ধারিত করবে না। অতএব, ইমাম তিরমিযী রহ. بيعـــتين في بيعـــة একের মধ্যে দুই বেচাকেনার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন:

وقدفسربعض أهل العلم، قالوابيعتين في بيعة ان يقول: أبيعـــك هـــذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين، ولايفارقه على احد البيعتين، فـــإن فارقه على أحدهما فلا بأس اذا كانت العقدة على أحد منهما. —(جـــامع الترمذي، كتاب البيوع، باب ١٨، ١٢٣١)

সুতরাং চার ফিক্বহী মাযহাব এই মাসআলাতে একমত। (দেখুন– আল্লামা ইবনে কুদামা'র আলমুগনী খন্ড:৪ পৃ:২৯০, আল্লামা সারাখসী রহ.এর আল মাবসূত খন্ড:১৩ পৃ:৮, আদদাসূক্বী আলাশ শারহিল কাবীর খন্ড:১৩ পৃ:৫৮ এবং আল্লামা শারবিনী'র মুগনীল মুহতাজ খন্ড:২ পৃ:৩১)।

শামসুল আইম্মাহ সারাখসী রহ. ও হেদায়ার লেখক রহ. বলেছেন, বাকীতে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দাম বৃদ্ধি করা ব্যবসায়ীদের সাধারণ রেওয়াজ। এর ভিত্তিতেই ব্যবসা হয়ে থাকে। তাই কেউ কোন জিনিস বাকীতে ক্রয় করে তাতে মুরাবাহা করতে চাইলে তা ক্রেতার কাছে স্পষ্ট করে বলে দেয়া দরকার যে, আমি এটা বাকী ক্রয় করেছি। অন্যথায় ক্রেতা এটাকে নগদ দাম মনে করে এবং নগদ দামের উপর লাভ দিচ্ছে মনে করে প্রতারিত হবে। সুতরাং এটাকে স্পষ্ট না করাটা বাস্তব ক্রয়কৃত মূল্য বাড়িয়ে বলে মুরাবাহা করার নামান্তর। অতএব, আল্লামা সারাখসী রহ. বলেন:

وإذا اشترى شيئا بنسيئة فليس له أن يبيعه مرابحة حتى يبين أنه اشـــتراه بنسيئة؛ لأن بيع المرابحة بيع أمانة تنفي عنه كل تهمة وخيانة ويتحرزفيه من كل كذب وفي معاريض الكلام شبهة فلا يجوزاستعمالها في بيع المرابحة ثم لإنسان في العادة يشتري الشيئ بالنسيئة باكثر مما يشتري بالنقد فإذا أطلق

الإخبار بالشراء فإنما يفهم السامع من الشراء بالنقد فكان من هذا الوجه كالمخبر بأكثر مما اشترى به.

—(المبسوط، اول كتاب المرابحة ج:١٣، ص:٧٨، ط: دارالمعرفة)

একই মাসআলার উল্লেখ করে সাহেবে হেদায়া বলেন,

ألا ترى أنه يزداد في الثمن لأجل الأجل —

(هداية باب المرابحة مع فتح القدير ٦:١٣٣)

এখানেও সাধারণ ব্যবসায়ী রীতিনীতির মত বলা হয়েছে যে, বাকীর কারণে দাম বৃদ্ধি করা হয়। এ কথাটির উপর প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় যে, হেদায়ার লেখক كتاب الصلح এর এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন- কোন ব্যক্তি যদি আরেকজনের কাছে একহাজার টাকার মেয়াদী ঋণ পায় তাহলে ঋণগ্রহীতা নগদ পাঁচশত টাকায় তার সাথে সমঝোতা করে নিলে তা জায়েয হবে না। এর কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন, وذلك إعتياض عن الأجل وهو حرام —(فتح القدير ج:٧، ص:٣٩٢) অর্থাৎ, এটা মেয়াদের বদলায় নেয়া হচ্ছে বিধায় তা হারাম। এতে বুঝা যায় যে, মেয়াদের বিনিময়ে কোন টাকা উসুল করা তাঁর দৃষ্টিতেও হারাম। আসল কথা হল, মেয়াদের সরাসরি বিনিময় নেয়া জায়েয নেই। কিন্তু মেয়াদের কারণে কোন জিনিসে দামে সংযোজন ঘটানো জায়েয। তাই সাহেবে হেদায়ার দুই বাক্যের মধ্যে কোন বৈপরিত্য নেই।

হযরত মাওলানা আব্দুল হাই লাখনভী রহ.এর কাছে কোন প্রশ্নকারী এই দৃশ্যমান বৈপরিত্যের কথা উপস্থাপন করলে তিনি উত্তরে বলেন: "মেয়াদের কারণে মূল্যবৃদ্ধি করা নিঃসন্দেহে জায়েয। হেদায়ার কিতাবুল মুরাবাহা'র বাক্য ألا ترى أنه يزداد في الثمن لأجل الأجل দ্বারা সুস্পষ্টভাবে এটা প্রমাণিত হয়। এছাড়াও আরো অনেক কিতাবে এরকম বর্ণনা পাওয়া

যায়। ফসীহুদ্দীন হারভী শরহুল বিকায়া নামক কিতাবে 'কিতাবুল মুরাবাহা ফিন নাসিআহ' তে লেখেন: يزاد في الثمن لأجل الأجل মেয়াদের কারণে মূল্যবৃদ্ধি করা যাবে। কানযুদ্দাক্বায়িক্বের ব্যাখ্যাগ্রন্থ নাহরে ফায়েক্বে আছে : ألا ترى أنه يزاد في الثمن لأجله। আরেক ব্যাখ্যাগ্রন্থ বাহরুর রায়েক্বে আছে : لأن الأجل شبها بالمبيع، ألا ترى أنه يزاد في الثمن لأجل الأجل অর্থাৎ, 'মেয়াদ পণ্যের মত। কেননা মেয়াদের কারণে মূল্যবৃদ্ধি করা হয়'। কয়েক লাইন পরে উল্লেখ করা হয়েছে : الأجل في نفسه ليس بمال ولايقابله شيئ من الثمن حقيقة إذا لم يشترط زيادة الثمن بمقابلته قصدا، ويزاد في الثمن لأجله إذا ذكرالأجل بمقابلة زيادة الثمن قصدا অর্থাৎ, 'মেয়াদ নিজে মাল নয় এবং বাস্তবে তার কোন বিনিময় মূল্য নেই যখন তার বিপরীতে কোন অতিরিক্ত মূল্য শর্ত করা হয় না। তবে তার কারণে মূল্যবৃদ্ধি করা হয় যখন অতিরিক্ত মূল্যের বিপরীতে মেয়াদ উল্লেখ করা হয়।' এসমস্ত বর্ণনা থেকে জিজ্ঞাসিত বিষয়ের বৈধতা পরিস্কারভাবে প্রমাণিত হয়। এছাড়াও আরো ফিক্বহের কিতাবে উদ্ধৃতি আছে। অন্যদিকে সাহেবে হেদায়ার বর্ণনা :

لو كانت له ألف مؤجلة فصالحه على خمس مائة حالة لم يجز لأن المعجل خير من المؤجل وهو غيرمستحق بالعقد فيكون بإزاء ماحطه عنه، وذلك إعتياض عن الأجل وهو حرام

অর্থাৎ, 'যদি কেউ একহাজার টাকা মেয়াদী ঋণ পায় এবং ঋণগ্রহীতার সাথে নগদে পাঁচশত টাকায় সমঝোতা করে নেয় তাহলে জায়েয হবে না। কেননা ঋণ দেরীতে ফেরত পাওয়ার তুলনায় নগদে পাওয়া উত্তম। অথচ তাদের পূর্ব চুক্তির কারণে সে নগদে ফেরত পাওয়ার অধিকার রাখে না। সুতরাং হ্রাসকৃত টাকা ঐ মেয়াদের বিনিময়ে হবে। আর এটাই মেয়াদের বিনিময়; যা হারাম।' এই বক্তব্যের সাথে উপরে উল্লেখিত উদ্ধৃতিসমূহের কোন বিরোধ নেই। কেননা اعتياض عن الأجل বা মেয়াদের বিনিময় এবং

زيادة الثمن لأجل الأجل মেয়াদের কারণে মূল্যবৃদ্ধি করা দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। এই মাসআলায় মেয়াদ পূর্ব নির্ধারিত ছিল এবং পাঁচশত টাকার উপর সমঝোতা পরবর্তীতে করা হয়েছে। যার কারণে হ্রাসকৃত টাকা ঐ মেয়াদের বিনিময় হচ্ছে যা মাল নয়। তাই এটাকে হারাম বলা হয়েছে। আর পূর্বের মাসআলাগুলোতে মেয়াদের কারণে যে মূল্যবৃদ্ধি করা হচ্ছে তা পূর্ব নির্ধারিত ছিল না; বরং শুরুতেই নির্দিষ্ট মেয়াদের পর অতিরিক্ত মূল্য পরিশোধের বিষয়টি নির্ধারিত হয়। অতএব এর বৈধতা নিয়ে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা অবান্তর। والله اعلم লেখক- আবুল হাসানাত মুহাম্মদ আব্দুল হাই" –(মজমুয়ায়ে ফাতাওয়া, কিতাবুল বুয়ূ' খন্ড:১, পৃ: ৩৮৮)।

ইমাম আবু হানিফা রহ. ও ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর ব্যাখ্যা

সরাসরি শুধু এই বেচাকেনাকে নয়; বরং এই ধরণের বেচাকেনাকে কোন পূর্ব ঋণে সময় বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করা হলেও তা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর সুস্পষ্ট মতামত উদ্ধৃত করা হয়েছে। হযরত ইমাম মুহাম্মদ রহ. বলেন:

قال أبوحنيفة رضي الله عنه في الرجل يكون له على الرجل مائة دينارإلى أجل فإذاحلت قال له الذي عليه الدين بعني سلعة يكون ثمنها مائة دينارنقدا بمائة وخمسين إلى أجل: إن هذا جائزلأنهما لم يشترطا شيئا ولم يذكرا أمرا يفسد به الشراء. وقال أهل المدينة: هذا لايصلح —

"ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, কোন ব্যক্তি অন্যের কাছে একশত দিনার পায়। উক্ত মুদ্রা আদায়ের সময় হলে ঋণগ্রহীতা তাকে বলে, তুমি আমাকে একশত দিনার নগদ মূল্যের কোন জিনিস একশত পঞ্চাশ দিনারের বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বাকীতে বিক্রয় কর। এটা জায়েয। কেননা তারা এমন কোন শর্ত আরোপ করেনি এবং এমন কোন কথাও বলেনি যা দ্বারা বেচাকেনাটা ফাসেদ বা নষ্ট হয়ে যায়। মদীনাবাসীরা বলে– এ বেচাকেনা সঠিক নয়।"

এখানে ইমাম মুহাম্মদ রহ. মদীনাবাসীর যে মতামত উদ্ধৃত করেছেন তা ইমাম মালেক রহ.-এর মুয়াত্তা'য় এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে :

قال مالك في الرجل يكون له على الرجل مائة دينارإلى أجل فإذاحلت قال له الذي عليه الدين بعني سلعة يكون ثمنها مائة دينارنقدا بمائة وخمسين إلى أجل: قال مالك: هذا لا يصلح، ولم يزل أهل العلم ينهون عنه. قال مالك: وإنما كره ذلك لأنه إنما يعطيه ثمن ما باعه بعينه ويؤخرعنه المائة الأولى إلى الأجل الذي ذكره آخر مرة ويزداد عليه خمسين دينارا في تأخيره عنه، فهذا مكروه لايصلح، وهو أيضا يشبه حديث زيد بن أسلم في بيع أهل الجاهلية أنهم كانوا اذا حلت ديونهم قالوا للذي عليه الدين: أخذوا وإلاّ زادهم في حقوقهم وزادوه في الأجل

(موطا امام مالك، مع اوجزالمسالك ج:١١ ص:٢٣٠)

"কোন ব্যক্তি অন্যের কাছে একশত দিনার পায়। উক্ত মুদ্রা আদায়ের সময় হলে ঋণগ্রহীতা তাকে বলে, তুমি আমাকে একশত দিনার নগদ মূল্যের কোন জিনিস একশত পঞ্চাশ দিনারের বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বাকীতে বিক্রয় কর। যার মূল্য আগামীতে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের পর আদায় করতে হবে। এ ব্যাপারে ইমাম মালেক রহ. বলেন, এ বেচাকেনা জায়েয নয়। উলামায়ে কেরাম এ বেচাকেনা করতে নিষেধ করেন। ইমাম মালেক রহ. বলেন, এটা এজন্য মাকরূহ হবে যে, ঋণগ্রহীতা বিক্রিত জিনিসের নির্ধারিত দাম আদায় করবে এবং এ কারণে ঋণদাতা একশত দিনারের পূর্ব ঋণের দাবী সর্বশেষ উল্লেখিত নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত বিলম্ব করবে। এভাবে ঋণের দাবী বিলম্ব করার কারণে সে পঞ্চাশ দিনার অতিরিক্ত গ্রহণ করবে। এজন্যই এটা মাকরূহ; অবৈধ। এই বেচাকেনা আইয়ামে জাহিলিয়্যাতের ঐ বেচাকেনার মত, যা হযরত যায়দ বিন আসলাম রহ. এর হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে। আইয়ামে জাহিলিয়্যাতের লোকদের অভ্যাস ছিল, তারা কারো কাছ থেকে ঋণ ফেরত নেয়ার সময় হলে ঋণগ্রহীতাকে বলত– হয় ঋণ আদায় কর নয়তো সুদ দাও। এতে

ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধ করলে তা গ্রহণ করত। অন্যথায় ঋণগ্রহীতা তাদের প্রাপ্য বাড়িয়ে দিত আর ঋণদাতারা সময় বাড়িয়ে দিত।"

এখান থেকে বুঝা যায় যে, যে ক্ষেত্রে ইমাম মালেক রহ. ও ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতবিরোধ তা হল: যেমন, যায়েদের কাছে আমর একশত দিনার পায়। পরিশোধের সময় আসলে যায়েদ আরো সময় বৃদ্ধি করতে চায়। সময়বৃদ্ধির জন্য যায়েদ আমরের কাছে প্রস্তাব করল- আমি তোমার কাছ থেকে একশত দিনার মূল্যের কোন জিনিস দেড়শত দিনার দিয়ে আরো এতদিন সময়ের জন্য ক্রয় করব। এ বেচাকেনাকে যে পূর্ব ঋণের সময় বৃদ্ধির জন্য করা হচ্ছে তা তারা উল্লেখ করে না। অথচ এটা এ লক্ষ্যেই করা হয়েছে। ইমাম মালেক রহ. এটাকে মাকরূহ বলেন। কেননা, এ বেচাকেনা পূর্বের ঋণের সময় বৃদ্ধির জন্যই করা হয়েছে। ফিক্বহবিদদের পরিভাষায় যাকে قلب الدين অর্থাৎ, 'ঋণের পরিবর্তন' বলা হয়। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা রহ. এটাকে জায়েয বলেন। কেননা, এ বেচাকেনায় এমন কোন শর্ত আরোপ করা হয়নি যার ফলে পূর্ব ঋণের সময় বেড়ে যায়। মদীনাবাসীর বিপক্ষে দলিল পেশ করতে গিয়ে ইমাম মুহাম্মদ রহ. বলেন:

قال محمد: ولم لايصلح هذا؟ أرأيتم من كان له على رجل دين فقد حرم الله عليه ان يبيعه منه شيئا يربح عليه فيه! قالوا: لأنا نخاف ان يكون هذا ذريعة الى الربا، قيل لهم: وانتم تبطلون بيوع الناس بالتخوف ما تظنون من غيرشرط اشترطه ولا بيع فاسد معروف فساده الاّ بما تظنون وترون!! رجل كان يبايع رجلا بيوعا كثيرة وكان خليطا له معروفا بذلك وجب له عليه دين ثم باعه بعد ذلك سلعة تساوي بالنقد مائة دينار بمائة دينار وخمسين دينارا إلى أجل وهل هكذا يتبايع الناس؟ لأنهم اذا اخروا ازدادوا ما بأس بهذا، لئن حرم هذا على الناس، إنه لينبغي ان يكون عامة البيوع حراما — قالوا نرى أنه إنما باعه لمكان دينه، قيل لهم: إنهما لم

يتذاكرا الدين بقليل ولا كثير، قالوا: قد علمنا أنهما لم يتذاكرا الدين بقليل ولا كثير ولكنا نخاف ان يكون البيع كان بينهما من أجل ذلك، قيل لهم: أرايتم لو أجزتم البيع كما نجيزه أما كان لصاحب الدين ان يأخذ دينه من صاحبه وقد حل؟ قالوا: بلى له ان يأخذ دينه، قيل لهم فإذا كان له أن يأخذ دينه كان البيع جائزا فبأي وجه ابطلتم بيعه؟ ينبغي لكم ان تقولوا من كان له على رجل دين فليس له ان يبايعه بشيئ يربح عليه فيه فأي أمرأقبح من هذا : إن رجلا يعامل الناس له عليهم ديون انه لايجوزان يبيع منه متاعا ولا جارية ولا شيئا يربح عنيه فيه، ما ينبغي ان يسقط هذا على مثلكم ولا ينبغي ان تبطل البيوع بالظنون والظن يخطى ويصيب

(كتاب الحجة للامام محمدبن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى ج:٢ ص: ٢٩٤—٢٩٦ باب ما يجوز في الدين ومالا يجوز من ذلك، دارالمعارف النعمانية)

"ইমাম মুহাম্মদ রহ. বলেন: এ বেচাকেনা কেন সঠিক হবে না? বলুন! কেউ কারো কাছ থেকে ঋণ পেলে তার সাথে কি লাভজনক কোন বেচাকেনা আল্লাহ হারাম করেছেন? তারা বলেন, (আমরা এটাকে এজন্য নাজায়েয বলি যে,) আমরা আশংকা করি এটা সুদের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হবে। তাদেরকে উত্তরে বলা হবে: শুধু আপনাদের আশংকার কারণেই কি বেচাকেনাসমূহকে নাজায়েয বলব যেখানে এমন কোন শর্ত কিংবা লেনদেন নেই যা ফাসেদ বলে পরিচিত? অনেক মানুষ এমন আছে যারা কোন একজনের সাথে অনেক বেচাকেনা করে থাকে এবং তার সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক প্রসিদ্ধ হয়ে যায়। এমন ব্যক্তির উপর তার ঋণের দায় সৃষ্টি হয়ে গেল। অতপর ব্যবসায়িক সূত্রে সে তার কাছে নগদ একশত দিনার মূল্যের কোন জিনিস দেড়শত দিনারে বাকীতে বিক্রয় করে।

মানুষ কি এধরণের বেচাকেনা করে না? এই বেচাকেনাকে হারাম করা হলে মানুষের অধিকাংশ বেচাকেনাই হারাম করতে হবে। তারা (মদীনা বাসী) বলে, আমাদের ধারণা তারা ঋণের কারণেই এ বেচাকেনা করে। তাদেরকে বলা হয় যে, তারাতো ঋনের কথা কম বেশী মোটেই উল্লেখ

করেনি। তারা বলে, আমরা জানি যে তারা কম বেশী ঋণের কথা মোটেই উল্লেখ করেনি। কিন্তু আমাদের আশংকা এ বেচাকেনা তারা ঋণের কারণেই করছে। তাদেরকে বলাহয়, আচ্ছা বলুন তো! যদি আপনারাও এ বেচাকেনাকে আমাদের মত জায়েয বলেন তাহলে বেচাকেনার পর যখন ঋণের নির্ধারিত সময় চলে আসবে তখন ঋণদাতা কি তার ঋণ উসুল করার অধিকার রাখবে না? তারা বলবে, হ্যাঁ! তার তো ঋণ উসুল করার অধিকার থাকবেই। আমরা বলি, যদি ঋণ উসুল করার অধিকার তার থাকে তাহলে এই বেচাকেনাও জায়েয হবে। কি কারণে আপনারা এটাকে বাতিল গণ্য করেন? উত্তরে আপনাদের বলতে হবে, কেউ কারো কাছে ঋণ পেলে তার সাথে লাভজনক কোন বেচাকেনা করা জায়েয নয়। কোন মানুষ লোকজনের সাথে লেনদেন করে আবার তার দেয়া কিছু ঋণও তার কাছে আছে; ঐ ব্যক্তি ঋণগ্রহীতার কাছে তার কোন মাল, দাসী বা অন্য কোন জিনিস বিক্রয় করা জায়েয হবে না– এজাতীয় কথা বলা কতইনা খারাপ!!? আপনাদের মত লোকদের পক্ষে এ বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া উচিৎ নয়। আর শুধু ধারণার উপর ভিত্তি করে কোন বেচাকেনাকে বাতিল গণ্য করা উচিৎ নয়। কেননা ধারণা সঠিকও হতে পারে ভুলও হতে পারে।"

এই বক্তব্যের উপর প্রশ্ন আসতে পারে যে, ইমাম আবু হানিফা রহ. ও ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর এই অবস্থান দৃশ্যত ঐ হাদীসের বিপরীত মনে হয় যা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স রাজি. থেকে বর্ণিত হয়েছে:

لايحل سلف و بيــع অর্থাৎ 'ঋণ ও বেচাকেনা দুটো একসাথে হালাল নয়' –(আবুদাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী)। এর উত্তর হল: ইমাম মুহাম্মদ রহ. এই হাদীসকে 'ঋণের সাথে শর্তযুক্ত বেচাকেনা কিংবা বেচাকেনার সাথে শর্তযুক্ত ঋণ' এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে উল্লেখ করেছেন। হাফেয যীলয়ী রহ. এই হাদীসের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন,

ورواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار وفسره فقال: أما السلف والبيع فالرجل يقول للرجل: أبيعك عبدي هذا بكذا وكذا على أن تقرضني كذا وكذا (نصب الراية ج:٤ ص:٤٥؛ كتاب البيوع، باب البيع الفاسد)

অর্থাৎ "হাদীসটি ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান রহ. কিতাবুল আসারে উল্লেখ করে এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, কোন ব্যক্তি অন্যজনকে যদি বলে আমি তোমার কাছে আমার এই দাসটি বিক্রয় করব এই শর্তের ভিত্তিতে যে, তুমি আমাকে এতটাকা ঋণ দিবে তাহলে তাতে ঋণ ও বেচাকেনা যুক্ত হবে"।

হযরত ইমাম মালেক রহ. এর ব্যাখ্যা

উল্লেখ থাকা দরকার যে, হযরত ইমাম মালেক রহ.ও বাকী বিক্রয়ের কারণে মূল্যবৃদ্ধিকে নাজায়েয মনে করেন না। কেননা একটি উদ্ধৃতি ইমাম আব্দুল বার রহ. উল্লেখ করেছেন:

وقال مالك فيمن قال أبيعك هذاالثوب بعشرة نقدا أو بخمسة عشرإلى أجل إذا كان البائع والمبتاع كل واحد منهما إن شاء أن يترك البيع تــرك ولايلزمه فلا بأس بذلك

(الاستذكارالجامع لمذاهب فقهاءالأمصار، باب النهي عن بيعتين في بيعة ج:٢٠ ص:١٧٨ ط: مؤسسة الرسالة)

অর্থাৎ "ইমাম মালেক রহ. বলেন, কোন ব্যক্তি যদি অন্যকে বলে আমি তোমার কাছে এই কাপড় দশ টাকায় নগদ বিক্রয় করব অথবা পনের টাকায় বাকীতে বিক্রয় করব এবং ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ে চাইলে ঐ বেচাকেনাকে পরিহার করতে পারে অর্থাৎ তা তাদের জন্য আবশ্যকীয় হয়ে যায় না, তাহলে এতে কোন অসুবিধা নেই"।

ইমাম মালেক রহ. এর 'মুদাওয়ানা'য় আছে:

قلت: أرأيت إن قال: له إشتر مني إن شئت بالنقد فبدينار وإن شــئت إلى شهرين فبدينارين، وذلك في طعام أو عرض: ماقول مالك في ذلــك؟ قال: قال مالك: إن كان هذا القول منه وقد وجب البيع على أحدهما ليس له أن يرجع في البيع فالبيع باطل، وإن كان هذاالقول والبيــع غــيرلازم لأحدهما: إن شاء أن يرجعا في ذلك رجعا لأن البيع لم يلزم واحدامنــهما

فلابأس بأن يأخذ بأي ذلك شاء بالنقد أو بالنسيئة . —(المدونة، كتاب البيوع الفاسدة مبحث في الرجل يشتري ما أطعمت المقثاة شهرا أوشرطين في بيع والثمن مجهول ج:٣ ص: ١٩٠،١٩١ ط: دارالكتب العلمية)

অর্থাৎ "আমি বলি: যদি কোন মানুষ কাউকে বলে 'তুমি আমার কাছ থেকে চাইলে কোন খাদ্য বা বস্তু ক্রয় করতে পার নগদে হলে এক দিনার আর দুই মাস সময় বাকীতে হলে দুই দিনার' তাহলে এ ব্যাপারে ইমাম মালেক রহ. কী বলেন? বলা হয়: ইমাম মালেক রহ. বলেন, যদি কথাটি এমতাবস্থায় বলা হয় যে, তাদের কোন একজনের উপর বেচাকেনাটা অবধারিত হয়ে গিয়েছে এবং তা প্রত্যাহার করতে না পারে, তাহলে তা বাতিল হবে। আর যদি বেচাকেনা উভয়ের কারো উপরই অবধারিত না হয়; ইচ্ছা করলে উভয়ের যে কেউ তা প্রত্যাহার করতে পারে তাহলে তাতে কোন অসুবিধা নেই। ইচ্ছা করলে তা নগদে কিংবা বাকীতে গ্রহণ করতে পারবে"।

সুতরাং বুঝা গেল: নগদ ও বাকী বিক্রয় উভয়টির পৃথক পৃথক মূল্য ধরা হলে এবং শুধু বলার কারণে বেচাকেনাটা উভয় পক্ষের উপর অবধারিত না হলে; বরং ক্রেতা স্বেচ্ছায় বাকীতে লেনদেনের মূল্যকে গ্রহণ করে বেচাকেনা করে নেয়– সেক্ষেত্রে ইমাম মালেক রহ.-এর কোন আপত্তি নেই। তবে ইমাম মালেক রহ.-এর আপত্তি সেক্ষেত্রে আছে, যেখানে বেচাকেনাকে قلب الدين অর্থাৎ ঋণ পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ, এধরণের বেচাকেনা যদি কোন পূর্বঋণের মেয়াদ পূর্ণ হবার সময় করা হয় এবং এর মাধ্যমে ঐ ঋণের মেয়াদ বাড়ানো হয় তাহলেই সেটাকে তিনি নাজায়েয বলেন। যদিও এই বেচাকেনাতে পূর্বের ঋণের মেয়াদ বাড়ানোর কথা উল্লেখ করা হয় না, তবুও ঋণদাতা উক্ত বেচাকেনার কারণে স্বপ্রণোদিত হয়ে সাবেক ঋণের মেয়াদ বাড়িয়ে দেন। এজন্যই এখানে সুদের সন্দেহ আছে। ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর জবাব দিতে গিয়ে বলেন, এই নতুন বেচাকেনার কারণে পুরনো ঋণে কোন আইনগত পার্থক্য সৃষ্টি হয়নি; বরং এর পরও ঋণদাতা আইনগতভাবে তা

দাবী করতে পারবেন। তাই এখানে সুদের সন্দেহ থাকার অবকাশ নেই। আর আইনগতভাবে দাবী করার অধিকার থাকা সত্ত্বেও যদি সে কিছু সময় বাড়িয়ে দেয় তাতে কোন অসুবিধা নেই।

সুদবিহীন ব্যাংক ব্যবস্থায় মুরাবাহা মুয়াজ্জালাকে যেহেতু قلب الـــدين অর্থাৎ ঋণ পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় না; বরং ক্রেতার কাছে তাই বিক্রয় করা হয় বাস্তবে যা সে ক্রয় করতে চায় এবং এই বেচাকেনা কোন পূর্বঋণের সময়বৃদ্ধির জন্যও করা হয় না তাই এটা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা রহ. ও ইমাম মালেক রহ. এর মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই। এটা উভয় মাযহাবেই জায়েয।

فله أوكسهما হাদীসের ব্যাখ্যা

সমসাময়িক কালের অনেকেই বাকীর ক্ষেত্রে দাম বৃদ্ধি জায়েয না হওয়ার উপর নিম্নোক্ত হাদীস দলিল হিসেবে পেশ করেছেন:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أوالربا

(سنن ابي داود مع بذل المجهود ج:١٥، ص:١٣٤-١٣٦، كتاب الإجارة باب فيمن باع بيعتين في بيعة)

অর্থাৎ "হযরত আবু হুরায়রা রাজি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি এক বেচাকেনার মধ্যে দুই বেচাকেনা করবে তাতে বিক্রেতার অপেক্ষাকৃত কম মূল্য আদায় করার অধিকার থাকবে। অন্যথায় সুদ হবে।"

এই হাদীসের কারণে সমসাময়িক অনেকেই বলেছেন, বেচাকেনার মধ্যে নগদ ও বাকী দুটি দাম উল্লেখ করা হলে কম দাম অর্থাৎ নগদের উপর বেচাকেনা বৈধ হবে। বাকীর কারণে অধিক দাম নেয়া সুদ হবে। কিন্তু কথা হচ্ছে, প্রথমত এই হাদীসের বর্ণনাসূত্র দূর্বল। হাফেয মুনযিরী রহ. তালখীসে আবুদাউদে এর বর্ণনাসূত্রের উপর কথা বলেছেন।

হযরত আল্লামা যফর আহমদ উসমানী রহ. এর বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেখেন-

وفي إسناده محمد بن عمرو بن علقمة ، وقد تكلم فيه غيرواحد وقد تفرد به وأيضا هو مخالف لما هوالمشهورعنه وهو((أنه نهى عن بيعتين في بيعة)) فإنه يدل على فساد البيع بخلاف ما رواه عنه أبوداؤد، فإنه يدل على جوازه بأوكس الثمنين فلا يحتجّ بما تفرد به بل المقبول من حديثه ما وافقه عليه غيره

(إعلاءالسنن، باب النهي عن بيعتين في بيعة ج:١٤، ص:١٨١، ط: ادارة القرآن)

অর্থাৎ "এ হাদীসের বর্ণনাসূত্রে মুহাম্মদ বিন আমর বিন আলক্বামা আছেন। তাঁর ব্যাপারে অনেক উলামায়ে কেরাম কথা বলেছেন। একমাত্র তিনিই এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এ বিষয়ে তাঁরই (মুহাম্মদ বিন আমর) আরেকটি হাদীসে মাশহুর আছে; যা এই বর্ণনার বিপরীত। সেটি হল: أنه نهى عن بيعتين في بيعة অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ এক বেচাকেনার মধ্যে দুই বেচাকেনাকে নিষেধ করেছেন। এ হাদীসে মাশহুর থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ ধরণের বেচাকেনা (যেখানে এটা নির্ধারিত হয়নি যে, বেচাকেনা নগদ মূল্যে নাকি বাকী মূল্যের ভিত্তিতে হচ্ছে) ফাসেদ তথা অবৈধ। আবু দাউদ শরীফের ঐ হাদীস এর বিপরীত, যা থেকে বুঝা যায় যে, এ ধরণের বেচাকেনা কম মূল্যের উপর সংঘটিত হয়। অতএব, মুহাম্মদ বিন আমর বিন আলক্বামা এককভাবে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তা দ্বারা দলিল দেয়া সঠিক হবে না; বরং তাঁর ঐ হাদীসটিই গ্রহণযোগ্য হবে, যাতে অন্য বর্ণনাকারীরাও তার অনুসরন করেছেন।"

আল্লামা খাত্তাবী রহ. এর ব্যাখ্যায় লেখেন:

لا أعلم احدا من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث وصحح البيع بأوكس الثمنين إلا شيئا يحكى عن الأوزاعي وهومذهب فاسد وذلك لما يتضمنه هذه العقدة من الغرر والجهل (بذل المجهود ج:١٥، ص:١٣٤-١٣٦)

অর্থাৎ "আমার জানা মতে এমন কোন ফিক্বহবিদ নেই যিনি এই হাদীসে বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করেছেন। শুধু ইমাম আওযায়ী রহ.-এর একটি

মত আছে যা মাযহাব হিসেবে ফাসেদ। কেননা, এধরণের বেচাকেনা (যেখানে এটা নির্ধারিত হয়নি যে, বেচাকেনা নগদ মূল্যে নাকি বাকী মূল্যের ভিত্তিতে হচ্ছে) ধোকা ও অজ্ঞতায় পরিপূর্ণ।"

এর পর আল্লামা খাত্তাবী রহ. ঐ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যা এ'লাউস সুনান থেকে উদ্ধৃত করে উপরে আলোচিত হয়েছে। অতপর কিছু উলামায়ে কেরামের মতামত উল্লেখ করা হয়েছে যারা হাদীসটি প্রমাণিত ধরে নিয়ে বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তবে এর মধ্যে হযরত গাংগুহী রহ. সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। যার সারাংশ হল- যদি কোন ব্যক্তি ক্রেতাকে বলে নগদ কিনলে পাঁচ টাকা আর বাকীতে কিনলে দশ টাকা এবং দুয়ের মধ্যে কোনটি নির্ধারিত করাও হয়নি, তাহলে এ বেচাকেনাটি শরয়ী দৃষ্টিতে ফাসেদ হয়ে যাবে। কিন্তু এর পরও যদি ক্রেতা ঐ জিনিসটি আয়ত্তে নিয়ে অবৈধভাবে ব্যবহার করে ফেলে যেমন- খানার জিনিস হলে খেয়ে ফেলে, তাহলে হাদীসে বলা হয়েছে ক্রেতাকে বাজার মূল্য পরিশোধ করতে হবে; যা নিশ্চয় বাকীতে ক্রয়ের মূল্য থেকে কম হবে। এজন্যই হাদীসে বলা হয়েছে 'বিক্রেতার অপেক্ষাকৃত কম মূল্য আদায় করার অধিকার থাকবে'। এ ক্ষেত্রে সে যদি বেশী মূল্য দাবী করে, তাহলে বুঝতে হবে সে ঐ ফাসেদ বেচাকেনাকে কার্যকর করছে। অতএব, বেচাকেনাটি ফাসেদ তথা অবৈধ হবে, যা সুদের হুকুমে। হযরত মাওলানা গাংগুহী রহ.-এর এই ব্যাখ্যা হযরত মাওলানা ইয়াহইয়া রহ.-এর বরাতে 'বজলুল মাজহুদ' কিতাবে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে:

وكتب مولانا محمد يحي المرحوم من تقرير شيخه رضي الله عنه: قوله من باع بيعتين إلى آخره ظاهره مخالف للمذاهب كلها إلا أن يقال في معناه: إن من باع شيئا على أنه بخمسة إن كان ناجزا أو بعشرة إن كان نسيئة ثم افترقا قبل تعين الثمن، ولأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة وكان الحكم فيه الفسخ إلا أن المشتري استهلك المبيع أو أكله فلا يجب فيه إلا المثل او القيمة، وهو أوكس عادة من الثمن المتعين بينهما في البيعتين معا، فصار المعنى أن من باع بيعتين كذلك ثم لم يبق المبيع حتى

يفسخ البيع فله أن يأخذ القيمة أو المثل ولا يأخذ الثمن لأنه لو أخذ الثمن ولم يفسخ البيع فقد أربى لكونه عقد عقدافاسدا، والعقود الفاسدة كلـــها داخلة في حكم الربا— انتهى (بذل المجهود ج:١٥، ص:١٣٤—١٣٦)

সুদের সন্দেহ

যেহেতু এই বেচাকেনায় মেয়াদের কারণে মূল্যবৃদ্ধি করা হয় তাই অনেকেই একে সুদের সাথে তুলনা করে বলেন, সুদের সন্দেহও সুদের হুকুমে। সুতরাং, এ ধরণের বেচাকেনা নাজায়েয হওয়া উচিৎ। সুদবিহীন ব্যাংকিংয়ের উপর আপত্তি উত্থাপন করে যেসব লেখা এসেছে, তার একটিতে বলা হয়েছে: "মুরাবাহা ও ইজারা'র প্রচলিত বিনিয়োগ পদ্ধতি শতভাগ ইসলামী ও হালাল হবার দাবীদার কেউই নন। কোন না কোন পর্যায়ে সুদের সন্দেহ বা সুদের সাদৃশ্য হবার ব্যাপারে প্রায় সবাই বলেছেন। যার সর্বনিম্ন হুকুম হল, সংশয়। তাই আমরা বলি, ইজারা ও মুরাবাহা'র ভিত্তিতে ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ সুদের সন্দেহ, সাদৃশ্য ও সংশয় সৃষ্টির কারণে নাজায়েয। কেননা, সুদের ক্ষেত্রে 'সন্দেহজনক সুদ'ও 'খাটি সুদ' এর হুকুমে শামিল। অনেক ফিক্বহবিদ ও আমাদের আকাবিরগণ অনেক লেনদেনকে শরয়ী ভিত্তিতে সহজ হবার পরও সুদের সাদৃশ্যের কারণে নাজায়েয বলেছেন। তাছাড়া যেসব লেনদেন হালাল না হারাম নিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করা যায় না তা থেকে বিরত থাকাই কামেল মুমিনের মেরাজ।"

(মুরাওয়াজা ইসলামী ব্যাংকারী পৃ: ২৩০)

এই বক্তব্যে একদিকে সুদের সন্দেহ, সুদের সাদৃশ্য অন্যদিকে ফতোয়া, তাক্বওয়া ইত্যাদিকে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। এখানে যদি শুধু বলা হত: 'এধরণের লেনদেন থেকে বিরত থাকা কামেল মুমিনদের মেরাজ' এবং তাক্বওয়ার মেরাজ বিমুখ মানুষের জন্য একে নাজায়েয বলা না হত, তাহলে তা বোধগম্য ছিল। কিন্তু সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে সুদের যে সাদৃশ্য তাকে ফিক্বহবিদগণের কাছে গ্রহণযোগ্য সন্দেহের সমান সাব্যস্ত করে এ ধরণের লেনদেন সরাসরি নাজায়েয বলা ফিক্বহবিদ ও

আকাবিরদের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাগুলোকে কলমের এক খোচায় বাতিল করা ছাড়া সম্ভব নয়। যার কিঞ্চিত বিস্তারিত আলোচনা নিম্নে উল্লেখিত হল।

সুদের সন্দেহকে প্রকৃত সুদের মত তখনই গণ্য করা হয় যখন মূদ্রার বিনিময়ে মূদ্রার লেনদেন হয় বা امـــوال ربويـــة অর্থাৎ, হাদীসে যেসব সম্পদের লেনদেনে সুদের কথা বলা হয়েছে তার পারস্পরিক লেনদেন হয়। কিন্তু মূদ্রার বিনিময়ে যখন অন্য কোন জিনিস ক্রয় করা হয় তখন তাতে মেয়াদের বিপরীতে মূল্যবৃদ্ধি করা সুদ নয় কিংবা প্রকৃত সুদের সমতুল্য সন্দেহজনক সুদও নয়। এ কথাটি ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর উপরোল্লিখিত বক্তব্য থেকেও সুস্পষ্ট হয়। আল্লামা ইবনে আবেদীন রহ. এটাকে আল্লামা হানুতী রহ.-এর উদ্ধৃতি দিয়ে আরো সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন:

علله الحانوتي بالتباعد عن شبهة الربا لأنها في باب الربا ملحقة بالحقيقة ووجّه أن الربح في مقابلة الأجل لأن الأجل وإن لم يكن مالا ولا يقابلـــه شيئ من الثمن لكن اعتبروه مالا في المرابحة إذا ذكرالأجل بمقابلة الثمن

(ردالمحتارقبيل كتاب الفرائض، ج:٦ ص:٧٥٧ إيج إيم سعيد)

অর্থাৎ "হানুতী রহ. এর কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, এই লেনদেন সুদের সন্দেহ থেকে মুক্ত। কেননা, সুদের সন্দেহও প্রকৃত সুদের অন্তর্ভূক্ত। (সুদের সন্দেহমুক্ত হবার) কারণ হল, এখানে লাভ মেয়াদের বিপরীতে। কেননা, মেয়াদ নিজে মাল না হলেও এবং মূল্যের কোন অংশ সরাসরি তার বিনিময়ে না হলেও মুরাবাহা'য় যখন তাকে মূল্যের বিপরীতে উল্লেখ করা হয় তখন ফিক্বহবিদগণ তাকে মাল হিসেবে গণ্য করেন।"

অনুরূপভাবে আল্লামা ইবনে কুদামা بيع عينة এর বর্ণনাধারায় বলেন,

وإن اشتراها بعرض أوكان بيعها الأول بعرض فاشتراها بنقد جاز، وبه قال أبوحنيفة ـــ ولانعلم فيه خلافا؛ لأن التحريم إنما كان لشبهة الربا ولا ربا بين الأثمان والعروض ـــ فأما إن باعها بنقد ثم اشتراها بنقد آخر مثل أن يبيعها بمائتي درهم ثم اشتراها بعشرة دنانيرفقال أصحابنا: يجوز؛ لأنهما

جنسان لايحرم التفاضل بينهما، فجاز كما لواشتراها بعرض أو بمثل الثمن وقال أبوحنيفة: لايجوز استحسانا لأنهما كالشيئ الواحد في معنى الثمنية ولأن ذلك يتخذ وسيلة الى الربا، فأشبه مالو باعها بجنس الثمن الأول — وهذا أصح إن شاءالله تعالى.

(المغني لإبن قدامة: كتاب البيوع، باب المصراة ج:٤ ص:٢٥٦، ٢٥٧ ط: دارالكتاب العربي)

অর্থাৎ "কেউ তার বিক্রয়কৃত জিনিস অন্য কোন বস্তুর বিনিময়ে ক্রয় করলে অথবা প্রথম বেচাকেনা (মুদ্রা ছাড়া) কোন বস্তুর বিনিময়ে হয়েছিল এখন তা মুদ্রার বিনিময়ে ক্রয় করলে তা জায়েয। এটা ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মত। এতে আমাদের জানামতে কোন ভিন্নমত নেই। কেননা, সুদের সন্দেহের কারণেই হারাম হয় অথচ মুদ্রা ও বস্তুর বিনিময়ে কোন সুদ হয় না।

তবে কেউ যদি একধরণের মুদ্রায় বিক্রয় করে অতপর অন্যধরণের মুদ্রায় ক্রয় করে যেমন- দুইশত দেরহামে বিক্রয় করে দশ দিনারে ক্রয় করে, তাহলে আমাদের (হাম্বলী) ফিক্বহবিদগণ একে জায়েয বলেছেন। কেননা, এ দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। তাই এতে কমবেশী হলে হারাম হবে না। এটা এমনভাবে জায়েয হবে যেমনিভাবে কেউ ঐ একই দামে কিংবা অন্য কোন বস্তুর বিনিময়ে ক্রয় করলে জায়েয হয়। তবে ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেছেন, استحسانا অর্থাৎ, সুক্ষ্ম কিয়াসের কারণে এটা জায়েয হবে না। কেননা, মূল্য হবার দিক থেকে দেরহাম দিনার উভয়টি একই জিনিস। এবং এজন্যও যে, এটাকে সুদের মাধ্যম বলেও গণ্য করা হয়। তাই এটা যেধরণের মুদ্রায় বিক্রয় করেছে ঐধরণের মুদ্রার বিনিময়ে (কম দামে) ক্রয় করার মত হবে।"

এখানে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, লেনদেনে যখন মুদ্রা ও দ্রব্যের বিনিময় হবে তখন তাতে সুদ কিংবা সুদের সন্দেহ কোনটিই হবে না। এ কারণেই বেচাকেনা যদি দ্রব্যের বিনিময় হয় তাহলে দ্রব্যের বাজার মূল্য কমবেশী যাই হোক উভয় পদ্ধতিকে ইমাম মুহাম্মদ রহ. ও ইমাম আবু

হানিফা রহ. জায়েয বলেছেন। কেউ কোন জিনিস টাকা পয়সার বিনিময়ে বেশী দামে বিক্রয় করে কম মূল্যমানের দ্রব্যের বিনিময়ে ক্রয় করলে ঐ সন্দেহ সৃষ্টি হয় যেটি নগদ দাম কমানোর ক্ষেত্রে হয়। কিন্তু এটা যেহেতু মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রার লেনদেন নয় তাই বলা হয়েছে যে, সুদের সন্দেহ নেই।

এতে বুঝা যায় যে, প্রকৃত সুদের সমতুল্য সন্দেহজনক সুদ তখনই হবে যখন মুদ্রার বিনিময় মুদ্রার সাথে হবে। অথবা, সুদ হয় এমন বস্তুকে পারস্পরিক বিনিময় করা হবে। যেমন- দেরহাম দিনারের পারস্পরিক লেনদেনকে উপরোক্ত আলোচনায় ইমাম আবু হানিফা রহ. না জায়েয বলেছেন। এখানে এ প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না যে, عينة তেও তো মুদ্রার বিনিময় দ্রব্যের সাথে হয়। তা সত্ত্বেও তাকে না জায়েয বলা হয়েছে। কেননা, সেখানে দ্রব্যটি বিক্রেতার কাছে ফিরে আসে বিধায় প্রকৃত পক্ষে এটা দ্রব্যের বেচাকেনাই নয়; বরং এটা একটা কৃত্রিম ব্যবস্থা (এ ব্যাপারে عينة এর আলোচনায় উল্লেখ করা হবে)। সেখানে মুদ্রার বিনিময় মুদ্রার সাথেই হয়। তাই সেখানে সুদের সন্দেহ বিদ্যমান। কিন্তু বাস্তবে যেখানে মুদ্রার বিনিময়ে দ্রব্যের বেচাকেনা হয় সেখানে সুদের সন্দেহ অবশিষ্ট থাকে না। উপরোক্ত আলোচনা থেকে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়।

যাই হোক! তাক্বওয়ার বিষয় ভিন্ন। তবে কি সন্দেহজনক সুদের আওতাভুক্ত বলতে ঐসব লেনদেনকে বুঝাবে সাধারণ মানুষ যাকে সুদের সাদৃশ্য মনে করে? ফতোয়ার দৃষ্টিতে কি তাকে হারাম বলা হবে? যদি তাই হয়, তাহলে সুদের নামে প্রভিডেন্ট ফান্ডে যে টাকা জমা দেয়া হয় তাতে শুধু সুদের সাদৃশ্য নয় বরং নামও ব্যবহৃত হয়। তা সত্ত্বেও বর্তমান সময়ের উলামায়ে কেরাম এটাকে সুদ বলে মানেন না; জায়েয বলেন। (দেখুন "প্রভিডেন্ট ফান্ড পর যাকাত আওর সুদ কা মাসআলা" নামক পুস্তিকা, যা হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ শফী রহ, হযরত মাওলানা ইউসুফ বিন্নুরী রহ. এবং হযরত মাওলানা মুফতি অলি হাসান রহ.-এর ঐকমত্যে প্রকাশিত হয়েছিল)। তাছাড়া যে বর্ণনাধারায় আল্লামা হানুতী রহ. এ কথা বলেছেন যে, এতে সুদের সন্দেহ নেই তাতে বাহ্যিকভাবে ও সাধরণভাবে সুদের সাদৃশ্য সুদবিহীন ব্যাংকগুলোর মুরাবাহা'র তুলনায় বেশী। কেননা,

তিনি যে মুরাবাহা'র কথা বলেছেন তা قلب الدين এর ভিত্তিতে ছিল। قلب الدين সম্পর্কিত আলোচনা সামনে আসবে।

কিছু সমালোচক আমার দুটি বাক্যাংশের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যেখানে আমি সন্দেহের কারণে কোন লেনদেনকে না জায়েয বলেছি। একটি হল- হুন্ডির ক্ষেত্রে সমমূল্যের চেয়েও অধিকের উপর বেচাকেনা এবং অন্যটি হল- ঋণগ্রহীতার বিলম্বের ক্ষেত্রে ঋণদাতার সময়ের ক্ষতিপূরণ। দু' জায়গাতেই আমি বলেছি, এখানে সুদ না থাকলেও সুদের সন্দেহ অবশ্যই আছে; তাই এটা না জায়েয। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য হচ্ছে- সেখানে লেনদেন ছিল মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রার। তাই ঐ সন্দেহের কারণে না জায়েয বলা হয়েছে। উপরেই বলা হয়েছে যে, সন্দেহজনক সুদ প্রকৃত সুদের সমতুল্য তখনই হবে যখন মুদ্রার বিনিময় মুদ্রার সাথে হবে। অথবা, সুদ হয় এমন বস্তুকে পারস্পরিক বিনিময় করা হবে। এটাকে ঐ লেনদেনের জন্য যুক্তি হিসেবে গ্রহণ করা যায় না যেখানে লেনদেন মুদ্রার সাথে দ্রব্যের বিনিময়ে হবে। বিষয়টি বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

উপমহাদেশের উলামাদের ফতোয়া

আমাদের নিকট অতীতের ছোট বড় সকল মুফতি সাহেবান এ ধরণের বেচাকেনাকে কোন রাখঢাক ছাড়াই জায়েয ঘোষণা করেছেন।

হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা থানভী রহ. বলেন: "(প্রশ্ন) এক ব্যক্তি তার মাল নগদ এক টাকায় এবং বাকীতে সতের আনায় বিক্রয় করে। এটা কি জায়েয? (উত্তর) এটা দুই প্রকার। এক. বেচাকেনার সময় মূল্য নির্ধারণ করা হয়নি; বরং ক্রেতাকে প্রত্যাখ্যান করে বলা হয়, যদি এখন মূল্য পরিশোধ কর তাহলে একটাকা অন্যথায় সতের আনা নিব। এ ক্ষেত্রে মূল্যের অজ্ঞতার কারণে জায়েয হবে না। দুই. প্রথমেই ক্রেতার সাথে ঠিক করে নেয়া হয় নগদ নিবে না বাকীতে নিবে। নগদ নিতে চাইলে বিক্রেতা একটাকা এবং বাকীতে নিতে চাইলে সতের আনা সাব্যস্ত করে। এটা জায়েয।" (ইমদাদুল ফাতাওয়া, কিতাবুল বুয়ূ' পৃ: ২০, খন্ড:৩)

হযরত মাওলানা যফর আহমদ উসমানী রহ. ইমদাদুল আহকামে লেখেন: "(উত্তর) যদি এ রকম বলে যে, নগদ পাঁচ টাকায় এবং বাকীতে

দশ টাকায় বিক্রয় করছি- তাহলে জায়েয হবে না। আর যদি নগদ ও বাকী পৃথক মূল্য উল্লেখ না করে পাঁচ টাকার মাল দশ টাকায় বিক্রয় করে তাহলে জায়েয হবে।" (ইমদাদুল আহকাম, পৃ:৩৭৫-৩৭৬, খন্ড:৩)

হযরত মুফতি মুহাম্মদ শফী রহ. ইমদাদুল মুফতিয়ীনে লেখেন: "(প্রশ্ন) যায়েদ বাকীর কারণে বাজারদর থেকে কম বিক্রয় করে। এটা যদি জায়েয হয় তাহলে ফতোয়া কাজী খান ও মাবসূতে যে না জায়েয লেখা হয়েছে তার উত্তর কী? (উত্তর) বাকীর কারণে বাজার দর থেকে কম বিক্রয় করা জায়েয; তবে মানবিকতার পরিপন্থী ও মাকরূহ। এটা জায়েয হওয়ার পক্ষে দলিল হিসেবে হেদায়াতে বাবুল মুরাবাহা'য় উল্লেখ করা হয়েছে: ألا ترى أنه يزاد في الثمن لأجل الأجل 'তুমি কি দেখ না যে, মেয়াদের কারণে মূল্য বৃদ্ধি করা হয়'। আল বাহরুর রায়েক্বে বলা হয়েছে: لأن للأجل شبها بالمبيع. ألاترى أنه يزاد في الثمن لأجل الأجـــل অর্থাৎ 'মেয়াদ পণ্যদ্রব্যের সদৃশ। তুমি কি দেখ না যে, মেয়াদের কারণে মূল্য বৃদ্ধি করা হয়'। আরো কয়েক লাইন পরে বলা হয়:

الأجل في نفسه ليس بمال، ولايقابله شيئ من الثمن حقيقة إذا لم يشترط زيادة الثمن بمقابلته قصدا فاعتبر مالا في المرابحة احترازا عن شبهة الخيانة و لم يعتبرمالا في حق الرجوع عملا بالحقيقة ــ انتهى

(البحرالرائق، ص:١١٤ ج:٦ ومثله في الشامي من المرابحة ص:١٧٥ ج:٢)

অর্থাৎ 'মেয়াদ নিজে মাল নয়। প্রকৃত পক্ষে তার কোন বিনিময় মূল্যও নেই যদি তার বিপরীতে মূল্য বাড়ানোর শর্ত করা না হয়। তবে মুরাবাহা'য় তাকে মাল হিসেবে গণ্য করা হয়েছে খেয়ানতের সন্দেহ থেকে বাঁচার জন্য। কিন্তু প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে বাস্তবতার প্রতি লক্ষ্য রেখে মাল গণ্য করা হয়নি।'

মুফতিয়ে হিলব আল্লামা কাওয়াকিবী ফাওয়ায়েদে সমিয়্যাহতে লেখেন:

لأن المؤجل والأطول أجلا أنقص مالية من الحال ومن الأقصرأجلا

অর্থাৎ 'মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী জিনিস মূল্যমানের দিক থেকে নগদ ও কমমেয়াদীর তুলনায় কম'।

(ফাওয়ায়েদ সামিয়্যাহ, বাবুল মুরাবাহা, পৃ:৩৮, খন্ড:২)।

উপরোক্ত উদ্ধৃতিসমূহ থেকে বাকীতে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মূল্যবৃদ্ধির বৈধতা পরিস্কারভাবে জানা যায়। ক্বাজীখান কিতাবের বাবুল আজালি ওয়াদ দাইনি এবং বাবুর রিবা'য় এর বিপরীত কোন কিছু বাহ্যিক দৃষ্টিতে গোচরীভুত হয়নি। তাই ক্বাজীখান ও মাবসূত কিতাবের পৃষ্ঠা নম্বর ও অধ্যায় ইত্যাদি উল্লেখ থাকলে উত্তরে কিছু বলা যেত। তবে হেদায়ার الإعتياض عن الأجل حرام কথাটি এর বিপরীত মনে হলেও তাতে প্রকৃত পক্ষে ইজাব-কবুলের সাথে নগদ কিনলে এই দাম আর বাকীতে কিনলে এই দাম -এই শর্ত যুক্ত করে দেয়ার ক্ষেত্রের কথা বলা হয়েছে । অথবা এই শর্ত যুক্ত করা হয় যে, একমাসের বাকীতে কিনলে দশ টাকা আর দুই মাসের বাকীতে কিনলে বারো টাকা।

নোট: পরবর্তীতে অনুসন্ধানে ক্বাজীখানের উদ্ধৃতিরও সন্ধান মিলে। সেখানেও উপরে উল্লেখিত ক্ষেত্রে না জায়েয বলা হয়েছে। সাধারণভাবে বাকীতে বিক্রয়ের কারণে মূল্যবৃদ্ধি করাকে নিষিদ্ধ করা হয়নি। তার উদ্ধৃতিতে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। "والله تعالى أعلم"

(ইমদাদুল মুফতিয়ীন পৃ:৮৫৯-৮৬০)

ইমদাদুল মুফতিয়ীনে অন্য এক জায়গায় হযরত মুফতি মুহাম্মদ শফী রহ. লেখেন: "(উত্তর) এ মাসআলা কিছুটা বিস্তারিত আলোচনার দাবী রাখে। লেনদেনের সময় কোন দাম নির্দিষ্ট না করে যদি বলে, বাকীতে নিলে মনপ্রতি তিন টাকা আর নগদ নিলে মনপ্রতি দুই টাকা অথবা যদি বলে, একমাসের বাকীতে মনপ্রতি দুই টাকা আর তিন মাসের বাকীতে মনপ্রতি তিন টাকা দাম হবে তাহলে তা না জায়েয।

قال في العالمكيرية من الباب العاشر في الشروط التي تفسد البيع: رجل باع على أنه بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا أو إلى شهر بكذا وإلى شـــهرين بكذا لم يجز. كذا في الخلاصة عالمگيري نولكشوري (ص:١٥٤ ج:٣)

আর যদি প্রথমেই জেনে নেয় যে, লোকটি বাকীতে কিনবে, তাহলে নগদের তুলনায় বেশী দাম নেয়া জায়েয হবে। যেমনটি হেদায়ার মুরাবাহা অধ্যায়, বাহরুর রায়েক্ব, দুররে মুখতার, ফতোয়া শামী ও ফাতহুল ক্বাদীরে আছে। প্রশ্নে মূল্যবৃদ্ধির যে প্রকারের কথা বলা হয়েছে তা দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভূক্ত; তাই লেনদেনটি না জায়েয। তবে ক্বাজীখানের উদ্ধৃতির কারণে একটি সন্দেহ সৃষ্টি হয় যার বিস্তারিত বর্ণনা রবিউল আউয়াল সংখ্যায় আসবে ইনশাআল্লাহ। والله أعلم" (ইমদাদুল মুফতিয়ীন, পৃঃ ৮৬০)

হযরত মুফতি মাহমুদুল হাসান গাঙ্গুহী রহ. ফতোয়া মাহমুদীয়াতে লিখেন: "(প্রশ্ন) উদাহরণস্বরূপ, যায়েদ সেলাই মেশিন অথবা রেডিও ইত্যাদির ব্যবসা করতে চায়। এ ব্যবসায় প্রচলন হল, নগদ বিক্রয়ের জন্য পৃথক মূল্য নির্ধারিত হয় আর কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ করতে চাইলে নগদের তুলনায় বেশী নেয়া হয়। এভাবে ব্যবসা করা জায়েয হবে কি? যদি না জায়েয হয়, তাহলে জায়েয হওয়ার পদ্ধতি কি? যায়েদ তার দোকান দুই ভাগ করে একভাগে নগদ অন্যভাগে কিস্তিতে বিক্রয়ের ভিত্তিতে ব্যবসা করতে চায়। (উত্তর) প্রশংসা ও দুরূদের পর! বেচাকেনার মজলিসেই যদি নগদ না বাকীতে বিক্রয় হবে এটা পরিস্কার করে নেয়া হয় তাহলে ব্যবসা বৈধ হবে। আল্লাহই ভাল জানেন। লেখক- বান্দা মাহমুদুল হাসান গাঙ্গুহী।" (ফতোয়া মাহমুদীয়া [পুরাতন] পৃঃ ১৭৫, খন্ডঃ ৪)

হযরত মুফতি কেফায়েতুল্লাহ দেহলভী রহ. কেফায়েতুল মুফতিতে লেখেন: "(উত্তর) বাকীতে নগদের তুলনায় বেশী দামে বিক্রয় করা জায়েয আছে। তবে শর্ত হল, তা বেচাকেনার মজলিসেই চুড়ান্ত হতে হবে এবং মূল্য পরিশোধের মেয়াদ নির্ধারিত হতে হবে। হেদায়াতে আছে 'মেয়াদের কারনে মূল্য বৃদ্ধি করা হয়'।"

(কেফায়েতুল মুফতি, কিতাবুল বুয়ূ পৃঃ ২৭-২৮, খন্ডঃ ৮)

কেফায়েতুল মুফতিতে হযরত মুফতি কেফায়েতুল্লাহ রহ. অন্য একটি জায়গায় লেখেন: "(উত্তর) নগদ ও বাকীতে মূল্য কম বেশী করা জায়েয। যেমন: কোন ব্যবসায়ী কেনা জিনিস নগদে একটাকায় বিক্রয় করে আবার একই জিনিস বাকীতে একটাকা দু'আনায় বিক্রয় করে; এতে কোন অসুবিধা নেই। তবে এর জন্য শর্ত হল, বেচাকেনার মজলিসেই মূল্যের পরিমাণ ও আদায়ের মেয়াদ নির্ধারণ করে নিতে হবে। যেমন- ক্রেতা

বিক্রেতা মজলিসেই ঘোষণা করবে যে, মূল্য একমাসের মধ্যে আদায় করবে এবং তা একটাকা দু'আনা। তবে সম্ভাব্য পদ্ধতি যেমন- একমাসে হলে একটাকা দু'আনা আর একমাসের প... ...য়তাল্লিশ দিন হলে একটাকা তিন আনা নেব- এরকম হলে জায়েয হবে না। মূল্য এবং মেয়াদ উভয়টি নির্ধারণ করা ক্রেতা বিক্রেতা দু'জনের উপরই আবশ্যক।"

(কেফায়েতুল মুফতি পৃ: ২৮ খন্ড: ৮)

হযরত মুফতি আব্দুর রহিম লাজপুরী রহ. ফতোয়া রহিমীয়াতে লেখেন: "(উত্তর) কোন জিনিস নগদ বিক্রয়ে কম মূল্য নেয়া আর বাকী বিক্রয়ে বেশী মূল্য নেয়া তখনই জায়েয হবে যখন লেনদেনের শুরুতে কোন একটি চুড়ান্ত করা হবে এবং মূল্য নির্ধারিত হবে। হেদায়া আখেরাইনে আছে-

ألا ترى أنه يزاد في الثمن لأجل الأجل (هداية آخرين ص:٥٨)

(ফতোয়া রহিমীয়া [জাদীদ-খন্ডিত] পৃ: ১৯৫-১৯৭, খন্ড: ৯)

হযরত মাওলানা মুফতি রশিদ আহমদ রহ. এর বৈধতার উপর একটি পৃথক পুস্তক রচনা করেছেন যা زيادة البدل لأجل الأجل নামে আহসানুল ফাতাওয়ার ৮ম খন্ডের ২৯ পৃষ্ঠায় সংযোজিত হয়েছে।

তাছাড়াও সুদবিহীন ব্যাংকিং না জায়েয হওয়ার ফতোয়ায় দস্তখতকারী হযরত মাওলানা মুফতি হামিদুল্লাহ জান সাহেব মিযান ব্যাংকের ব্যাপারে তাঁর এক ফতোয়ায় লেখেন: "শরয়ী দৃষ্টিতে بیع مؤجل (বাইয়ে মুয়াজ্জাল) জায়েয। এতে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের পর একসাথে পুরো মূল্য পরিশোধ করা হয় অথবা মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করা হয়- উভয় পদ্ধতি জায়েয হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রশ্ন নেই। তবে মজলিস শেষ করার আগেই উভয় পক্ষকে কোন একটি চুড়ান্ত করে নিতে হবে। যিনি বাইয়ে মুয়াজ্জাল করবেন তার জন্য জরুরী হল, আগে পণ্যটির মালিক হয়ে তারপর বেচাকেনা করা। পণ্যটি তার আয়ত্তে না থাকলে প্রথমে আয়ত্তে নেয়া জরুরী। আয়ত্তে আসার পর মূল দামের সাথে কিছু মুনাফা সংযুক্ত করে বাকীতে বিক্রয় করতে পারবে। তবে বেচাকেনার সময়ই মূল্য,

আদায়ের সময় বা মাসিক কিস্তি সব কিছু চুড়ান্ত করতে হবে।" –(ফতোয়া হযরত মুফতি হামিদুল্লাহ জান সাহেব পৃ:৭)

এখানে স্পষ্ট করা দরকার যে, বাকীতে বিক্রয়ে দাম বেশী নেয়া হয়– মিযান ব্যাংকের এই কর্মপদ্ধতির উপর তাঁর আপত্তি নেই। বরং তাঁর প্রশ্নের কারণ হল, তাঁর ধারণামতে ব্যাংক পণ্যদ্রব্য গ্রহণের মাধ্যমে নিজের আয়ত্তে নেয়া ছাড়াই বিক্রয় করে। এ ব্যাপারে ইতোপূর্বে বলা হয়েছে যে, প্রকৃত পক্ষে ঘটনা এরকম নয়। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা আগামীতে হবে ইনশাআল্লাহ। অন্যদিকে জামেয়াতুল উলুম আল ইসলামীয়া বিন্নুরী টাউনের দারুল ইফতা থেকে প্রকাশিত কিতাব 'মুরাওয়াজা ইসলামী ব্যাংকারী' তে বলা হয়েছে: "মুরাবাহা ও ইজারাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ লেনদেন হিসেবে মেনে নেয়া যায় না" এবং এটা "অন্যায়ভাবে ভোগ করার অন্তর্ভূক্ত"। তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে, একই দারুল ইফতা থেকে কোন রাখঢাক ছাড়াই এই ফতোয়া দেয়া হয়েছে যে, বাকীতে *বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দাম বাড়ানো যেতে পারে। লক্ষ্য করুন–*

"(প্রশ্ন) এক দোকানদার নগদে গ্রহণকারীদের থেকে দাম কম নেয় আর বাকীতে গ্রহণকারীদের কাছ থেকে বেশী নেয়। এটা কি জায়েয? *(উত্তর) মহান আল্লাহর নামে। এটা জায়েয।* (বাইয়েনাত, রবিউস সানি ১৩৯৯হিঃ) –(ফতোয়া বাইয়েনাত, পৃ: ১২৩, খন্ড: ৪)

এখানে আরেকটি কথা স্পষ্ট করা দরকার যে, ১৯৮১ ইংরেজীর সুদবিহীন কাউন্টারের আলোচনায় আমি লিখেছিলাম হানাফীদের মধ্যে ক্বাজীখান রহ. বাকীর ক্ষেত্রে মূল্যবৃদ্ধিকে নাজায়েয বলেছেন। কিন্তু আমি সেখানে সূত্র উল্লেখ করিনি। পরে হাজার বার অনুসন্ধান করার পরও এ বিষয়টি ফতোয়া ক্বাজীখানে পাওয়া যায়নি; বরং সেখানে যতগুলো উদ্ধৃতি মিলেছে সবগুলো থেকে জায়েয হওয়াটাই প্রমাণিত হয়। অতঃপর আমার মনে পড়ে যে, ১৯৬১ ইং সনে ব্যবসায়িক সুদের বিরুদ্ধে আমি একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম যা আমার আব্বাজান রহ.-এর 'মাসআলায়ে সূদ' নামক কিতাবের দ্বিতীয়াংশ হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে আমি ক্বাজীখানের এই উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছিলাম

لايجوز بيع الحنطة بثمن النسيئة أقل من سعرالبلد فإنه فاسد وأخذ ثمنه حرام –(مسئله سود ص: ۱۳۳)

এখানেও আমি কোন সূত্র উল্লেখ করিনি। এখন প্রায় অর্ধশতাব্দী পর আমার মনে পড়ছে না আমি এই উদ্ধৃতি কোথা থেকে গ্রহণ করেছিলাম। ক্বাজীখানেও এটি পাওয়া যায়নি। উদ্ধৃতিটির সঠিক উদ্দেশ্যও স্পষ্ট নয়। আমার মনে হয় কেউ কোথাও ক্বাজীখানের নামে ভুল উদ্ধৃতিটি দিয়েছিল আর আমি আঠারো বছর বয়সে মূল জায়গায় খোঁজ না নিয়ে তার উপর ভরসা করেই লিখে দিয়েছি। এ সূত্রেই হয়তো কেউ ইমদাদুল মুফতিয়ীনে প্রশ্ন করেছেন। ওখানেও উত্তরে আব্বাজান রহ. প্রথমে বলেছিলেন যে, ক্বাজীখানে এ উদ্ধৃতি পাওয়া যায়নি। কিন্তু পরে তিনি লেখেন: "পরবর্তীতে অনুসন্ধানে ক্বাজীখানের উদ্ধৃতিরও সন্ধান মেলে। সেখানেও উপরে উল্লেখিত ক্ষেত্রে না জায়েয বলা হয়েছে। সাধারণভাবে বাকীতে বিক্রয়ের কারণে মূল্যবৃদ্ধি করাকে নিষিদ্ধ করা হয়নি। তার উদ্ধৃতিতে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে।"–(ইমদাদুল মুফতিয়ীন পৃ: ৮৫৯-৮৬০)। হযরত মুফতি রশীদ আহমদ রহ.ও আহসানুল ফাতাওয়াতে বলেছেন, আমি মাসআলাটি ক্বাজীখানে পাইনি। তিনি বলেন: "প্রশ্নে ক্বাজীখানের উদ্ধৃতি দিয়ে যে মাসআলার কথা বলা হয়েছে তা প্রথমে এই দারুল ইফতার দায়িত্বশীলেরা অনুসন্ধান করে পায়নি। পরে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে অনেক উলামায়ে কেরামকে দায়িত্ব দেয়া হলেও কেউ এটা খুঁজে পাননি। কোন কিতাবে এ ধরণের মাসআলা পাওয়া গেলেও তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ তা উপরোল্লিখিত ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর কিতাবুল হুজ্জার উদ্ধৃতির সুস্পষ্ট বিপরীত।–(আহসানুল ফাতাওয়া খন্ড: ৭, পৃ: ৩৪)।

তাই এটা স্পষ্ট যে, ঐ উদ্ধৃতিতে আমার ভুল হয়েছে। হানাফী মাযহাবের অন্যান্য ফিক্বহবিদগণের যে অবস্থান হযরত ক্বাজীখান রহ. এর অবস্থানও ঠিক তাই। অর্থাৎ, বাকীর কারণে মূল্য বৃদ্ধি করা জায়েয। শুধু তাই নয়; বরং আল্লামা ক্বাজীখান রহ. পৃথক একটি পরিচ্ছেদে এর ভিত্তিতে এমন অনেক কৌশল বর্ণনা করেছেন যার মাধ্যমে সুদ থেকে বাঁচা সম্ভব।

পূর্বসূরীদের মধ্যে মুরাবাহা মুয়াজ্জালা'র উপর আমল

অনেকেই এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, সুদবিহীন ব্যাংকিং ব্যবস্থায় যে মুরাবাহা মুয়াজ্জালা'র উপর আমল করা হয় তাতে মুরাবাহা ও বাইয়ে মুয়াজ্জালের পরিভাষাসমূহ বিকৃত করে একটি কৃত্রিম প্রকারভেদ বানানো হয়েছে। সম্ভবত তাদের বক্তব্যের উদ্দেশ্য হল, এটি একটি কৃত্রিম কার্যক্রম, যাকে কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ বাস্তবতা হল, মুরাবাহা ও বাইয়ে মুয়াজ্জালের মধ্যে عموم و خصوص من وجه এর সম্পর্ক বিদ্যমান। এই দু'টি কোন ক্ষেত্রে একত্রিত হয়ে গেলেও তাতে কোন কৃত্রিমতা নেই। প্রকৃত সত্য হল, আমাদের ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত রীতি হিসেবে মুরাবাহা মুয়াজ্জালা'র উপর আমল হয়ে আসছে। ইমাম আবু হানিফা রহ. ও ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর উপরোল্লিখিত উদ্ধৃতি অনুযায়ী উসমানী খিলাফতের সময়কালে এটাকে قلب الدين বা ঋণ পরিবর্তনের পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করা হতে থাকে। সরকারের পক্ ষ থেকে এই বেচাকেনায় লাভের পরিমাণও নির্দিষ্ট করে দেয়া হয় এবং অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই পরিমাণে কমবেশীও করা হয়েছে। কোন ব্যক্তি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণের বেশীর উপর মুরাবাহা করলে তা কার্যকর হবে কি না সে ব্যাপারে ফিক্বহবিদগণ অনেক আলোচনা করেন। শরহুল মাজাল্লা'য় আছে:

" قد ورد في زمانا أمر سلطاني شريف بأن لا يؤخذ بالمرابحة الشرعية اكثر من تسعة في المائة، فلو أن احدا رابح على أكثر من ذلك بعد أن بلغه خبرالأمر يعزّر ويحبس إلى أن تظهرتوبته وصلاحه فيترك، كما في الدر عن معروضات المفتي أبي السعود، وحقق في حاشية ردالمحتار وتنقيح الحامدية بأن الأمرالسلطاني المشارإليه لايلزم منه استرداد مبلغ المرابحة الزائدعلى ما أمربه بعد أن قبضه الدائن، لأن نهي السلطان لايقتضي فسادالبيع الذي بسببه حصلت المرابحة — ألاترى أنه يصحّ العقد بعد النداء في يوم الجمعة

مع ورود النهي الإلهي وإن أثم، وما ذاك إلا لأن النهي لايقتضي الفســـاد كالصلاة في الأرض المغصوبة تصحّ مع الإثم، كما تقرر في كتب الأصول

(شرح المجلة للأتاسي، أحكام الربا من الباب السابع من كتاب البيـــوع، ج: ١ ص: ٤٥٤ المكتبة الحقانية)

"আমাদের সময়কালে এই মহামান্য শাহী ফরমান জারী হয়েছে যে, শরয়ী মুরাবাহা'য় শতকরা নয়ভাগের বেশী মুনাফা গ্রহণ করা যাবে না। তারপরও শাহী ফরমান পৌঁছা সত্ত্বেও কেউ যদি এর বেশী মুনাফার উপর মুরাবাহা করে তাহলে তাকে শাস্তি প্রদান করা হবে এবং তার তাওবা ও সংশোধন স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তাকে আটক রাখা হবে। যেমনটি মুফতি আবুস সাউদের প্রস্তাবনার সূত্রে দুররে উল্লেখিত হয়েছে। রাদ্দুল মুহতার ও তানক্বীহুল হামেদীয়াতে বলা হয়েছে, এই শাহী ফরমানের কারণে ঐ ঋণদাতা (সরকারের পক্ষ থেকে নির্ধারিত পরিমাণের) অতিরিক্ত যে মুনাফা উসুল করেছে তা ফেরত দেয়া ওয়াজিব নয়। যে বেচাকেনার উপর ভিত্তি করে মুরাবাহা হয়েছে শাহী ফরমানের কারণে তা অবৈধ হওয়া জরুরী নয়। তোমাদের কি জানা নেই যে, জুমার দিন আযানের পর বেচাকেনা করলে নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও তা বৈধ হয়ে যায়। অথচ এটা পাপ। কারণ, লেনদেন অবৈধ হওয়া নিষেধাজ্ঞার চাহিদা নয়। যেমন- ছিনতাইকৃত জমিতে নামায পড়া জায়েয নয়; তবে পড়লে নামায শুদ্ধ হবে। উসুলের কিতাবসমূহে এ ব্যাপারে ফয়সালা দেয়া হয়েছে।"

দেখুন! মুসলিম সমাজে সুদের বিকল্প হিসেবে মুরাবাহা মুয়াজ্জালা'র এত বেশী প্রচলন ছিল যে, এটাকে শরয়ী মুরাবাহা বলা হত এবং এর মুনাফা একটি সীমিত পর্যায়ে রাখার জন্য ইসলামী সরকারের পক্ষ থেকে এর পরিমাণ নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। ঐ মুনাফার পরিমাণ বিভিন্ন সময় পরিবর্তিত হত, যেমনটি আজকাল কেন্দ্রীয় ব্যাংকসমূহ করে থাকে। দুররে মুখতারের রচয়িতা লেখেন:

"وفي معروضات المفتي ابي السعود: لو أدان زيد العشرة بإثني عشـــرة بطريق المعاملة في زماننا بعد أن ورد الأمرالسلطاني وفتوى شيخ الإســـلام

بأن لاتعطى العشرة بأزيد من عشرة ونصف، ونبه على ذلك فلم يمتثل ما يلزمه ؟ فأجاب: يعزر ويحبس إلى أن تظهر توبته وصلاحه فيترك .“

"মুফতি আবুস সাউদের প্রস্তাবনায় আছে, আমাদের সময়কালে যে লেনদেনের প্রচলন আছে যদি তার ভিত্তিতে যায়েদ দশ টাকার ঋণ তেরো টাকায় নিজের জিম্মায় নেয়, অথচ এ মর্মে শাহী ফরমান ও শায়খুল ইসলামের ফতোয়া এসেছে যে, দশ টাকায় সাড়ে দশ টাকার বেশী দেয়া যাবে না, বিষয়টি যায়েদকে অবগত করার পরও সে তা পালন করেনি, তাহলে তার উপর কী বর্তাবে ? তিনি উত্তরে বলেন: তাকে শাস্তি প্রদান করা হবে এবং তাওবা করে সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত তাকে বন্দী করে রাখা হবে। সংশোধন হয়ে গেলে ছেড়ে দেয়া হবে।"

উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে 'লেনদেন' শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. লেখেন:

وهو ما ذكره من شراء الشيئ اليسيربثمن غال অর্থাৎ "লেনদেন বলতে (ঋণের সাথে) কোন তুচ্ছ জিনিস বেশী দামে কিনে নেয়াকে বুঝায়।"

দুররে মুখতারে 'দশের উপর সাড়ে দশের বেশী মুনাফা করা যাবে না' মর্মে যে শাহী ফরমান ও ফতোয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার ব্যাপারে আল্লামা শামী রহ. লেখেন:

”وهناك فتوى آخربأزيد من أحد عشر ونصف، وعليها العمل، سائحاني. ولعله لورود الأمر بها متأخرا عن الأمرالأول.“

অর্থাৎ "এ মর্মে আরো একটি ফতোয়া আছে যে, দশের উপর সাড়ে এগার থেকে বেশী লেনদেন করা যাবে না। সায়েহানীর মতে এই ফতোয়ার উপর কার্যক্রম চলে। সম্ভবত তার কারণ হল, এ পরিমাণের নির্দেশ প্রথম নির্দেশের পরে এসেছিল।"

এখান থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, সরকার সময়ে সময়ে লেনদেনের অথবা মুরাবাহা মুয়াজ্জালা'র সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারণ করে দিত এবং অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই পরিমাণে পরিবর্তনও আসত। যাতে করে মানুষ মুরাবাহা মুয়াজ্জালা'র মাধ্যমে অধিক মুনাফাখোরী করতে না পারে। আল্লামা হিছকাফী রহ. বলেন, এই লেনদেনের তুলনায় বাইয়ে

সালামের লেনদেনে পরিস্থিতি আরো ভয়ানক ছিল। এমনকি এর কারণে অনেক বসতি বিরান হয়ে গেছে। এর ব্যাখ্যা করে আল্লামা শামী রহ. সরকারকে পরামর্শ দেন যে, মুরাবাহার মত বাইয়ে সালামের মধ্যেও মুনাফার সর্বোচ্চ পরিমাণ সরকার কর্তৃক নির্ধারণ করে দেয়া উচিৎ। তিনি লেখেন:

"أي أقبح من بيع المعاملة المذكور: ما يفعله بعض الناس من دفع دراهم سلماعلى حنطة أونحوها إلى اهل القرى بحيث يؤدي ذلـــك إلى خـــراب القرية،لأنه يجعل الثمن قليلاجدا، فيكون اضراره اكثر مـــن اضـــرارالبيع بالمعاملة الزائدة عن الأمرالسلطاني. فيظهر أن المناسب أيضـــا ورود أمـــر سلطاني بذلك ليعزر من يخالفه وظاهره أنه لم يرد بذلك أمر، والله سبحانه أعلم. "

"অর্থাৎ, বাইয়ে মুআমালা'র যে পদ্ধতি ইতোপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে কিছু মানুষের কাজ তা থেকেও নিকৃষ্ট। যারা গমের মধ্যে বাইয়ে সালাম হিসেবে গ্রাম্যলোকদের এমনভাবে কিছু দেরহাম দেয়, যা পুরো গ্রাম বিরান হওয়ার কারণ হয়ে পড়ে। কেননা, তারা খুব কম মূল্য দেয়। সুতরাং এটা শাহী ফরমানে নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে বেশী মুনাফায় কৃত বাইয়ে মুআমালা (মুরাবাহা)র চেয়ে অধিক ক্ষতিকর। অতএব, এ বিষয়েও শাহী ফরমান জারি হওয়া উচিৎ। যাতে করে এর বিরোধিতাকারীদের শাস্তি দেয়া যায়। দৃশ্যত এধরণের কোন ফরমান এখনো আসেনি।" –(রাদ্দুল মুহতার পৃ: ১৬৭-১৬৮, খন্ড: ৫ বাবুর রিবার সামান্য পূর্বে)

এখান থেকে দুটি কথা জানা যায়। এক. ইসলামী সমাজে মুরাবাহা মুয়াজ্জালার এতবেশী প্রচলন ছিল যে, ইসলামী সরকার এর জন্য পরিমাণ নির্ধারণ করে দিত এবং হানাফী উলামাদের মধ্যে কেউ এটাকে নাজায়েয বলেননি। দুই. অনেক লেনদেন শরয়ী দৃষ্টিতে জায়েয হলেও বিভিন্ন সামাজিক কারণে তার সমালোচনাও করা হয়। যেমন- বাইয়ে সালাম (পণ্যের দাম আগেভাগে দিয়ে দেয়া) সম্পূর্ণরূপে জায়েয। কিন্তু যারা এ বেচাকেনার মাধ্যমে অতিরিক্ত মুনাফা কামিয়েছেন আল্লামা শামী রহ.

তাদের সমালোচনা করে বলেছেন, তাদের কারণে অনেক গ্রাম বিরান হয়ে গেছে। কিন্তু তিনি এ কথা বলেননি যে, যারা এ বেচাকেনা করেছে তারা হারাম কাজ করেছে বা তাদের বেচাকেনা অবৈধ। আর যারা শরয়ী মুরাবাহা'য় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মুনাফার অতিরিক্ত উসুল করেছে তাদের ব্যাপারে শুধু বলা হয়েছে, তারা শাসকের বিরোধিতা করে পাপ করেছে। তবে তাদের বেচাকেনাকে অবৈধ বলা হয়নি। যে মুরাবাহা'য় সরকারীভাবে লাভের পরিমাণ নির্ধারিত ছিল, তা মুরাবাহা মুয়াজ্জালা নয়, মুরাবাহা হাল্লা বা নগদ মুরাবাহা ছিল- এটা মনে করার কোন কারণ নেই। কেননা, এসব আলোচনা মুরাবাহা মুয়াজ্জালা (বাকীতে মুরাবাহা) সম্পর্কিত। বরং যে মুরাবাহা মুয়াজ্জালা'র আলোচনা হচ্ছে তা ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর মাসআলা অনুযায়ী قلب الدين বা ঋণ পরিবর্তনের জন্য ব্যবহৃত হত। অর্থাৎ, কারো যিম্মায় কোন ঋণ থাকলে তাতে যদি সে অতিরিক্ত সময় নিতে চায় তাহলে সে ঋণদাতার সাথে মুরাবাহা মুয়াজ্জালা করে নিত। লাভের পরিমাণও আদায়ের মেয়াদ অনুযায়ীই হত। অর্থাৎ, আদায়ের মেয়াদ বেশী হলে লাভের পরিমাণও বেশী, আর আদায়ের মেয়াদ কম হলে লাভের পরিমাণও কম হত। এমনকি হানাফীদের মধ্যে শেষ দিকের অনেক ফিক্বহবিদগণ বলেছেন, এই মুরাবাহা'য় ঋণ গ্রহীতা সময়ের আগেই ঋণ আদায় করে দিলে তার কাছ থেকে পুরো লাভ না নিয়ে শুধু অতিক্রান্ত দিনগুলোর লাভ নিবে। যদি পুরো লাভ উসুল হয় তাহলে ঋণের মেয়াদে যে পরিমাণ সময় বাকী আছে তার হিসাব করে ঐ সমপরিমাণ লাভের অংক ফেরত দিতে হবে। আল্লামা শামী রহ. লেখেন:

" قضى المديون الدين قبل الحلول أو مات فأخذ من تركته فجواب المتأخرين: أنه لا يأخذ من المرابحة التي جرت بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام. قيل له أتفتي به أيضا؟ قال: نعم. قال: ولو أخذ المقرض القرض والمرابحة قبل مضي الأجل فللمديون أن يرجع بحصة ما بقي من الأيام أهـ وذكرالشارح آخر الكتاب: أنه أفتي به المرحوم مفتي الروم أبوالسعود وعلله بالرفق من الجانبين ـــ قلت: وبه أفتي الحانوتي وغيره. وفي الفتاوى

الحامدية: سئل فيما اذا كان لزيد بذمة عمرو مبلغ دين معلوم فرابحه عليه إلى سنة ثم بعد ذلك بعشرين يوما مات عمروالمديون فحل الدين ودفعه الوارث لزيد، فهل يؤخذ من المرابحة شيئ أو لا؟ الجواب جواب المتأخرين: أنه لايؤخذ من المرابحة التي جرت المبايعة عليها بينهما إلا بقدرما مضى من الأيام. قيل للعلامة نجم الدين: أتفتيى به؟ قال: نعم كذا في الأنقروي والتنوير وأفتى به علامة الروم مولانا أبو السعود" ــــ(الدر المختار، قبيل فصل في القرض ج:٥ ص: ١٦٠ ط: ايچ ايم سعيد)

অর্থাৎ "মেয়াদোত্তীর্ণ হবার আগেই ঋণ গ্রহীতা যদি ঋণ পরিশোধ করে দেয় অথবা ঋণ গ্রহীতা মারা যাওয়ায় তার সম্পদ থেকে তা আদায় করে দেয়া হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে মুতাআখখিরীন ফিক্বহবিদগণের উত্তর হল– তাদের মধ্যে সংঘটিত মুরাবাহায় শুধু ঐ পরিমাণ লাভ নিবে যে পরিমাণ দিন অতিবাহিত হয়েছে। তাকে বলা হল, আপনিও কি এই ফতোয়া দেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ! মেয়াদ শেষ হবার আগে ঋণদাতা যদি ঋণ ও মুরাবাহা দুটোই নেয়, তাহলে ঋণগ্রহীতার অধিকার আছে অবশিষ্ট সময়ের সমপরিমাণ লভ্যাংশ ফেরত নেয়া। ব্যাখ্যাকার কিতাবের শেষ দিকে বলেন: মুফতিয়ে রোম আবুস সাউদ এই ফতোয়া দিয়েছেন। তিনি উভয়পক্ষের সুবিধাকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। হানুতী রহ. ও অন্যান্যরাও একই ফতোয়া দিয়েছেন। ফতোয়া হামেদীয়াতে আছে: প্রশ্ন হল– আমরের যিম্মায় যায়েদের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ঋণ আছে। এর সাথে এক বছর মেয়াদে মুরাবাহা করার পর বিশদিন অতিবাহিত হতেই ঋণগ্রহীতা আমর মারা যায়। ফলে ওয়ারিশগণ যায়েদকে তার প্রাপ্য দিয়ে দেয়। এখন মুরাবাহা'র ভিত্তিতে কিছু নেয়া যাবে কি? উত্তর মুতাআখখিরীনদের মত: তাদের মাঝে সংঘটিত মুরাবাহা'য় শুধু অতিক্রান্ত দিনসমূহের সমপরিমাণ লাভ গ্রহণ করা যাবে। আল্লামা নাজমুদ্দীনকে জিজ্ঞাসা করা হয়, আপনিও কি এই ফতোয়া দেন? তিনি বলেন: হ্যাঁ!"

একই মাসআলা দুররে মুখতারে কিতাবুল ফারায়েযের কিছু আগে পূণরায় এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে:

" قضى المديون الدين المؤجل قبل الحلول أو مات فحل بموته فأخذ من تركته لايأخذ من المرابحة التي جرت بينهما إلاّ بقدر ما مضى من الأيـــام، وهو جواب المتأخرين. قنية. وبه أفتي المرحوم أبو السعود افنـــدي مفـــتي الروم وعلله بالرفق للجانبين وقد قدمته قبل فصل القرض والله أعلم"

অর্থাৎ "মেয়াদোত্তীর্ণ হবার আগেই ঋণ গ্রহীতা যদি ঋণ পরিশোধ করে দেয় অথবা ঋণ গ্রহীতা মারা যাওয়ার কারণে ঋণ তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করতে হয় বিধায় তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে উসুল করা হয়, তাহলে ঋণগ্রহীতা ও দাতার মাঝে যে মুরাবাহা প্রচলিত ছিল তাতে ঋণদাতা শুধু অতিক্রান্ত দিন সমূহের মূল্য নিবে। কিনয়াতে আছে যে, এটা মুতাআখখিরীন ফক্বীহদের ফতোয়া। রোমের মুফতি আবুস সাউদ আফেন্দীও একই ফতোয়া দিয়েছেন। এবং তিনি উভয়পক্ষের সুবিধাকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মাসআলাটি আমি ঋণের পরিচ্ছেদের কিছু আগে আলোচনা করেছি।"

এর নীচে আল্লামা শামী রহ.-এর ব্যাখ্যাটিও দেখুন:

"(قوله لا يأخذ من المرابحة إلخ) صورته : إشترى شيئا بعشـــرة نقـــدا وباعه لآخر بعشرين إلى أجل هو عشرة أشهر فإذا قضاه بعد تمام خمسة أو مات بعدها يأخذ خمسة ويترك خمسة ط.

أقول: والظاهر أن مثله مالو أقرضه وباعه بثمن معلوم وأجـــل ذلـــك فيحسب له من ثمن السلعة بقدر ما مضى فقط تأمل . (قوله وعللـــه إلخ) علله الحانوتي بالتباعد عن شبهة الربا لأنها في باب الربا ملحقة بالحقيقة . ووجّه أن الربح في مقابلة الأجل، لأن الأجل وإن لم يكن مالا ولايقابلـــه شيئ من الثمن، لكن اعتبروه مالا في المرابحة إذا ذكرالأجل بمقابلة زيـــادة

الثمن. فلو أخذ كل الثمن قبل الحلول كان أخذه بلا عوض، والله سبحانه تعالى أعلم" —(الدر المحتار، قبيل كتاب الفرائض، ج:٦ ص:٧٥٧ إيج إيم سعيد)

অর্থাৎ "ঋণগ্রহীতা ও দাতার মাঝে যে মুরাবাহা প্রচলিত ছিল তাতে ঋণদাতা শুধু অতিক্রান্ত দিনসমূহের মূল্য নিবে– বলে যে মাসআলাটি বলা হয়েছে, তার পদ্ধতি হল: কোন ব্যক্তি কোন জিনিস নগদ দশ (দেরহাম) দিয়ে ক্রয় করে অন্যের কাছে দশ মাসের বাকীতে বিশ (দেরহামে) বিক্রয় করল। এখন পাঁচ মাস অতিবাহিত হওয়ার পর যদি দাম উসুল করে কিংবা পাঁচ মাস পর যদি সে মারা যায় তাহলে বিক্রেতা লাভ থেকে পাঁচ দেরহাম উসুল করবে বাকী পাঁচ দেরহাম ছেড়ে দিবে। (অতঃপর আল্লামা শামী রহ. বলেন:) এটা স্পষ্ট যে, এই হুকুম তখনই হবে যখন কোন ব্যক্তি কাউকে কর্জ্জ দিবে এবং একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের বাকীতে কোন জিনিসও বিক্রয় করবে। সেক্ষেত্রে (অর্থাৎ, কর্জ্জ আগে আদায় হয়ে গেলে) ঐ জিনিসের দাম শুধু অতিক্রান্ত দিনসমূহের হিসাবে করা হবে। বিষয়টি ভালভাবে বুঝে নিন। আল্লামা হানুতী রহ. এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, এই লেনদেনটি সুদের সন্দেহ থেকে দূরে। কেননা, সুদের ক্ষেত্রে সন্দেহজনক সুদও প্রকৃত সুদের মত। (সুদের সন্দেহ দুরীভূত হবার) কারণ বর্ণনা করে তিনি বলেন, এখানে লাভ মেয়াদের বিপরীতে নেয়া হচ্ছে। কেননা, মেয়াদ যদিও মাল নয় এবং মূল্যের কোন অংশও তার বিনিময়ে হয় না, তা সত্ত্বেও মুরাবাহা'য় মেয়াদকে মূল্যের বিপরীতে উল্লেখ করা হলে ফক্বীহগণ তাকে মাল হিসেবে গণ্য করেন।"

একই মাসআলা ফতোয়া আনকারাবীয়াতে এভাবে আছে:

"قضى المديون الدين المؤجل قبل الحلول أو مات فأخذ من تركته فجواب المتأخرين أنه لايؤخذ من المرابحة التي جرت المبايعة بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام، قيل لنجم الدين: أتفتي به أيضا؟ قال: نعم — وقال: لو أخذ المقرض القرض والمرابحة قبل مضي الأجل فللمديون أن يرجع منه بحصة ما بقي من الأيام. قنية في المداينات" —(الفتاوى الأنقروية، كتاب المداينات ج:١ ص:٣٠٨)

তানক্বীহুল ফাতাওয়াল হামেদীয়াতে আছে:

"(سئل) فيما إذا استأذن زيد من عمرو مبلغا معلوما من الـــدراهم إلى أجل معلوم بمرابحة شرعية ثم قضى زيد الدين قبل حلول أجلـــه، فهـــل لا يؤخذ من المرابحة التي جرت بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام؟

(الجواب): نعم وهو جواب المتأخرين كذا في شرح التنوير وبمثله أفتى مفتي الروم أبوالسعود آفندي: قضى المديون الدين المؤجل قبل الحلـــول أو مات فحل بموته فأخذ من تركته لايؤخذ من المرابحة التي جرت بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام، وهو جواب المتأخرين. قنية. وبه أفتى المرحـــوم أبوالسعودآفندي مفتي الروم وعلله بالرفق للجانبين علائي على التنـــويرمن مسائل شتى"

একটু পরে একই কিতাবে একটি মাসআলাও বর্ণনা করা হয়, তা হল– আমরের কাছে যায়েদের কিছু ঋণ পাওনা আছে। আমর সময় বাড়ানোর জন্য ঋণদাতার কাছ থেকে মুরাবাহা'র ভিত্তিতে পুরো বছর পরে মূল্য পরিশোধের শর্তে কোন জিনিস খরিদ করে। অতঃপর বিশদিন অতিবাহিত হতেই আমরের ইন্তেকাল হয়। ফলে আমরের ঋণ তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। তার ওয়ারিশগণ এই ঋণ যায়েদের কাছে আদায় করে। এখন তাদের মাঝে বছর শেষে মূল্য পরিশোধের শর্তে মুরাবাহার যে লেনদেন হয়েছিল তার পুরোটা দেয়া ওয়ারিশদের উপর ওয়াজিব নয়। বরং বিশদিনের মুরাবাহা'র ক্ষেত্রে যে পরিমাণ মূল্য নির্ধারিত হয় তাদেরকে তাই পরিশোধ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, তাদের মাঝে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, বিক্রেতা তার বিনিয়োগের উপর দিন প্রতি একটাকা করে দাম নিবে। মনে করুন, বিনিয়োগ ছিল একহাজার টাকা। যেহেতু বছর শেষে আদায় করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল, তাই অতিরিক্তসহ মুরাবাহা'র মোট মূল্য একহাজার তিনশত ষাট টাকা নির্ধারিত হয়। এখন আমর বিশ দিন পর ইন্তেকাল করার কারণে ওয়ারিশগণ মূল

ঋণ-যার কারণে মুরাবাহা করা হয়েছিল- যায়েদকে আদায় করে দেয়। এমতাবস্থায় পুরো বছর অপেক্ষা করে একহাজার তিনশত ষাট টাকা আদায় করাটা ওয়ারিশদের জন্য জরুরী নয়; বরং এখনই একহাজার বিশ টাকা পরিশোধ করে মুরাবাহা'র ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়া তাদের জন্য জায়েয আছে। কিতাবে বলা হয়:

"(سئل) فيما إذا كان لزيد بذمة عمرو مبلغ دين معلوم فرابحه علية إلى سنة ثم بعد ذلك بعشرين يوما مات عمرو المديون فحل الدين ودفعه الورثة لزيد، فهل يؤخذ من المرابحة شيئ أم لا؟

(الجواب) : جواب المتأخرين أنه لا يؤخذ من المرابحة التي جرت المبايعة عليها بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام. قيل للعلامة نجم الدين: أتفتي به ؟ قال: نعم كذا في الأنقروي والتنوير وأفتى به علامـــة الـــروم مولانـــا أبوالسعود."

শুধু তাই নয়; বরং ওয়ারিশদের জানা ছিল না যে, তারা তাৎক্ষনিকভাবে একশত বিশ টাকা দিয়ে মুক্ত হতে পারবে এবং পুরো বছরের মুরাবাহা তাদের জন্য জরুরী নয়। এই ভূল ধারণার কারণে তারা মনে করতে থাকে যে, তাদের একহাজার তিনশত ষাট টাকা আদায় করতে হবে। বছর শেষে এই টাকা পরিশোধ করার মত অর্থ তাদের কাছে না থাকায় তারা পুণরায় মুরাবাহা করে। এভাবে কয়েক বছর করার পর তারা বুঝতে পারে যে, পুরো বছরের মুরাবাহা তাদের জন্য জরুরী ছিল না। এমতাবস্থায় পরবর্তী মুরাবাহাগুলোর মাধ্যমে তাদের উপর যে ঋণ চেপেছিল তা আদায় করা তাদের জন্য জরুরী নয়। কেননা, মুরাবাহার ঋণ তাদের উপর আবশ্যক ভেবে একটি ভুল ভিত্তির উপর তারা এসব মুরাবাহা করেছিল। এই ঋণ তাদের উপর আবশ্যক ছিল না এটা প্রমানিত হওয়ার পর এর ভিত্তিতে যে মুরাবাহা করা হয়েছিল তার মুনাফা দেয়া তাদের জন্য জরুরী নয়।

আল্লামা শামী রহ. বলেন, এই মাসআলার একটি উদাহরণ হল- কোন ব্যক্তি অন্যজনের ঋণের জামানতদার হয়। মূল ঋণগ্রহীতা দাতার কাছে

তার ঋণ পরিশোধ করে। জামানতদার বিষয়টি জানে না। এদিকে ঋণ আদায়ের সময় হলে ঋণদাতা (অন্যায়ভাবে) জামানতদারের কাছে দাবী করে বসে। জামানতদারও জামানতদার হিসেবে এই ঋণ আদায় তার দায়িত্ব বলে মনে করে। কিন্তু তার কাছে দেয়ার মত অর্থ না থাকায় সময় নেয়ার জন্য সে ঋণদাতার কাছ থেকে মুরাবাহা'য় কোন জিনিস খরিদ করে নেয়। এভাবে জামানতদারের আরো সত্তর দিনারের মুনাফা আবশ্যক হয়ে পড়ে। এত কিছুর পর সে জানতে পারে যে, মূল ঋণগ্রহীতা ঋণ আদায় করে দিয়েছিল। এমতাবস্থায় ঐ সত্তর দিনার দেয়া জামানতদারের জন্য আবশ্যক নয়। তিনি বলেন:

وفي هذه الصورة بعد أداء الدين دون المرابحة إذا ظنت الورثة أن المرابحة تلزمهم فرابحوه عليهاعدة سنين بناء على أن المرابحة تلزمهم حتى اجتمع عليهم مال فهل يلزمهم ذلك المال أو لا؟ الجواب : حيث ظنوا أن المرابحة تلزمهم وأنها دين باق في تركة مورثهم، ثم بان خلافه فلا يلزمهم ماالتزموا به في مقابلة المرابحة التي لاتلزمهم على قول المتأخرين؛ لأن المرابحة بناء على قيام دين المرابحة السابقة التي على مورثهم، ولم يوجد وهذا في الزائد على قدر ما مضى. وهذه المسألة نظير ما في القينة قال برمز بكر خواهرزاده : كان يطالب الكفيل بالدين بعد أخذه من الأصيل ويبيعه بالمرابحة حتى اجتمع عليه سبعون دينارا، ثم تبين أنه قد أخذه فلا شيئ له؛ لأن المبايعة بناء على قيام الدين ولم يكن اهـ هذا ما ظهرلنا والله الموفق -

(تنقيح الفتاوى الحامدية، باب القرض، ج:١ ص:٢٩٣ المكتبة الحقانية)

একই মাসআলা রাদ্দুল মুহতারে আছে:

وفي هذه الصورة بعد أداء الدين دون المرابحة إذا ظنت الورثة أن المرابحة تلزمهم فرابحوه عليهاعدة سنين بناء على أن المرابحة تلزمهم حتى اجتمع عليهم مال فهل يلزمهم ذلك المال أو لا؟ الجواب : لايلزمهم لما في القينة

قال برمز بكر خواهرزاده : كان يطالب الكفيل بالدين بعد أخذه من الأصيل ويبيعه بالمرابحة حتى اجتمع عليه سبعون دينارا، ثم تبين أنه قد أخذه فلا شيئ له؛ لأن المبايعة بناء على قيام الدين و لم يكن — اهـ هذا ما ظهرلنا والله سبحانه أعلم

(ردالمحتار،قبيل فصل في القرض ج:٥ ص:١٦٠ ايج ايم سعيد)

হানাফী ফিক্বহবিদগণ এ মাসআলাও উল্লেখ করেছেন যে, ওয়াকফের কোন দালান মেরামত বা নির্মাণের প্রয়োজন হলে ওয়াকফের মুতাওয়াল্লী মুরাবাহা মুয়াজ্জালা করে তার খরচ ওয়াকফ থেকে উসুল করতে পারবেন কি না? এ ব্যাপারে তাঁরা দুই পদ্ধতির পৃথক হুকুম লিখেছেন। এক. তিনি تورق করবেন। অর্থাৎ, কম মূল্যের জিনিস বাকীতে বেশী দামে কিনে তা বাজারে বিক্রয় করবেন। এভাবে যে অর্থ পাওয়া যাবে তা নির্মাণকাজে ব্যয় করবেন। এ পদ্ধতির ব্যাপারে ইবনে ওয়াহবান রহ.-এর মত হল— মুতাওয়াল্লী ক্রয়কৃত জিনিসের পুরো দাম ওয়াকফ থেকে উসুল করতে পারবেন। আল্লামা রামলী রহ.-এর ঝোঁকও এদিকে বলে মনে হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে মুতাওয়াল্লী বেশী দামের জামিন হওয়াকে আল্লামা শামী রহ. সঠিক বলে গণ্য করেছেন। দুই. নির্মাণ বা মেরামত কার্যের জন্য যে পরিমাণ অর্থ দরকার তা মুতাওয়াল্লী কারো কাছ থেকে ঋণ নিবে। সাথে সাথে এই ঋণের সময় বৃদ্ধির জন্য ঋণদাতার সাথে মুরাবাহা মুয়াজ্জালা করবে। উদাহরণস্বরূপ: ত্রিশ হাজার টাকা ঋণ নিবে। সাথে একশত টাকার কোন জিনিস তিন হাজার টাকায় বাকীতে ক্রয় করবে। যা এক বছর পর আদায়যোগ্য হবে। (যাতেকরে ঋণদাতা তার মূল ঋণ ত্রিশ হাজারের সাথে আরো দুই হাজার নয়শত টাকা মুনাফা করতে পারে)। এ ক্ষেত্রে মুতাওয়াল্লী দুই হাজার নয়শত টাকার যে মুনাফা ঋণদাতাকে দিয়েছে তা ওয়াকফের আয় থেকে দেয়া যাবে না; বরং নিজের পকেট থেকে দিতে হবে। কারণ, ওয়াকফের জন্যতো শুধু ঋণ নেয়া হয়েছিল। পরে মুরাবাহা'র যে লেনদেন করা হয়েছে ঋণের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। তাই মুরাবাহা'র কারণে ঋণের প্রকৃতিতে কোন পরিবর্তন আসে না। অর্থাৎ, মুরাবাহা'র আগে কিংবা পরে কোন সময়ই ঋণ মেয়াদকে গ্রহণ

করেনি। এজন্য এই ঋণে আইনত মেয়াদ গ্রহণযোগ্য হবে না। আইনগতভাবে ঋণদাতা যখন চাইবে তখনই ঋণ উসুলের দাবী করতে পারবে। (এটা ভিন্ন বিষয় যে, মুরাবাহা'র মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে সে স্বেচ্ছায় অনুগ্রহপূর্বক ঋণ দাবী করে না)। সুতরাং, মুরাবাহা'র সাথে যেহেতু ঋণের আইনগত কোন সম্পর্ক নেই তাই মুতাওয়াল্লী একশত টাকার জিনিস তিনহাজার টাকায় যে লেনদেন করেছেন তা ভিন্ন বিষয়। ওয়াকফের জন্য কম মূল্যের কোন জিনিস বেশী মূল্য দিয়ে কেনার অধিকার মুতাওয়াল্লীর নেই। অতএব, অতিরিক্ত যে টাকা তিনি দিয়েছেন তা ওয়াকফের সম্পদ থেকে দেয়া যাবে না; বরং তার নিজের পকেট থেকে দিতে হবে। এ বিস্তারিত আলোচনা তানক্বীহুল হামেদীয়াতে এভাবে বলা হয়েছে:

"(سئل) في ناظر استدان لأجل ضرورة في الوقف مبلغا من الدراهم بإذن القاضي ثم عزل عن النظر ويزعم أنه استدان المبلغ بمرابحة بمقتضى أنه اشترى من الدائن شيئا يسيرا بمبلغ زائد عن أصل الدين وأن له الرجوع في غلة الوقف بالزائد المزبور فهل ليس له ذلك ويضمن الزيادة من مال نفسه

(الجواب) : نعم والمسألة في التتارخانية والخيرية والبحر وغيرها، وفي الحاوي الزاهدي : قال أهل البصرة للقيم إن لم تهدم المسجد العامر يكن ضرره في القابل أعظم فله هدمه، وإن خالفه بعض أهل المحلة وليس له التأخيرإذا امكنه العمارة، فلو هدمه و لم يكن فيه غلة للعمارة في الحال فاستقرض العشرة بثلاثة عشرفي سنة، واشترى من المقرض شيئا يسيرا يرجع في غلته بالعشرة وعليه الزيادة اهـ (أقول) هذا مخالف لما في الأشباه حيث قال: وهل يجوز للمتولي أن يشتري متاعا بأكثر من قيمته ويبيعه ويصرفه على العمارة ويكون الربح على الوقف ؟ الجواب : نعم، كما حرره ابن وهبان اهـ وتبعه في الدرالمختار قال الرملي في حاشية

البحر : إلاّ أن يقال لما لم يلزم الأجل في مسـئلة القـرض بقـي شـراء اليسيربثمن كثير فتمحض ضـ.ـ.ا على الوقف فلم تلزمه الزيادة فكانت على القيم بخلاف مسألة شراء المتاع وبيعه للزوم الأجل في جملة الـثمن اهـــ

وكتبت فيما علقته على الدر المختار عن البيري أن منشأ ما قاله ابن وهبان عدم الوقوف على الحكم ممن تقدمه ، ثم ذكر ما مر على الحاوي وقال : هذا الذي يفتى به اهـــ

ويؤيده قوله في البحر بعد ذكرها ما مر أيضا وبه اندفع ما ذكره ابـن وهبان من أنه لا جواب للمشائخ فيها اهـــ فعلم أن ما ذكره ابن وهبان بحث مخالف للمنقول ومن حفظ حجة على من لم يحفظ

(تنقيح الفتاوى الحامدية، الباب الثالث من كتاب الوقف، مطلب لانلزم المرابحة الوقف، ج:١ ص:٢٠٩، المكتبة الحقانية)

একই আলোচনা আল্লামা শামী রহ. কিতাবুল ওয়াককের مطلـب في الإستدانة على الوقف নামক পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন।

এখানে তৃতীয় আরেকটি পদ্ধতি আছে যা এই উদ্ধৃতিসমূহে আলোচিত হয়নি। তা হল, বর্তমানে সুদবিহীন ব্যাংকসমূহে ব্যবহৃত মুরাবাহা মুয়াজ্জালা'র পদ্ধতি। তার রূপ হল- ওয়াককের নির্মাণকাজের জন্য যে সরঞ্জাম দরকার মুতাওয়াল্লী তা মুরাবাহা মুয়াজ্জালা'র ভিত্তিতে ক্রয় করবে। অর্থাৎ, যেসব সরঞ্জাম নগদ মূল্যে কিনলে কমে পাওয়া যেত মুরাবাহা মুয়াজ্জালা করে তা বেশী মূল্যে ক্রয় করবে। দৃশ্যত এ পদ্ধতিটি উপরে উল্লেখ না করার কারণ হল, এতে মুতাওয়াল্লীর জন্য মুরাবাহা'র মূল্য লাভসহ ওয়াককের আয় থেকে উসুল করা জায়েয আছে। কেননা, এই মুরাবাহা মুয়াজ্জালাটি তিনি ওয়াককের স্বার্থেই করেছেন এবং ঐসব সরঞ্জামের জন্য করেছেন যা ওয়াককের জন্য প্রয়োজন। এখানে যে মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়েছে তা মুরাবাহা'র একটি অবধারিত অংশ। মুতাওয়াল্লী কর্তৃক ওয়াককের সম্পত্তি থেকে উসুল না করার যে মতামত আল্লামা শামী

রহ. প্রাধান্য দিয়েছেন তা تورق (অর্থাৎ কম মূল্যের জিনিস বাকীতে বেশী দামে কিনে তা বাজারে বিক্রয় করা) এর পদ্ধতির ক্ষেত্রে ছিল। যাতে দুটি পৃথক লেনদেন হয়। এক. কম দামের জিনিস বাকীতে বেশী দামে কেনা হয়। দুই. পুণঃরায় তাকে বাজারে সাধারণ মূল্যে বিক্রয় করা, যা ক্রয়কৃত মূল্যের চেয়ে কম। তাই প্রথম লেনদেন অর্থাৎ, কম দামের জিনিস বেশী দামে কেনাটা ওয়াকফের জন্য প্রার্থিত ছিল না: বরং এটাকে কম দামে বিক্রয় করার জন্য কেনা হয়েছিল। কোন জিনিস ওয়াকফের জন্য বেশী দামে ক্রয় করে জেনে শুনে কম দামে বিক্রয় করার অধিকার মুতাওয়াল্লীর নেই।

যাই হোক! এসব ফিক্বহী উদ্ধৃতি থেকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সুস্পষ্ট হয়:

এক. মুরাবাহা মুয়াজ্জালা এমন কোন পদ্ধতি নয় যে, সুদবিহীন ব্যাংকসমূহে কৃত্রিমভাবে প্রথমবারের মত এটাকে তৈরী করা হয়েছে; বরং এটি এমন একটি লেনদেন, যা হুযুরে আক্বদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানয়ও ছিল। কুরআনে কারীমেও এর উদ্ধৃতি রয়েছে। প্রসিদ্ধ চার মাযহাব সুস্পষ্টভাবে এটাকে জায়েয বলে ঘোষণা দিয়েছে। ইমাম আবু হানিফা রহ. ও ইমাম মুহাম্মদ রহ. সরাসরি এটাকে জায়েয বলেছেন। আল্লামা সারাখসী রহ. বলেছেন, নগদের পরিবর্তে বাকী বিক্রয়ের সময় বেশী মূল্য হাঁকানো ব্যবসায়ীদের সাধারণ রীতি।

দুই. মুরাবাহা মুয়াজ্জালা বেচাকেনারই একটা প্রকারভেদ। কোন কোন সময় সুদ থেকে বাঁচার জন্য একে ঋণ পরিবর্তনের কৌশল হিসেবেও ব্যবহার করা হত। হানাফী ফিক্বহবিদগণ এ কৌশলকে মাকরূহ তানযিহী সহ জায়েয বলেছেন। (কারণ, আল্লামা হিসকাফী রহ. এ ব্যাপারে বলেছেন, يكره ويجوز মাকরূহ তবে জায়েয হবে)। ইসলামী ইতিহাসে এর জন্যও মুরাবাহার পরিভাষাই ব্যবহার করা হয়েছে। হানাফী ফিক্বহবিদগণ এর বিস্তারিত হুকুম বর্ণনা করেছেন।

তিন. খিলাফতে উসমানিয়ার সময় মুরাবাহা মুয়াজ্জালা'র মুনাফার পরিমাণ সরকারীভাবে নির্ধরিত হত। যেমনটি বর্তমানে বিভিন্ন দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারণ করা হয়। এই নির্ধারিত পরিমাণের অধিক

মুনাফা গ্রহণ করাকে ফিকহবিদগণ প্রশাসনের বিরোধীতার কারণে নাজায়েয বললেও ঐ লেনদেনকে বাতিল কিংবা অবৈধ বলেননি।

চার. قلب الـــدين বা ঋণ পরিবর্তনের জন্য যে মুরাবাহা মুয়াজ্জালা'র আবিস্কার করা হয়েছে তাতে সুদের সাথে তুলনাযোগ্য সুদের সন্দেহ পাওয়া যায় না।

পাঁচ. সুদবিহীন ব্যাংকসমূহে মুরাবাহা মুয়াজ্জালাকে ঋণ পরিবর্তনের কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা হয় না। বরং এটা প্রকৃত বেচাকেনা হিসেবেই ব্যবহৃত হয়। যেখানে ক্রেতার ঐ জিনিসটিই ক্রয় করা উদ্দেশ্য যার উপর মুরাবাহা হয়।

একদিকে কুরআনে কারীমের তাফসীর, সাহাবায়ে কেরামের আসরসমূহ, চার মাযহাবের ফিক্বহবিদগণের সুস্পষ্ট উদ্ধৃতি এবং আমাদের সকল আকাবিরদের ফতোয়া ইত্যাদিতে এই মাসআলাটি যে পরম্পরায় বর্ণিত হয়েছে তাতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মাসআলাটি জমহুরে উম্মতের সর্বস্বীকৃত মাসআলাসমূহের একটি। অন্যদিকে এর সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করে বলা হচ্ছে যে, "ইজারা ও মুরাবাহার ভিত্তিতে ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ সুদের সন্দেহ ও সাদৃশ্য হবার কারণে না জায়েয", "ইজারা ও মুরাবাহার পৃথক নিজস্ব কোন অস্তিত্বই গ্রহণযোগ্য নয়" এবং একে "অন্যায়ভাবে অন্যের মাল হাতিয়ে নেয়ার শামিল" ইত্যাদি। এটাকে আবার 'জমহুরে উলামা' বা উলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত অবস্থান হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। সম্পূর্ণ উল্টো এ কথাকে শেষতক কী বলা যেতে পারে??

প্রকৃত অবস্থা হল, যেমনটি ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে, অতীতের সমস্ত ফিক্বহবিদগণের বিপরীতে অবস্থান নিয়ে আমাদের সময়কার কিছু আলেম দাবী করেছেন যে, বাকী বেচাকেনায় নগদের তুলনায় মূল্য বেশী নির্ধারণ করা জায়েয নয়। এই অবস্থানের পক্ষে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ত্বাসীন সাহেব তার বিভিন্ন প্রবন্ধে জোরদার ওকালতি করেছেন। যাঁরা "মুরাওয়াজাহ ইসলামী ব্যাংকারী" লিখেছেন তারা এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শুরুতে বলেছিলেন:

"মতামতটি আপন জায়গায় খুব ভারসাম্যপূর্ণ এবং উল্লেখিত হাদীসের উদ্দেশ্যের প্রতি গবেষণার আহ্বানও বটে। এ দৃষ্টিভঙ্গি প্রখ্যাত ইসলামী অর্থনীতিবিদ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ত্বাসীন রহ. ও তাঁর মতাদর্শী উলামা(?)দের"

পরবর্তীতে "মুরাওয়াজা ইসলামী ব্যাংকারী" নামক লেখাটি যখন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় তখন কোন বিশেষ কারণে তা থেকে প্রখ্যাত ইসলামী অর্থনীতিবিদ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ত্বাসীন রহ.-এর নাম বাদ দেয়া হয়। তবে প্রকৃত সত্য হল, এটা তাঁরই দৃষ্টিভঙ্গি। কিতাবটিতে আরো বলা হয়েছে যে, তিনি শুধু মুরাবাহা মুয়াজ্জাল নয়; বরং মুরাবাহা মুতলাক্বা (সাধারণ মুরাবাহা) কেও নাজায়েয বলতেন।

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ত্বাসীন সাহেব রহ.-এর অবস্থান যেহেতু পূর্বসূরী সকল ফিক্বহবিদগণের উদ্ধৃতিসমূহের বিপরীত ছিল তাই তিনি পরিস্কার ভাষায় তার এই অবস্থানের ভিত্তি কি তা স্পষ্ট করেছিলেন। এ বিষয়ে তিনি মাসিক 'আল বালাগ'-এ একটি প্রবন্ধ লিখেন। যাতে তিনি বলেন: "আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে মাদ্রাসা থেকে ফারিগ হওয়া ও মুদাররিস হওয়ার পর আমিও এমনসব কথাবার্তা বলতাম যা ঐসব টিকায় (যেখানে ফিক্বহের উদ্ধৃতিগুলো উল্লেখ ছিল) বলা হয়েছিল। কিন্তু আজ এর জন্য আমার হাসি পায় এবং আমি লজ্জিত হই। আমিও বলতাম ফিক্বহবিদগণ যা লিখে গেছেন তা যথেষ্ট, শেষকথা ও কুরআন-হাদীসের সঠিক অনুকরণ। তাই সকল মাসআলার শরয়ী হুকুমের জন্য আমাদের শুধু হানাফী ফিক্বহের কিতাবসমূহের আশ্রয় নিতে হবে।..... আজ কোন নতুন মাসআলা নিয়ে সরাসরি কুরআন-হাদীসে গবেষণা করা ইজতেহাদ; কয়েক শতাব্দী পূর্বেই যার দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। তাই ইজতেহাদ করা পাপ, তা থেকে বাঁচা জরুরী। অন্যথায় বড় ধরণের অনর্থ সৃষ্টি হবে এবং মুসলমানদের ক্ষতি সাধিত হবে। আমরা এটাও বলতাম যে, আজ কোন মাসআলার ব্যাপারে বহু বড় আলেমে দ্বীনের কোন ব্যাখ্যা ও মতামত কুরআন-হাদীসের সাথে যতই সামঞ্জস্যপূর্ণ হোক তা ততক্ষণ মানা যাবে না যতক্ষণ না তার পক্ষে পূর্ববর্তী কোন ফিক্বহবিদের মতামত পাওয়া না যায়। এটাও বলতাম, কোন মাসআলার ব্যাপারে সঠিক ও সত্য কথা সেটাই যা হানাফী ফিক্বহের কিতাবগুলোতে আছে এবং মতবিরোধের সময়

অন্য ফিক্বহের সকল কথাকে ভুল প্রমাণিত করে নাকচ করে দিতে হবে। আর এটাই দ্বীনে ইসলামের সঠিক খেদমত ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু যখন বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হল এবং আগত মাসআলাগুলোর বাস্তবতা ভিত্তিক ও ইনসাফের সাথে ফিক্বহী কিতাবাদী গবেষণা করার প্রয়েজনীয়তা দেখা দিল তখন বুঝতে পারলাম, আমরা যা বলতাম তা বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে, স্বল্পজ্ঞান, স্বল্পবুদ্ধি ও অন্ধ অনুকরণের ফলাফল ছাড়া আর কিছুই নয়। এভাবে আমরা অজ্ঞতা ও মূর্খতার মধ্যে লিপ্ত ছিলাম।" -(মাসিক আল বালাগ জুমাদাস সানি ১৪১৬ হিঃ সংখ্যা, পৃঃ ২৫)

এটাই সেই 'ভারসাম্যপূর্ণ' অবস্থান, যার ভিত্তিতে অতীতের সকল ফুক্বাহায়ে কেরামের দৃষ্টিভঙ্গিকে 'অন্যায়ভাবে হাতিয়ে নেয়ার অন্তর্ভূক্ত' বলে জমহুর তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামাদের অবস্থান হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে!!! হযরত মাওলানা ত্বাসীন রহ. থেকে আমিও বিশেষ উপকৃত হয়েছি। অর্থনীতি বিষয়ে তাঁর ইজতেহাদী দর্শনসমূহ বিভিন্ন বৈঠকে সরাসরি শুনার সুযোগ হয়েছে। যেহেতু তিনি এখন আল্লাহর কাছে চলে গেছেন তাই তাঁর সেসব দর্শন এখানে উল্লেখ করা সমীচীন হবে না। মহান আল্লাহ তাঁর সকল গুনাহ মাফ করে দিয়ে তাঁকে রহমতে আবদ্ধ করে নিন! আমীন সুম্মা আমীন!

ওয়াদা'র (অঙ্গীকার/প্রতিশ্রুতির) শরয়ী অবস্থান

সামনে অগ্রসর হবার আগে এখানে আরেকটি মাসআলার উপর আলোচনা করা জরুরী। সেটা হল- যদি কোন ব্যক্তি অন্য কারো সাথে ভবিষ্যতে কোন লেনদেন বা চুক্তি করার অঙ্গীকার করে, তাহলে তা তার দায়িত্বে কোন পর্যায়ে আবশ্যক হবে? সুদবিহীন ব্যাংক ব্যবস্থার মুরাবাহা'য় যে ব্যক্তি ব্যাংক থেকে কিছু ক্রয় করতে চায় সে ব্যাংকের কাছে এই অঙ্গীকারই করে যে, আপনি এই জিনিসটি বাজার থেকে কিনলে আমি মুরাবাহা'র ভিত্তিতে আপনার কাছ থেকে তা কিনে নেব। এ ধরণের অঙ্গিকার অনেক ক্ষেত্রে ইজারা ও শিরকাতে মুতানাক্বাসা'তেও করা হয়; যার ব্যাপারে পরে আলোচনা হবে। অতএব, এখানে অঙ্গীকারের শরয়ী অবস্থান সম্পর্কে অল্পবিস্তর আলোচনা জরুরী বলে মনে করি।

প্রথমেই বুঝা দরকার যে, এখানে চারটি ভিন্ন ভিন্ন শব্দ আছে। এগুলোকে অনেক সময় মিলিয়ে ফেলা হয়। প্রকৃত অর্থে এগুলোকে আলাদা মনে করাই উচিৎ। এক. وعده (ওয়াদা/অঙ্গীকার/প্রতিশ্রুতি) দুই. عهد (অঙ্গীকার/দৃঢ় অঙ্গীকার) তিন. معاهده (পারস্পরিক অঙ্গীকার/দ্বিপাক্ষিক অঙ্গীকার) চার. عقد (চুক্তি/বন্ধন)। কোন লেনদেনকে কার্যক্ষেত্রে অস্তিত্ব দান করাকে عقد বলা হয়। যেমন- বেচাকেনায় ايجاب (প্রস্তাব) ও قبول (সমর্থন/গ্রহন) এর মাধ্যমে عقد অস্তিত্ব লাভ করে। এর মাধ্যমে বিক্রিত পণ্যের মালিকানা ক্রেতার কাছে চলে যায়, আর বিক্রেতা মূল্য দাবী করার অধিকার লাভ করে। বেচাকেনার ফলে উভয় পক্ষের উপর চুক্তির বিভিন্ন দায়-দায়িত্ব বর্তায়। এ ব্যাপারে কোন মতবিরোধ নেই। وعده এক পাক্ষিক হয়; যেখানে এক পক্ষ অন্য পক্ষকে কোন কাজ করা না করার ব্যাপারে নিশ্চয়তা প্রদান করে। যেমন- কেউ বলে, আমি আগামীকাল তোমার কাছ থেকে অমুক পণ্য এত টাকা মূল্যে ক্রয় করব। معاهده দ্বিপাক্ষিক অঙ্গীকারকে বলা হয়। যেমন- দুই পক্ষ একে অন্যকে এই নিশ্চয়তা প্রদান করে যে, আমরা অমুক তারিখে পরস্পরের মধ্যে বেচাকেনা করব। عهد শব্দটি কোন কোন সময় وعده বা অঙ্গীকার অর্থে আর কোন কোন সময় معاهده বা দ্বিপাক্ষিক অঙ্গীকার অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে সাধরণভাবে দৃঢ় অঙ্গীকার অর্থেই এর ব্যবহার বেশী।

কথা হল, কোন ব্যক্তি عقد বা চুক্তি করার জন্য এক পাক্ষিক অঙ্গীকার করুক কিংবা উভয় পক্ষ দ্বিপাক্ষিক অঙ্গীকার করুক সে অঙ্গীকার পূরণ করা শরীয়ত অনুযায়ী ওয়াজিব কি না? আর যদি ওয়াজিব হয়, তাহলে তা কি قضـــاءً আবশ্যক? অর্থাৎ, তা কি আদালতের মাধ্যমে কার্যকর করা যাবে? যেহেতু وعده এবং معاهده উভয়ের কোনটি عقد নয়; বরং وعـــده , শুধু পার্থক্য হল, একটি এক পাক্ষিক অন্যটি দ্বিপাক্ষিক, তাই وعـــده বা অঙ্গীকারের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা এবং ফিকৃহবিদগণের উদ্ধৃতিসমূহ উল্লেখ করছি।

কুরআন ও হাদীসে ওয়াদা পূরণের উপর গুরুত্বারোপ ও ভঙ্গের উপর বহু সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে, যা নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

কুরআনে কারীমে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেনঃ

يا ايها الذين آمنوا لم تقولون مالاتفعلون — كبرمقتا عند الله أن تقولوا مالاتفعلون —(الصف: ٢—٣)

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! তোমরা যা কর না, তা কেন বল? তোমরা যা কর না, তা বলা আল্লাহর কাছে খুবই অসন্তোষজনক।

(সুরা আস-সাফ : আয়াত ২-৩)

আরো ইরশাদ হয়েছেঃ

وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً — (بني اسرائيل: ٣٤)

অর্থাৎ, এবং অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (সূরা বনী ইসরাঈলঃ আয়াতঃ৩৪)

হযরত আবু হুরায়রা রাজি. থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ

آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان —

(صحيح البخاري كتاب الإيمان باب علامة المنافق وصحيح المسلم كتاب الإيمان — خصال المنافق)

অর্থাৎ, মুনাফিকের আলামত তিনটি: কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে পূরণ করে না এবং তার কাছে আমানত রাখা হলে তা খিয়ানত (আত্মসাত) করে। –(বুখারী-মুসলিম)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাজি. থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ

أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها ..... إذا حدّث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدروإذا خاصم فجر –(صحيح البخاري باب المظالم، باب إذا خاصم فجر)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তির মাঝে চারটি চরিত্র পাওয়া যাবে সে খাটি মুনাফিক আর যার মধ্যে এর (চারটির) মধ্য থেকে কোন একটি পাওয়া যাবে তার মধ্যে মুনাফিকী চরিত্র বিদ্যমান থাকবে, যতক্ষণ না সে তা পরিহার করে। ...... কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে, পারস্পরিক অঙ্গীকার / চুক্তি করলে তা লংঘন করে এবং ঝগড়া করলে গালমন্দ করে।

সহীহ বুখারীতে হযরত আয়েশা রাজি. থেকে বর্ণিতঃ

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ في صلاته كثيرا من المأثم والمغرم، فقيل له: يا رسول الله ما أكثر ما تستعيذ من المغرم! فقال: إن الرجل إذا غرم حدّث فكذب ووعد فأخلف –(صحيح البخاري كتاب الإستقراض باب من استعاذ من الدين رقم ٢٣٩٧)

অর্থাৎ, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপন নামাযে পাপ ও ঋণ থেকে (আল্লাহর কাছে) অনেক বেশী আশ্রয় চাইতেন। জিজ্ঞাসা করা হল: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি ঋণ থেকে কত বেশী না আশ্রয় প্রার্থনা করেন! হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যখন কোন মানুষ ঋণগ্রস্থ হয় তখন সে কথা বললে মিথ্যা বলে এবং ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে।

রোমসম্রাট হিরাক্লের সামনে হুযুরে আক্বদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৌলিক শিক্ষাবলী সম্পর্কে আবু সুফিয়ান যে বর্ণনা দেন তাতে তিনি ওয়াদার প্রতি গুরুত্বারোপের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করে বলেনঃ

يأمر بالصلاة والصّدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداءالأمانة

(صحيح البخاري كتاب الشهادات رقم ٢٦٨١)

অর্থাৎ, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামায, সত্যবাদীতা, পবিত্রতা, অঙ্গীকার পূরণ এবং আমানত আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাজি. থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

لاتمار أخاك ولاتمازحه ولا تعِده موعدةً فتخلفه ـــ -(أخرجه الترمذي في البر والصلة (حديث ١٩١٨) وقال حسن غريب)

অর্থাৎ, তোমার (মুসলমান) ভাইয়ের সাথে ঝগড়া কর না, তার সাথে বিদ্রুপ কর না এবং তার সাথে এমন ওয়াদা কর না যা তুমি পূরণ করবে না।

হযরত আনাস রাজি. থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له ـــ

(مسند أحمد ٣: ١٣٥و ١٥٤ و٢١ و٢٥١)

অর্থাৎ, যার মধ্যে আমানতদারী নেই তার (পরিপূর্ণ) ঈমান নেই। যার মধ্যে ওয়াদা/ অঙ্গীকারের গুরুত্ব নেই তার (পরিপূর্ণ) দ্বীন নেই।

কুরআন ও হাদীসের এসব উদ্ধৃতি থেকে ওয়াদা/অঙ্গীকার পালনের গুরুত্ব সুস্পষ্ট। তবে ফিক্বহী দৃষ্টিকোন থেকে এ গুরুত্বের অবস্থান কী? সে ব্যাপারে ফিক্বহবিদগণের ভিন্ন ভিন্ন মতামত রয়েছে। অর্থাৎ, কোন ব্যক্তি কারো সাথে ওয়াদা করলে তা পালন করা তার জন্য মুস্তাহাব নাকি ওয়াজিব তথা আবশ্যক? যদি আবশ্যক হয়ে থাকে তাহলে قضـــاءً (আইনগতভাবে) আবশ্যক, নাকি ديانةً (সততার ভিত্তিতে) আবশ্যক? এ ব্যাপারে ফিক্বহবিদগণের বিভিন্ন মত রয়েছে।

এক. সাধারণভাবে হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবে প্রসিদ্ধ মত হল- ওয়াদা পূরণ করা ওয়াজিব নয়; বরং মুস্তাহাব ও উত্তম চরিত্রের অন্ত র্ভূক্ত। মালেকী মযহাবের কিছু উলামায়ে কেরামের মতও এরূপ। −(উমদাতুল ক্বারী ১২: ১২১, মিরকাতুল মাফাতিহ ৪: ৬৫৩, ইমাম নববীর আল আযকার পৃ: ২৮২)

উপরোক্ত আলেমগণ বলেন, হাদীসে ওয়াদা ভঙ্গকারীকে যে মুনাফিক বা মুনাফিকীর আলামত বলা হয়েছে তা সে সময়ই প্রযোজ্য হবে যখন কোন ব্যক্তি ওয়াদা করার সময় মনে মনে তা পূরণ না করার নিয়ত করে। তবে যদি এরকম নিয়ত না থাকে এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে ওয়াদা ভঙ্গ হয়ে যায় তাহলে তাতে কোন পাপ হবে না।

দুই. ওয়াদা পূরণ করা আইনগত এবং সততা উভয় ভিত্তিতেই ওয়াজিব তথা আবশ্যক। হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব রাযি, হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ রহ, হযরত হাসান বসরী রহ, ক্বাজী সাঈদ ইবনুল আশওয়া' রহ, ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ্ রহ. এবং ইমাম বুখারী রহ. প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ এ মত পোষণ করেন। এ সকল মাযহাব ইমাম বুখারী রহ. কিতাবুশ শাহাদাতে বাবু ইনজাযিল ওয়া'দ-এ উল্লেখ করেছেন। এটি মালেকী মাযহাবের কিছু উলামায়ে কেরামেরও মত। ক্বাজী আবু বকর ইবনুল আরবী রহ. ও ইবনুশ শাত্ব রহ. এই মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। −(তাফসীরে কুরতুবী ১৮:২৯, হাশিয়াতু ইবনিশ শাত্ব আলাল ফুরুক লিল কারাফী ৪:২৪)

তিন. এটি অধিকাংশ মালেকী উলামার মাযহাব। তা হল− ওয়াদার কারণে কোন মানুষ যদি ওয়াদাকৃত ব্যক্তিকে (যার সাথে ওয়াদা করা হয়েছে তাকে) দিয়ে এমন কোন কাজ করিয়ে নেয় যার কারণে তার আর্থিক ও শারিরিক ক্ষতি সাধিত হয় এবং ওয়াদা ছাড়া তা সে করত না, তাহলে সে ওয়াদা পূরণ করা সততা ও আইনগত উভয় দিক থেকেই আবশ্যক। যেমন, কেউ অন্যকে বলল: তুমি তোমার ঘর ভেঙ্গে ফেল আমি পূণঃরায় নির্মাণ করে দেব, এ প্রতিশ্রুতির উপর ভিত্তি করে সে ঘর ভেঙ্গে ফেলল, এক্ষেত্রে ওয়াদাকারী কর্তৃক ঐ ঘর নির্মাণ করে দেয়া সততা ও আইনগত উভয়ভাবেই আবশ্যক। অথবা, কেউ অন্যকে বলল: তুমি বিয়ে কর, আমি তোমাকে ঋণ দেব। একথার উপর ভরসা করে সে বিয়ে করে

ফেললে ঋণ দেয়া ওয়াদাকারীর জন্য আবশ্যক হয়ে পড়ে। হ্যাঁ! যে কাজের কারণে ওয়াদা করা হয়েছে ওয়াদাকৃত ব্যক্তি তা করলেই কেবল ওয়াদাকারীকে তার ওয়াদা পূরণ করতে হবে। কিন্তু সে কাজটি করার আগেই ওয়াদাকারী যদি তার ওয়াদা ফিরিয়ে নেয় তাহলে ওয়াদাটি পূরণ করা জরুরী নয়। তবে ইমাম আসবাগ রহ. বলেন, ওয়াদাকৃত ব্যক্তি কাজ শুরু না করলেও ওয়াদা পূরণ করতে হবে। –(আল ফুরুক লিল কারাফী ৪:২৫, ফাতহুল আলী আল মালেক ১:২৫৪)

চার. ওয়াদা পূরণ করা সততা ও দ্বীনদারী হিসেবে ওয়াজিব। কোন কারণ ছাড়া ওয়াদা ভঙ্গ করা পাপ। তবে কোন কারণ থাকলে জায়েয আছে। সাধারণ অবস্থায় ওয়াদা পূরণ করা আইনগতভাবে আবশ্যকীয় নয়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে আইনগতভাবে পূরণ করার প্রয়োজন হলে তা আবশ্যক করার ব্যাপারে ফতোয়া দেয়া যেতে পারে।

হানাফীদের প্রসিদ্ধ মাযহাব সেটাই যা উপরে উল্লেখিত হয়েছে। তবে কোন কোন হানাফী আলেম ওয়াদার আবশ্যকীয়তাকে প্রাধান্য দেন বলে মনে হয়। হযরত ইমাম আবু বকর জাস্‌সাস রহ. لم تقولون ما لاتفعلــون আয়াতটির ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ

يحتج به في أن كل من ألزم نفسه عبادة أو قربة وأوجب على نفســه عقدا لزمه الوفاء به إذ ترك الوفاء به يوجب أن يكون قائلا مالايفعل وقد ذمّ الله فاعل ذلك ــ وهذا فيما لم يكن معصية ــ فأما المعصية فإن إيجابها في القول لايلزمه الوفاء بها وقال النبي صلى الله عليه وســلم: لانــذر في معصية وكفارته كفارة يمين ــ وإنما يلزم ذلك فيما عقده على نفسه ممــا يتقرب به إلى الله عزوجل ومثل النذور وفي حقوق الآدميين العقود الــتي يتعاقدونها ــ -(أحكام القرآن للجصاص ٣: ٤٤٢)

অর্থাৎ "এই আয়াত থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, কোন ব্যক্তি নিজের উপর যদি কোন ইবাদত অথবা আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের কোন আমল আবশ্যকীয় করে নেয় অথবা নিজের উপর কোন চুক্তি বা লেনদেন ওয়াজিব করে, তাহলে তা পূরণ করা আবশ্যক। কেননা, তা পূরণ না

করার অর্থ হচ্ছে, সে এমন কথা বলছে যা সে করে না। আর এরকম যারা করে আল্লাহ তাদের সমালোচনা করেছেন। এটা ঐ কাজের বেলায় প্রযোজ্য, যেটা করা গুনাহ নয়। যদি কাজটি পাপের হয়ে থাকে, তাহলে তা মুখে আবশ্যক করার কারণে আবশ্যক হবে না। কেননা, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, পাপের কাজে কোন মান্নত নেই। তার কাফ্ফারা হচ্ছে কসমের কাফ্ফারার মত। মানুষের সেসব কাজ আবশ্যক করার কারণে আবশ্যকীয় হয়ে যায়, যেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করা যায়। যেমন- মান্নত। মানুষের হকের ব্যাপারে কোন জিনিস আবশ্যক করে নিলে তা আবশ্যক হয়ে যায়। অর্থাৎ, ঐসব চুক্তি যা মানুষ করে।"

এখানে 'নিজের উপর কোন চুক্তি বা লেনদেন ওয়াজিব করে' কথাটি থেকে দৃশ্যত বুঝা যায় যে, কোন ব্যক্তি ভবিষ্যতে কোন চুক্তি করার ওয়াদা করলে তা অবশ্য পালনীয় হয়ে যায়। কিন্তু এখানে অন্য একটি সম্ভাবনাও বিদ্যমান আছে যে, এখানে ঐ কাজই উদ্দেশ্য যা কোন চুক্তির ফলে মানুষের উপর আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে।

পরবর্তী হানাফী ফিক্বহবিদগণ দুটি পদ্ধতির ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, এ দু'টিতে যে ওয়াদা করা হবে তা আইনগতভাবে আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। এক. ওয়াদা আবশ্যকীয় করা মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় হলে। দুই. কোন বিষয়ের সাথে ওয়াদাকে সংযুক্ত করে দিলে। প্রয়োজনের কথাটি হানাফী ফিক্বহবিদগণ بيع بالوفاء এর সূত্রে লিখেছেন। প্রকৃত পক্ষে بيع بالوفاء ঐ বেচাকেনাকে বলে, যেখানে বিক্রেতা ক্রেতাকে বলে যে, আমি এই জিনিসটি এখনতো তোমার কাছে বিক্রি করছি, তবে কখনো আমি মূল্য ফেরত দিলে এই জিনিসটি আমার কাছে পূণঃ বিক্রি করতে হবে। আসলে এটা বন্ধকী জিনিস থেকে ফায়দা হাসিল করার একটা কৌশল ছিল। সাধরণত ঋণের গ্যারান্টি হিসেবে কোন ব্যক্তি কোন জিনিস বন্ধক রাখলে ঋণদাতার জন্য ঐ জিনিস থেকে ফায়দা হাসিল করা সুদ হওয়ার কারণে না জায়েয হয়। তাই ঋণগ্রহণে আগ্রহী ব্যক্তি তার কাছ থেকে ঋণ নেয়ার পরিবর্তে কোন জিনিস (উদাহরণস্বরূপ: জমি) বিক্রি করে। যাতেকরে ঐ মূল্য দিয়ে সে ফায়দা হাসিল করতে পারে এবং

ক্রেতার জন্য ঐ জমিতে চাষাবাদ করা জায়েয হয়ে যায়। তবে সাথে এ শর্তও আরোপ করা হয় যে, যখন আমি তোমার কাছ থেকে নেয়া মূল্য নিয়ে আসব তখন এই জমি পূণঃরায় আমার কাছে বিক্রি করতে হবে। এই পূণঃরায় বিক্রয়কে وفاء বলা হয়।

কিছু হানাফী ফক্বীহ এ বেচাকেনাকে সঠিক বলে সাব্যস্ত করেছেন এবং প্রয়োজনের কারণে এই শর্তকেও জায়েয বলেছেন। নেহায়া কিতাবের রচয়িতা এর উপরই ফতোয়া দিয়েছেন। আল্লামা শামী রহ. আল্লামা যীলয়ী রহ.-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, বেচাকেনা শুদ্ধ হবে এবং বিক্রিত জিনিস থেকে ফায়দা হাসিল করা ক্রেতার জন্য হালাল হবে। কিন্তু যেহেতু শর্তারোপ করা হয়েছে যে, বিক্রেতা কখনো মূল্য ফেরত আনলে পূণঃরায় তার কাছে বিক্রয় করতে হবে, তাই অন্য কোথাও বিক্রয় করা ক্রেতার জন্য বৈধ হবে না। আল্লামা যীলয়ী রহ. এই মতামতকে ফতোয়াযোগ্য বলে অভিহিত করেছেন। আল্লামা শামী রহ. নাহরের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, আল্লামা যীলয়ী রহ. যে মতামতকে প্রাধান্য দিয়েছেন আমাদের দেশেও তার উপর আমল করা হয়। অতএব, আল্লামা হিসকাফী রহ. বলেনঃ وقيل: بيع يفيد الإنتفاع به. وفي إقالة شرح المجمع عن النهاية: وعليه الفتوى। এর টিকায় আল্লামা শামী রহ. লেখেনঃ

قوله: وقيل بيع يفيد الإنتفاع به. هذا محتمل لأحد القولين: الأول أنه بيع صحيح مفيد لبعض أحكامه من حل الإنتفاع به إلا أنه لايملك بيعه. قال الزيلعي في الإكراه: وعليه الفتوى .... وفي النهر: والعمل في ديارنا على ما رجحه الزيلعي . –(رد المحتار ج:٥ ص:٢٧٧)

তবে অধিকাংশ হানাফী ফক্বীহদের মত হল, وفاء বা পূণঃবিক্রয়ের শর্তটি যদি মূল বেচাকেনার মধ্যে করা হয় তাহলে তা ফাসেদ এবং নাজায়েয হবে। আর যদি শর্তটি মূল বেচাকেনা করার সময় না করা হয়ে থাকে অর্থাৎ, বেচাকেনা শর্তহীনভাবে করে বিক্রেতা পৃথকভাবে ওয়াদা করবে যে, তুমি মূল্য ফেরত নিয়ে এসে জমিটি আমার কাছে কিনতে চাইলে আমি তোমাকে পূণঃরায় বিক্রি করে দেব, তাহলে তা জায়েয হবে

এবং ওয়াদাটি পালন করা বিক্রেতার জন্য আবশ্যকীয় হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে হানাফী ফক্বীহগণের সুস্পষ্ট উদ্ধৃতিসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হল।

জামেউল ফুসুলাইনে আছেঃ

"ولو ذكرا البيع بلا شرط على وجه العدة جاز البيـــع ولـــزم الوفـــاء بالوعد، إذ المواعيد قد تكون لازمة فيجعل لازما لحاجة الناس"—(جـــامع الفصولين، الفصل ١٨ في بيع الوفاء ج:١ ص:٢٣٧، اسلامي كتب خانه، بنوري تاون)

"যদি তারা উভয়ে কোন শর্ত ছাড়া বেচাকেনা করে ফেলে, অতঃপর অঙ্গীকার হিসেবে (وفـــاء)এর শর্ত করে, তাহলে বেচাকেনা জায়েয হবে এবং এই অঙ্গীকার পূরণ করা আবশ্যক হবে। কেননা, কখনো কখনো মানুষের প্রয়োজনের কারণে ওয়াদা আবশ্যকীয় হয়ে যায়।"

এই একই কথা ফতোয়া ক্বাজীখান, রদ্দুল মুহতার এবং শরহুল মাজাল্লা ইত্যাদি কিতাবে উদ্ধৃত আছে। –(ফতোয়া ক্বাজী খান খন্ড:২ পৃ:৬৪. শরহুল মাজাল্লা খন্ড:২ পৃ:৬১)

মোট কথা, হানাফী ফিক্বহবিদগণ بيع بالوفاء এর ওয়াদাকে আবশ্যকীয় সাব্যস্ত করে বলেছেন যে, মানুষের প্রয়োজনের কারণে কোন কোন ওয়াদাকে কোন কোন সময় আবশ্যকীয় করা হতে পারে।

ফিক্বহবিদগণ যে কথা বলেছেন "মানুষের প্রয়োজনের কারণে কোন কোন ওয়াদাকে কোন কোন সময় আবশ্যকীয় করা হতে পারে" অনেকেই তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে, যার সারাংশ হল- এখানে উদ্দেশ হচ্ছে ঐসব হক আদায়ের ওয়াদা যা কোন ঋণ আদায়ের সময় ও মেয়াদ সম্পর্কিত হয়, অথবা কোন চুক্তি যেমন সলম ও অর্ডার দিয়ে তৈরী ইত্যাদির ভিত্তিতে আবশ্যক হয় এবং এর ভঙ্গের কারণে ওয়াদাকৃত ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্থ হয়।–(মুরাওয়াজা ইসলামী ব্যাংকারী পৃ:২৭৮-২৮০) কিন্তু তাঁর এটা লক্ষ্য করেননি যে, ফুক্বাহায়ে কেরাম এ বাক্যটি بيع بالوفاء এর ক্ষেত্রে বলেছেন। এখানে وفـــاء এর যে ওয়াদা তা কোন ঋণ আদায়ের মেয়াদ

সংক্রান্ত নয় কিংবা কোন চুক্তির মাধ্যমে আবশ্যক হয়নি। এই وفـــاء আবশ্যকীয় হওয়ার ভিত্তি ওয়াদা ছাড়া অন্য কিছু নয়। এখন চিন্তার বিষয় হল: ঋণ কিংবা চুক্তির মাধ্যমে প্রমাণিত বকেয়া হকসমূহে আদায়ের মেয়াদ নির্ধারণ করা চুক্তিটি বৈধ হওয়ার জন্য জরুরী। এটা ছাড়া চুক্তি শুদ্ধ হবে না। যেহেতু মেয়াদ নির্ধারণ হওয়ার মাধ্যমে চুক্তি শুদ্ধ হয় তাই সময়মত আদায় করার ওয়াদা চুক্তিরই একটি অংশ; যা সর্বদা আবশ্যক হয়। এমন একটি বিষয়ের ব্যাপারে কিভাবে বলা হল "কোন কোন সময় আবশ্যকীয় করা হতে পারে"। অর্থাৎ, সাধরণত তা আবশ্যক হয় না; মানুষের প্রয়োজনে আবশ্যক হতে পারে। অতএব, ব্যাখ্যাটি সুস্পষ্টভাবে ভুল। বাক্যটির প্রকৃত উদ্দেশ্য হল: যা প্রথম থেকে আবশ্যকীয় ছিল না মানুষের প্রয়োজনে কোন কোন সময় তা ওয়াদার মাধ্যমে আবশ্যকীয় করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় যে ওয়াদাকে হানাফী ফিক্বহবিদগণ আবশ্যকীয় বলেছেন, তা ঐ ওয়াদা যা কোন শর্তের সাথে সংযুক্ত করে দেয়া হয়। মাজাল্লাতুল আহকামিল আদালিয়্যাতে আছে:

"(المادة ٨٤) المواعيد بصور التعاليق تكون لازمة؛ لأنه يظهر فيها حينئذ معنى الإلتزام والتعهد.

এর ব্যাখ্যায় মাজাল্লা'র ব্যাখ্যাগ্রন্থ দুরারুল হুক্কামে বলা হয়েছে:

"هذه المادة مأخوذة عن الأشباه من كتاب الحظر والإباحة حيث يقول: ولايلزم الوعد إلا إذا كان معلقا وقد وردت في البزازية أيضا بالشكل الآتي: 'لما أن المواعيد باكتساء صور التعليق تكون لازمة'

يفهم من هذه المادة أنه إذا علق وعد على حصول شيئ أو على عدم حصوله فثبوت المعلق عليه أي الشرط كما جاء في المادة يثبت المعلق أو الموعود.

مثال ذلك: لو قال رجل لآخر: بع هذا الشيئ من فلان وإذا لم يعطك ثمنه، فأنا أعطيك إياه فلك يعطه المشتري الثمن لزم على الرجل أداء الثمن المذكوربناء على وعده

(درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ج:١ ص:٧٧،٧٨ ط: دارالكتب العلمية)

এই কথাটি যদিও অনেক হানাফী ফিক্বহ গ্রন্থে ব্যাপকভাবে আছে যে, 'ওয়াদা কোন বিষয়ের সাথে সংযুক্ত হলে আবশ্যকীয় হয়' যার অর্থ হল: যে কোন ধরনের ওয়াদা যে কোন শর্তযুক্ত হলে তা আবশ্যকীয় হয়, তবুও যেসব ফুক্বাহায়ে কেরাম একথাটি আলোচনা করেছেন তাদের দেয়া উদাহরণ গবেষণা করলে বুঝা যায় যে, এটি মাত্র দু'টি বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। এক. জামানতের সাথে এবং দুই. মান্নতের সাথে। ফতোয়া বায্‌যাযীয়াতে আছে:

"الذهب الذي لك علي فلان أنا أدفعه أو أسلمه إليك أو أقبضه مني لايكون كفالة ما لم يقل لفظا يدل على اللزوم، كضمِنت أوكفلت وهذا إذا ذكره منجزا أما إذا ذكره معلقا بأن قال: إن لم يؤد فلان فأنا أدفعه إليك ونحوه يكون كفالة لما علم ان المواعيد باكتساب صورة التعليق تكون لازمة. فإن قوله: 'أنا احج' لايلزم له شيئ، ولو علّق وقال: 'إن دخلت الدار فأنا أحج' يلزم الحج" —(البزازيةعلى هامش الهندية، كتاب الكفالة الفصل الأول ج:٦ ص:٣ ط: رشيدية)

"কোন ব্যক্তি যদি বলে, অমুকের কাছে তুমি যে সোনা পাও তা আমি তোমাকে দিয়ে দিব অথবা তোমাকে হস্তান্তর করব অথবা তুমি তা আমার কাছ থেকে নিয়ে নাও– তাহলে এসব শব্দ দ্বারা জামানত প্রমাণিত হবে না, যতক্ষণ না সে এমন কোন শব্দ ব্যবহার করে যা দ্বারা আবশ্যকীয়তা বুঝায়। যেমন- আমি জামানত নিচ্ছি অথবা আমি জামানতদার হচ্ছি। এটা তখন প্রযোজ্য হবে যখন কথা শর্তহীন হয়। কিন্তু যদি তা শর্তযুক্ত হয় যেমন, বলবে: অমুক তোমাকে আদায় না করলে আমি তোমাকে

আদায় করব অথবা এ জাতীয় কোন বাক্য ব্যবহার করে, তাহলে জামানত প্রমাণিত হবে। কেননা, এটি জানা কথা যে, ওয়াদা শর্তযুক্ত হলে তা আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। অতএব, কেউ যদি বলে 'আমি হজ্জ্ব করব তাহলে তার উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। আর যদি শর্তযুক্ত করে কেউ বলে 'আমি ঘরে ঢুকলে হজ্জ্ব করব তাহলে তার উপর হজ্জ্ব ফরয হয়ে যাবে।"

এধরণের অনেক উদাহরণ ফতোয়া খানিয়া আলা হামিশিল হিন্দিয়া, ফসলূন ফিল কিফালাতি বিল মালি খন্ড:২ পৃ:৬০, আলবাহরুর রায়েক্ব কিতাবুস সাওম খন্ড:২ পৃ:৫১৯, তাতারখানিয়া কিতাবুস সাওম খন্ড :২ পৃ: ৩০৮, জামেউল ফুসুলাইন বাহসু আলফাজিল কিফালা খন্ড:২ পৃ:৫৪, রদ্দুল মুহতার কিতাবুল কাফালা খন্ড :৫ম পৃ: ২৮৮,৮৯,২, শরহুল আশবাহ ওয়ান নাযায়ির কিতাবুল হাযরে ওয়াল ইবাহা খন্ড: ২ পৃ:৪৬৪, ৪৬৫, এবং শরহুল মাজাল্লাহ মাদ্দা:৬২৩, খন্ড:২ পৃ:৯ ইত্যাদি কিতাবে আছে। যার কারণে মনে হয়, এই মূলনীতি শুধু জামানত ও মান্নতের সাথেই বিশেষভাবে সম্পৃক্ত।

কুরআন, হাদীস ও ফুক্বাহায়ে কেরামের উপরোক্ত উদ্ধৃতিসমূহের আলোকে স্পষ্ট হয় যে, ওয়াদা রক্ষা করা সাধারণ অবস্থায় শুধু সততা ও দ্বীনদারীর ভিত্তিতে ওয়াজিব এবং ওয়াদার বরখেলাফ করা গুনাহ, যদি তা কোন অপারগতা ব্যতিরেকেই করা হয়। অপারগতার কারণে ওয়াদা খেলাফ করা জায়েয। যেমন, কোন ব্যক্তি কারো সাথে নিজের মেয়ের বাগদান সম্পন্ন করল। এর মাধ্যমে সে ঐ লোকের সাথে তার মেয়ে বিয়ে দেয়ার ওয়াদা করল। এখন সাধারণভাবে এই ওয়াদা পূরণ করা ওয়াজিব। কিন্তু যদি কোন অপারগতা সামনে চলে আসে যেমন, মেয়ের ব্যাপারে জানা গেল যে, সে ভাল নয়, এক্ষেত্রে বাগদান ছিন্ন করা জায়েয। এধরণের ওয়াদাগুলো আইনগতভাবে আবশ্যক নয়।

ইমাম গাযালী রহ. বলেন:

" ثم إذا فهم مع ذلك الجزم في الوعد فلا بد من الوفاء إلا أن يتعذر— فإن كان عند الوعد عازما على أن لايفي فهذا هو النفاق — وقال أبوهريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه هو منافق وإن

صام وصلى .... وهذا يترل على عزم الخلف أو ترك الوفاء من غيرعذر—
فأما من عزم على الوفاء فعنّ له عذرمنعه من الوفاء لم يكـــن منافقـــا وإن
جرى عليه ما هو صورة من النفاق ولكن ينبغي أن يحترز من صورة النفاق
أيضا كما يحترز من حقيقته ولا ينبغي أن يجعـــل نفســـه معـــذورا مـــن
غيرضرورة حاجزة."

(إحياء علوم الدين للغزالي، بحث آفات اللسان ٣: ١٣٢)

"অতঃপর এর সাথে অঙ্গীকারে যদি দৃঢ়তা বুঝা যায় তাহলে তা পূরণ করা ছাড়া কোন উপায় নেই, যতক্ষণ না তা অসম্ভব হয়। কেউ অঙ্গীকার করার সময়ই যদি পূরণ না করার সংকল্প করে তাহলে তা অবশ্যই মুনাফিকী বা কপটতা। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তিনটি জিনিস যার মধ্যে পাওয়া যায় (তার মধ্যে একটি ওয়াদা ভঙ্গ করা) সে নামায রোজা আদায় করলেও মুনাফিক। এই হাদীসটি ঐ ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যখন শুরু থেকেই ওয়াদা খেলাফ করার ইচ্ছা থাকে বা কোন অপারগতা ছাড়াই ওয়াদার বরখেলাফ করে। কোন ব্যক্তি অঙ্গীকার পূরণে সংকল্পবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও কোন অপারগতার কারণে পূরণ করতে না পারলে সে মুনাফিক হবে না। যদিও তার কাজটি মুনাফিকীর মত। তবে প্রকৃত মুনাফিকী থেকে যেমন বাঁচা জরুরী তেমনি মুনাফিকীর মত কাজ থেকেও বাঁচা জরুরী। কোন কঠিন প্রয়োজন ছাড়া নিজেকে অপারগ মনে করা উচিৎ নয়।"

তবে অর্থনৈতিক লেনদেনসমূহে যেখানে প্রয়োজন বিদ্যমান সেখানে ওয়াদাকে আইনগতভাবেও আবশ্যকীয় করা যেতে পারে। যার একটি উদাহরণ بيع بالوفـــاء-এর ক্ষেত্রে ইতোপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। বিষয়টিকে ফিক্বহবিদগণ بيع بالوفـــاء এর সাথে বিশেষায়িত না করে ব্যাপকতা দান করেছেন। " إذ المواعيد قد تكون لازمة فيجعل لازمـــا لحاجـــة النـــاس" "কেননা মানুষের প্রয়োজনের কারণে ওয়াদাকে কোন কোন সময় আবশ্যকীয় করা হতে পারে"।

হযরত শুআইব আলাইহিস সালাম হযরত মুসা আলাইহিস সালামকে বলেছিলেন, আমার দুই মেয়ের মধ্য থেকে একজনের বিয়ে আমি তোমার সাথে দিতে চাই, তবে শর্ত হচ্ছে, তোমাকে আমার কাছে আট বছর পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করতে হবে। এখন প্রশ্ন হল: মেয়ে কোনটি তা নির্ধারিত করা ছাড়াই বিয়ে দেয়া কিভাবে সঠিক হল? এবং বিয়েকে ইজারার সাথে কিভাবে শর্তযুক্ত করা হল? এর উত্তরে আল্লামা আইনী রহ. বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেন:

" فإن قلت: كيف يصح أن ينكح إحدى إبنتيه من غيرتمييز قلــــت: لم يكن ذلك عقد النكاح ولكن مواعدة ومواضعة أمر قد عــــزم عليــــه" — (عمدة القاري كتاب الإجارات باب من استأجر أجيرافيمن له الأجل و لم يبين له العمل ١٢:١٢١)

"যদি তুমি বল, পার্থক্য করা ছাড়া দুই মেয়ের একজনকে বিয়ে দেয়া কীভাবে সঠিক হয়? তাহলে আমি উত্তরে বলি: এটা কোন বিবাহ বন্ধন ছিল না; বরং একটি অঙ্গীকার এবং কাজের সম্মতির ব্যাপারে সংকল্প মাত্র।"

বর্তমানে আর্থিক লেনদেনসমূহে কোন কোন ক্ষেত্রে ওয়াদাকে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় করা ছাড়া কোন উপায় নেই। এক্ষেত্রে ওয়াদাকে আবশ্যকীয় করার প্রয়োজনীয়তা بيــــع بالوفـــاء তুলনায় অনেক বেশী। অবস্থা এমন যে, বিষয়টি শুধু ব্যাংকিংয়েরই নয়; বরং অনেক ব্যবসায়ী আছেন যারা অর্ডারের উপর ভিত্তি করে মাল আনেন। মাল আসলে অর্ডারদাতার কাছে বিক্রয় করেন। অর্ডার দেয়ার সময় মালটি ব্যবসায়ীর কাছে উপস্থিত থাকে না। তাই ঐ সময় শরীয়ত অনুযায়ী নিয়মিত বেচাকেনা হতে পারে না; শুধু ওয়াদা হতে পারে। আর এই ওয়াদা যদি আবশ্যকীয় না হয় এবং ব্যবসায়ী অর্ডারের উপর ভিত্তি করে মাল নিয়ে আসে, অতঃপর অর্ডারদাতা যদি তার ওয়াদা থেকে ফিরে আসে তাহলে ব্যবসায়ীটি বড় ধরণের ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে দৈনিক ভিত্তিতে মালের প্রয়োজন হয় এবং সে কোন ব্যবসায়ীর

কাছ থেকে দৈনিক মাল সরবরাহের দ্বিপাক্ষিক অঙ্গীকার করে। যেমন, হোটেল; কোন ব্যবসায়ীর সাথে দৈনিক বড় পরিমাণে গোশত সরবরাহ করার দ্বিপাক্ষিক অঙ্গীকার করে। ব্যবসায়ীটি শুধু এই ওয়াদার উপর ভিত্তি করে এই বিরাট পরিমাণ মাল ব্যবস্থা করে নেয়। এক্ষেত্রে হোটেল ওয়ালা যদি তা গ্রহণে অস্বীকার করে তাহলে ব্যবসায়ীটি বড় ধরণের ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ব্যবসা-বাণিজ্যে এর প্রয়োজনীয়তা আরো অনেক বেশী অনুভুত হয়। কেউ জাপান থেকে কোন মাল আমদানী করতে চাইলে তাকে ব্যাংকে এলসি খুলতে হয়। যার মাধ্যমে জাপানের ব্যবসায়ী আশ্বস্থ হয় যে, আমি মাল পাঠালে তার দাম ব্যাংকের মাধ্যমে পেয়ে যাব। (এই এলসি খোলাকে 'মুরাওয়াজা ইসলামী ব্যাংকারী' নামক কিতাবেও ২৯১ নং পৃষ্ঠায় জায়েয বলা হয়েছে)। কিন্তু এলসি খোলার জন্য ক্রেতা এবং জাপানের ব্যবসায়ীর মাঝে ক্রয়ের অলঙ্ঘনীয় চুক্তি হওয়া আবশ্যক। এটা ছাড়া কোন ব্যাংকে এলসি খোলা যায় না। তাই এলসি খোলার পূর্বেই ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে বেচাকেনার অবশ্য পালনীয় অঙ্গীকার করা জরুরী। এই অঙ্গীকারকে শরীয়তের দৃষ্টিতে বেচাকেনা বলা যাবে না। কেননা, সাধারণত যখন এই অঙ্গীকার/চুক্তি করা হয় তখন বিক্রেতার কাছে অঙ্গীকারে প্রার্থিত মালটি উপস্থিত থাকে না। তাই এতে বেচাকেনার জন্য ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ, বিক্রেতা বলে, তুমি নির্ধারিত মূল্যের ভিত্তিতে যখন এলসি খুলবে তখন আমি এই মাল এত পরিমাণে ক্রয় করে তোমার জন্য জাহাজে উঠিয়ে দিব। তাই এটাকে বেচাকেনা বলা যায় না; বরং এটা বেচাকেনার ওয়াদা। তবে ওয়াদাটি এমন যা পালন করা আবশ্যক। এই ওয়াদাকে আবশ্যক করা না হলে একদিকে আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যই সম্ভব হবে না এবং এজন্য কোন এলসি খোলাও সম্ভব হবে না। অন্যদিকে যদি ক্রেতার জন্য ক্রয় করাটা আবশ্যক না হয় এবং ভিনদেশের ব্যবসায়ী ওয়াদা অনুযায়ী মাল প্রস্তুত কিংবা খরিদ করে জাহাজে পাঠিয়ে দেয়, ঠিক সেসময় যদি ক্রেতা ওয়াদা থেকে সরে আসে তাহলে ঐ ব্যবসায়ীর কী পরিমাণ ক্ষতি হবে তা চিন্তা করে দেখুন! তাই এখানেও যদি ওয়াদাকে আইনত আবশ্যকীয় করা না হয় তাহলে আন্তর্জাতিক সকল ব্যবসা-বাণিজ্য নাজায়েয হয়ে যাবে। সুতরাং, বর্তমান সময়ের ব্যবসা-বাণিজ্যে উভয় পক্ষ

যেখানে ওয়াদা আইনত আবশ্যকীয় করার ব্যাপারে একমত সেখানে তা আবশ্যকীয় না করে কোন উপায় নেই। এটাকে ইমাম গাযালী রহ. إذا فهم منه الجزم দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন। অতএব, আমাদের সাম্প্রতিক কালের অনেক ফিক্বহবিদ এধরণের লেনদেনে ওয়াদার প্রয়োজনীয়তা بيع بالوفاء এর তুলনায় অনেক বেশী অনুভব করেছেন। যেমন- হযরত মাওলানা ফতেহ মুহাম্মদ লাখনভী রহ. ব্যবসায়িক চুক্তির ওয়াদাকে খুব জোরদারভাবে আবশ্যক বলেছেন। তিনি বলেনঃ "বেচাকেনার পারস্পরিক অঙ্গীকার মানে বিক্রয় করেনি বরং বিক্রয়ের অঙ্গীকার করেছে এবং ক্রয় করেনি বরং ক্রয়ের অঙ্গীকার করেছে। তারা উভয়ে তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষায় বাধ্য। এতে বেচাকেনা সম্পন্ন হয় না। অর্থাৎ, পণ্যের উপস্থিতি ও পরিমাণ জানা আবশ্যক নয়, ইজাব-কবুলও জরুরী নয়; বরং তা ভবিষ্যতের জন্যই থাকবে। এটা শুধু ওয়াদা নয় যে, তারা উভয়ে স্বাধীন থাকবে। এই পারস্পরিক অঙ্গীকারের প্রয়োজনীয়তা এতবেশী বৃদ্ধি পেয়েছে যে, ব্যবসায়িক, ব্যক্তিগত, রাষ্ট্রীয় শৃংখলা, সামাজিক কার্যক্রম সর্বোপরি কোন কাজই এটা ছাড়া সম্পাদিত হতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপঃ কোন মহকুমা, কারখানা কিংবা সৈন্যবাহিনীর জন্য যায়েদের এমন কিছু জিনিসের প্রয়োজন পড়েছে যা সাধারণভাবে কোন কাজে আসে না বলে বাজারে পাওয়া যায় না এবং কোন ফরমায়েশ বা নিশ্চয়তা ছাড়া কেউ তা তৈরী কিংবা জোগাড়ও করে না; যেমন- নেকড়া, হাড় ইত্যাদি। আর অনেক জিনিস এমনও আছে যা ঋতু (তাও আবার কোন কোন জায়গায়) ছাড়া পাওয়া যায় না অথবা পাওয়া গেলেও চড়ামূল্য হয়। সুতরাং, পারস্পরিক অঙ্গীকার করা না গেলে এসব জিনিস সব সময় এবং সব জায়গায় যথেষ্ঠ পরিমাণে পাওয়া যাবে না, এত মূল্যও একসাথে দেয়া যায় না। আর এগুলোর যোগান ও রক্ষনাবেক্ষণও সহজ কাজ নয়। অতএব, এই কঠিন প্রয়োজনগুলো পূরণ হতে পারে এভাবে যে, যায়েদ ও বকরের মধ্যে পারস্পরিক অঙ্গীকার হবে, আমরা এই ধরণ ও গুনাগুণসম্পন্ন মাল এত পরিমাণে এত মূল্যে এত কিস্তিতে অমুক জায়গায় বেচাকেনা করার ব্যপারে অঙ্গীকরাবদ্ধ হলাম। এখানে শর্ত হচ্ছে, সবকিছু সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা। যেমন- অমুক জিনিস, এই এই গুনাগুণ ও ধরণের, এই

পরিমাণ, এত কিস্তি, অমুক সময়, অমুক জায়গা এবং এত দরে বেচাকেনা করব। এসব শর্তাবলী লিখিত হওয়াই বাঞ্চনীয়। যেমন, বাইয়ে সালামের লেনদেনর ক্ষেত্রে লিখিত হওয়া উচিৎ। বেচাকেনা ও অঙ্গীকারের মধ্যে পার্থক্য আছে। ১. বেচাকেনায় পণ্য ক্রেতার মালিকানায় চলে যায়; পণ্যটি ক্রেতার হস্তগত হোক বা না হোক। ২. ক্রেতা যখনই চাইবে তখনই পণ্যটি হস্তগত করা ও তা থেকে ফায়দা হাসিল করার অধিকার রাখে। বিক্রেতা উপস্থিত থাকুক কিংবা অনুপস্থিত, মৃত হোক কিংবা জিবিত, সম্মত হোক কিংবা অসম্মত। ৩. যেসব হক কোন কারণে বিক্রেতার নিজের কিংবা মালের উপর অর্পিত হয় তার সাথে পণ্যের কোন সম্পর্ক নেই। ৪. পণ্য হস্তগত হোক বা না হোক পণ্যের উপর ক্রেতার দায় দায়িত্বের প্রভাব পড়ে। ৫. বিক্রেতাকর্তৃক পণ্য আটকে রাখা বা তা থেকে ফায়েদা হাসিল করার অধিকার নেই। পক্ষান্তরে বেচাকেনার অঙ্গীকারে ক্রেতা পণ্যের মালিক হয় না, তা থেকে ফায়েদা হাসিল করতে পারে না, তা আয়ত্তে নেয়ার অধিকার রাখে না, ক্রেতা ও বিক্রেতার উত্তরাধিকারদের কাছে দাবীও করা যাবে না এবং পণ্য বিক্রেতা নিজের ও মাল সম্পর্কিত দায় দায়িত্ব থেকে মুক্ত নয়। তবে এই অঙ্গীকারের কারণে বিক্রেতাকে ঐসব মাল শর্ত ও সময়মত হাজির করতে বাধ্য করা যাবে। এতে তার কোন ক্ষতি ও অপারগতার প্রতি লক্ষ্য করা হবে না। অনুরূপভাবে ঐ মালের প্রয়োজন থাকুক বা না থাকুক ক্রেতাকে তা গ্রহণ ও মূল্য পরিশোধে বাধ্য করা যাবে। অঙ্গীকারের কারণে পূর্বের সম্মতিকে বর্তমান সম্মতি হিসেবে মনে করা হবে। সুতরাং, পার্থক্য স্পষ্ট হয় সংঘটিত ও সংঘটিতব্যের মধ্যে।" –(আতরে হেদায়া পৃ: ১১০)।

অনুরূপভাবে হযরত মাওলানা মুফতী সাঈদ আহমদ লাখনভী রহ.ও ব্যবসায়িক অঙ্গীকার আবশ্যকীয় হওয়ার ফতোয়া দিয়েছেন। তাঁর কাছে প্রশ্ন করা হয়েছিল:

"উলামায়ে দ্বীন ও শরীয়তে মুফতীগণ এই মাসআলার ব্যাপারে কী বলেন?

এক. যায়েদ এবং সুগার মিলের (চিনি কল) মধ্যে পারস্পরিক অঙ্গীকার হয়েছে যে, আগামী ১৫ জানুয়ারী ১৯৪০ ইং তারিখে যায়েদ মিল থেকে মনপ্রতি বারো টাকা দরে একহাজার মণ চিনি ক্রয় করবে এবং মিল

যায়েদের কাছে তা বিক্রয় করবে। অগ্রিম হিসেবে যায়েদ কিছু টাকাও মিলকে পরিশোধ করে। এই অঙ্গীকার কি শরীয়ত সম্মত?

দুই. সুগার মিলের সাথে অঙ্গীকারকারী যায়েদ বকরের সাথে পারস্পরিক এই অঙ্গীকার করে যে, আগামী ১৬ জানুয়ারী ১৯৪০ ইং তারিখে যায়েদ সুগার মিল থেকে ঐ সমপরিমাণ চিনি মনপ্রতি বারো টাকা দুই আনা দরে বকরের কাছে বিক্রয় করবে এবং বকর তা ক্রয় করবে। এই অঙ্গীকার জায়েয হবে কি?

প্রশ্নকারী: মুনির আহমদ, বোম্বে।"

এর উত্তরে হযরত মুফতী সাহেব রহ. লেখেন:

উত্তর: "এই দুই পারস্পরিক অঙ্গীকার শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয। উভয়পক্ষের জন্য তা পালন করা (সততা ও আইনগতভাবে) ওয়াজিব। এমনকি নির্ধারিত সময় আসলে জোরপূর্বক কিংবা শুধু আদান প্রদানের মাধ্যমে বেচাকেনা করা হলে তা বৈধ হবে। কোন অপারগতা বা(কথা ও কাজের) অপারগতা ছাড়াই কোনভাবে যদি বেচাকেনা না হয় তাহলে ক্রেতা (অঙ্গীকার দৃঢ় করার জন্য) অগ্রিম যে টাকা দিয়েছেন তা ফেরত দেয়া ওয়াজিব। উলামায়ে কেরামের মতে "مجرد النية لاينعقد البيع" বেচাকেনা সম্পাদিত হওয়ার চার পদ্ধতি তথা কথা, লেখা, ইঙ্গিত ও কাজ ছাড়া শুধু নিয়তের মাধ্যমে বেচাকেনা সংঘটিত হয় না। এই (প্রশ্নে উল্লেখিত) দুই ক্ষেত্রে উক্ত চার পদ্ধতির কোনটিই পাওয়া যায়নি। তাই এই পারস্পরিক অঙ্গীকার যদিও বেচাকেনার নিয়তেই করা হয়েছে তবুও তার মাধ্যমে বেচাকেনা সংঘটিত হবে না। কিন্তু আগামী ১৫ ও ১৬ জানুয়ারী একজন অন্যজনের ক্রয়ের শর্তে বিক্রয়কে এবং আরেকজন অন্যজনের বিক্রয়ের শর্তে ক্রয়কে নিজের জন্য আবশ্যকীয় করে নেয়ায় তা শুধু সততার ভিত্তিতে অবশ্যপালনীয় ওয়াদাই নয় বরং দৃশ্যত পারস্পরিক দৃঢ় অঙ্গীকার ও শর্তযুক্ত হয়ে গেছে যা পালন করা উভয় পক্ষের উপর সততা ও আইনগত উভয়ভাবেই ওয়াজিব। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: "إن العهد كان مسئولا"। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:"المسلمون عند شرطه"। ক্বাজী শুরাইহ থেকে বুখারী

শরীফে বর্ণিত আছে:"من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليــــه"। ফতোয়া বায্‌যাযীয়া'র কিতাবুল কাফালা'য় আছে: "إن المواعيد باكتســـاء صورالتعليق تكون لازمة"। ফতোয়া শামীতে আছে: " المواعيد قد تكـــون لازمة لحاجة الناس"। অনুরূপভাবে হামওয়ী, তাতারখানীয়া, বাহরুরায়েক্ব ও যহীরীয়া ইত্যাদিতেও এধরণের উদ্ধৃতি রয়েছে। আশবাহতে আছে: "لايلزم الوعد إلا إذا كان معلقا"। জামেউস সগীরে হযরত ইমাম মুহাম্মদ রহ. হযরত ইমাম আবু হানিফা রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন, ঋণদাতা ঋণগ্রহীতাকে অর্ধেক ঋণ আদায় করার শর্তে বাকী অর্ধেক ক্ষমা করে দিলে সে তা আদায় করা থেকে দায়মুক্ত হয়। এসব উদ্ধৃতি পারস্পরিক অঙ্গীকার ও সংযুক্ত শর্ত আবশ্যকীয় হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেয়। অতএব, প্রশ্নে উল্লেখিত উভয় ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময় আসার পর কথায় বা কাজে বেচাকেনা সম্পন্ন করে মাল ও মূল্য লেনদেন করা সততা ও আইনগত উভয় ভিত্তিতেই ওয়াজিব। নির্ধারিত সময় এসে গেলে:

প্রথমতঃ ঐ অঙ্গীকারনামায় মাল বুঝিয়ে দেয়ার স্থান এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ থাকতে হবে। কোন বিবাদ সৃষ্টিকারী অজ্ঞতা থাকবে না।

দ্বিতীয়তঃ পুরো (ক্রয়কৃত) চিনির উপর যতক্ষণ না যায়েদের নিয়ন্ত্রন (যা আমার মরহুম আব্বাজানের গবেষণা অনুযায়ী মালের রসিদ উসুল হয়ে গেলেই হয়ে যায়) প্রতিষ্ঠিত হবে ততক্ষণ সে তা বকরের কাছে বিক্রয় করতে পারবে না। তাই পুরো চিনি বাস্তবে যায়েদের কব্জায় আসার পর বা রসিদ পেয়ে যাবার পর বকরের কাছে বিক্রয় করবে। এর আগে করা যাবে না। কেননা, কব্জায় নেয়ার আগে অস্থাবর জিনিসের বেচাকেনা জায়েয নেই।

তৃতীয়তঃ নির্ধারিত সময় আসার পর বেচাকেনা করা উভয় পক্ষের উপর ওয়াজিব। এমনকি একপক্ষ অন্যপক্ষকে বেচাকেনায় জোর করে বাধ্য করাও জায়েয। কিন্তু যদি বেচাকেনা না হয় তাহলে ক্রেতার (অঙ্গীকারনামা মজবুত করার জন্য প্রদত্ত) অগ্রিম টাকা ফেরত দেয়া বিক্রেতার উপর ওয়াজিব।

প্রশ্নঃ নির্ধারিত সময় আসার পর বেচাকেনার জন্য মৌখিকভাবে ইজাব-কবুল কি জরুরী? নাকি কোন কিছু বলা ছাড়া মূল্য পরিশোধ করে মাল নিয়ে নিলে বেচাকেনা হয়ে যাবে?

উত্তরঃ মৌখিক ইজাব-কবুল ছাড়াই আদান প্রদানের ভিত্তিতে শুধু মূল্য দিয়ে মাল নিয়ে নিলে বেচাকেনা হয়ে যাবে।

প্রশ্নঃ যেখানে জবরদস্তিমূলক বেচাকেনা শুদ্ধ নয়; বরং ফাসেদ ও জবরদস্তিকৃত ব্যক্তির অনুমতির উপর মওকুফ থাকে সেখানে অঙ্গীকার মূলে জোর করলে বেচাকেনা কিভাবে শুদ্ধ হবে?

উত্তরঃ এখানে বাস্তবে জবরদস্তি হলেও হুকুমের ক্ষেত্রে তা নয়। কেননা পূর্বের সন্তুষ্টিকেই বর্তমানের সন্তুষ্টি মনে করা হবে। মোট কথা, বেচাকেনা সঠিক হবার জন্য শর্তাবলীর মধ্যে এই দুই শর্তও আছে; এক. বর্তমান সন্তুষ্টি পাওয়া যেতে হবে, দুই. সন্তুষ্টিসূচক বাক্য স্বাভাবিকভাবেই আসবে বা সন্তুষ্টিমূলক কোন কাজ পাওয়া যাবে। পূর্বের অঙ্গীকার অনুযায়ী জোরপূর্বক আদান প্রদানের ক্ষেত্রেও এই দুই শর্ত বিদ্যমান বলে বেচাকেনা সঠিক হয়ে যাবে। সুতরাং, নির্ধারিত সময় আসলে সন্তুষ্টির ভিত্তিতে হোক কিংবা জোর পূর্বক হোক মূল্য দিয়ে মাল নিয়ে ফেললে বেচাকেনা শুদ্ধ হয়ে যাবে। মৌখিক ইজাব-কবুলের মাধ্যমেতো অবশ্যই হবে। ॥ আল্লাহই ভাল জানেন ॥

উত্তর দাতা: সাঈদ আহমদ লাখনভী" –(আতরে হেদায়া পৃ: ২৪৩-২৪৫)

উল্লেখ্য, হযরত মাওলানা ফতেহ মুহাম্মদ লাখনভী রহ. হযরত মাওলানা আব্দুল হাই লাখনভী রহ. এর শিষ্য। হযরত মাওলানা মুফতী সাঈদ আহমদ লাখনভী রহ. তাঁর সুযোগ্য সন্তান এবং আমাদের বুযুর্গদের দৃষ্টিতে একজন নির্ভরযোগ্য মুফতী। হযরত থানভী রহ. তাঁর এক খলীফাকে কিছু মাসআলায় তার সাথে আলোচনা করতে বলেছেন। এ ঘটনা থেকেই তার অবস্থান সম্পর্কে আন্দাজ করা যায়। –(আতরে হেদায়া পৃ:২২৯)

অনুরূপভাবে আমার আব্বাজান হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ. তাফসীরে মাআরিফুল কুরআনে "وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا" আয়াতের ব্যাখ্যায় যা বলেছেন তা থেকেও বুঝা যায় যে, উভয়

পক্ষের দৃঢ়তার ভিত্তিতে সম্পাদিত অঙ্গীকার আইনগতভাবে অবশ্যপালনীয়। তিনি বলেন: "প্রথম প্রকারের সকল পারস্পরিক অঙ্গীকার পূরণ করা সকল মানুষের উপর ওয়াজিব। দ্বিতীয় প্রকারে যেসব অঙ্গীকার শরীয়তবিরোধী হবে না তা পূরণ করা ওয়াজিব আর যেগুলো শরীয়ত বিরোধী হয় তা দ্বিতীয় পক্ষকে জানিয়ে শেষ করে দেয়া ওয়াজিব। কোন পক্ষ পূরণ না করলে আদালতের আশ্রয় নিয়ে তা পূরণ করতে বাধ্য করার অধিকার অন্য পক্ষের আছে। পারস্পরিক অঙ্গীকার হচ্ছে: দুই পক্ষ কোন কাজ করা না করার ব্যাপারে অঙ্গীকার করা। কোন ব্যক্তি একতরফা ওয়াদা করলে যেমন, আমি আপনাকে অমুক জিনিস দেব, অমুক সময় আপনার সাথে দেখা করব, আপনার অমুক কাজটি করে দেব ইত্যাদি পূরণ করা ওয়াজিব। অনেকেই অঙ্গীকার বলতে এটাকেই বুঝিয়েছেন। তবে পার্থক্য হচ্ছে, দ্বিপাক্ষিক অঙ্গীকারে কেউ বরখেলাফ করলে অন্য পক্ষ আদালতের মাধ্যমে তা পূরণে বাধ্য করতে পারবে; কিন্তু একতরফা ওয়াদা আদালতের মাধ্যমে জোরপূর্বক পূরণ করা যায় না। হ্যাঁ! কেউ কারো সাথে ওয়াদা করার পর কোন শরয়ী অপারগতা ছাড়াই বরখেলাফ করলে গুনাহগার হবে। হাদীসে তাকে প্রকৃত মুনাফিকী বলে অভিহিত করা হয়েছে।" –(তাফসীরে মাআরিফুল কোরআন খন্ড:৫ পৃ:৪৮০)।

উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হয় যে,

১. ওয়াদা পূরণ করা সর্বাবস্থায় সততা বা দ্বীনদারীর ভিত্তিতে ওয়াজিব; আইনগতভাবে নয়। কোন ব্যক্তি অপারগতা ছাড়া ওয়াদার বরখেলাফ করলে গুনাহগার হবে। ওয়াদা করার সময়ই মনে মনে পূরণ করার নিয়ত না থাকলে হাদীসে তাকে মুনাফিকী বলা হয়েছে।

২. দ্বিপাক্ষিক ওয়াদা যাকে مواعدة বলা হয় তাকে অনেক ফিক্বহবিদ ওয়াদা থেকে আলাদা করে আবশ্যকীয় বলে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ, তাদের মতে একপাক্ষিক ওয়াদা আইনগতভাবে আবশ্যক নয়; কিন্তু দ্বিপাক্ষিক ওয়াদা আবশ্যক।

৩. কোন কোন লেনদেনে প্রয়োজনের কারণে একপাক্ষিক ওয়াদাও আইনগতভাবে আবশ্যক করা যেতে পারে।

৪. শরীয়তবিরোধী কোন কাজের ওয়াদা করলে তা বাস্তবায়ন করা জায়েয নয়। যেমন, অংশীদারী কারবারে একজন অন্যজনের সাথে ওয়াদা করে যে, কারবারে কোন লোকসান হলে আমি তোমাকে তা পুষিয়ে দিব। এই ওয়াদার মাধ্যমে যেহেতু সকল লোকসানের ভার একজনের দায়িত্বে দেয়া হয় তাই তা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয নয়। সুতরাং, ওয়াদাটিও জায়েয নয়।

৫. ব্যবসায়িক লেনদেনে ওয়াদা আইনগতভাবে আবশ্যকীয় হওয়ার একটি পদ্ধতি হল, তা আইনগতভাবে আবশ্যকীয় হওয়ার ব্যাপারে উভয় পক্ষ ওয়াদার সময় একমত হওয়া।

প্রশ্ন হল, কোন ওয়াদা আইনগতভাবে আবশ্যকীয় হওয়ার উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য তো এটা স্পষ্ট যে, ওয়াদাকারীকে আদালত তার ওয়াদা পূরণে বাধ্য করবে। তবে 'মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী'তে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে যে, বর্তমান সময়ে আদালতের কার্যক্রমে দীর্ঘসময় ও প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। এমনকি অনেক সময় ন্যায়বিচার পাওয়াও অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই ওয়াদা আইনগতভাবে আবশ্যকীয় করার লক্ষ্যে ওয়াদা পূরণ না করার কারণে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির যথাযথ ক্ষতিপূরণ দিতে ওয়াদাকারীকে বাধ্য করা হবে। 'মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী'র আলোচনায় এ বিষয়ে একটি হাদীস দলিল হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

لاضررولاضرار-(موطأ امام مالك، مع أوجز المســـالك ج:١٢ ص:٢٢٤ كتاب الأقضية، باب القضاء بالمرفق)

অর্থাৎ "কোন ব্যক্তি কারো ক্ষতি করবে না এবং দু' ব্যক্তি পরস্পরের ক্ষতি করবে না"। এই হাদীসের কারণে ফিক্বহবিদগণ অনেক মাসআলায় আর্থিকভাবে ক্ষতিকারক ব্যক্তির উপর ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদান ওয়াজিব করে দিয়েছেন। তাছাড়া কেউ যদি ক্রয়ের অর্ডার দেয়ার সময় সুস্পষ্ট ওয়াদা করে যে, আমার অর্ডারে মাল আনার পর আমি মাল না নেয়ায় ব্যবসায়ী সে মাল বাজারে বিক্রয় করে তার বিনিয়োগ উসুল করতে না পারলে তা পূরণে যত টাকা লাগবে তা আমি

প্রদান করব– তাহলে বিষয়টি জায়েয। এ ব্যাপারে 'মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী'তে দলিল হিসেবে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি আলোচিত হয়:

"قال في أخر الرسم الأول من سماع أصبغ من جامع البيوع : قال أصبغ : سمعت أشهب، وسئل عن رجل اشترى من رجل كرما فخاف الوضيعة فأتى ليستوضعه، فقال له : بع وأنا أرضيك. قال: إن باع برأس ماله أو بربح فلا شيئ عليه، وإن باع بالوضيعة كان عليه أن يرضيه، فإن زعم أنه أراد شيئا سمّاه فهو ما أراد، وإن لم يكن أراد شيئا، أرضاه بما شاء وحلف بالله ما اراد أكثر من ذلك. وإن لم يكن اراد شيئا يوم قال ذلك، قال أصبغ: وسألت عنها ابن وهب فقال: عليه رضاه بما يشبه ثمن تلك السلعة والوضيعة فيها ــ قال أصبغ: وقول ابن وهب هو أحسن عندي، وهو أحب إلي إذا وضع فيها، قال محمد بن رشد: قوله بعه وأنا أرضيك عِدَة، إلا أنها عدة على سبب، وهوالبيع، والعدة إذا كانت على سبب لزمت بحصول السبب في المشهورمن الأقوال. وقد قيل: إنها لا تلزم بحال، وقيل: إنها تلزم على كل حال، وقيل: إنها تلزم إذا كانت على سبب، وان لم يحصل السبب، وقول أشهب: إن زعم أنه اراد شيئا سماه فهو ما أراد يريد مع يمينه، ومعناه إذا لم يسم شيئا يسيرا لايشبه أن يكون أرضاه ــ" الخ (فتح العلي المالك ج:١ ص:٢٥٥)

উপরোক্ত উদ্ধৃতির ভিত্তিতে 'মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী' সিদ্ধান্ত প্রদান করে যে, কোন ব্যক্তির ওয়াদার ভিত্তিতে কেউ যদি কষ্ট স্বীকার করে কোন কাজ করেফেলে সেই ওয়াদা আবশ্যকীয় হয়ে যায়। (যেমন, কোন ব্যক্তি কোন ব্যবসায়ীকে কোন মালের অর্ডার দিয়ে ওয়াদা করল যে, আপনি মাল আনলে বা তৈরী করলে আমি তা নিব, এর ভিত্তিতে ব্যবসায়ীটি মাল আনল) অতঃপর যদি কোন কারণ ছাড়াই সে তার ওয়াদা

থেকে ফিরে আসে, তাহলে তার উপর ঐ ওয়াদা পূরণ করা কিংবা ব্যবসায়ীটি যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে (যেমন, মালগুলো বাজারে বিক্রি করে মূল পুঁজিও উসুল করতে পারেনি, তখন মূল পুঁজি থেকে যত টাকা কম থাকে তা দিয়ে) তার যথাযথ ক্ষতি পূরণ দিতে হবে। 'মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী'র রেজুলেশনটি নিম্নরূপ ছিল:

" الوعد يكون ملزما للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاءً إذا كـــان معلقا على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد ويتحدد إثرالإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد وإما بالتعويض عن الضررالواقع فعلا بســـبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر" (قرار رقم ٢،٣ مجلة مجمع الفقه الإســـلامي العدد الخامس ٢:١٠٩٩)

"আল মাজলিসু শরয়ী" নামক সংস্থাও একই অবস্থান গ্রহণ করেছে। আর এটিই হচ্ছে ন্যায়সঙ্গত।

হীলা বা কৌশলের শরয়ী অবস্থান

সুদবিহীন ব্যাংকিংয়ের উপর যেসব লেখা আমার সামনে এসেছে তার কয়েকটিতে এই বিষয়টি খুব জোরেশোরে উত্থাপন করা হয়েছে যে, ব্যাংকিংয়ের বর্তমান কর্মপদ্ধতিতে কৌশলের মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করা হয়। অথচ সুদবিহীন ব্যাংকিংয়ের সকল পদ্ধতি কৌশলের সংজ্ঞায় পড়ে না। যেমন, মুরাবাহা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সুদবিহীন ব্যাংকের অনেক লেনদেন এমন আছে যেগুলোকে কোনভাবেই কৌশল বলা যায় না। তবে সুদ থেকে বাঁচার জন্য কিছু বৈধ কৌশল এখানে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সুতরাং, কৌশলের শরয়ী অবস্থান সম্পর্কে অল্প বিস্তর আলোচনা জরুরী বলে মনে করছি।

সাধারণভাবে একটি ধারণা আছে যে, সকল কৌশল শরীয়তে নাজায়েয। কথাটি ফিক্বহ সম্পর্কে অজ্ঞ কেউ বললে অসুবিধা নেই। তবে কোন আলেম বা মুফতি যদি এ ধরণের কথা বলেন তাহলে তা খুবই আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার। উলামায়ে কেরামের সুস্পষ্ট মত হল, সকল কৌশল অবৈধ নয়; কিছু কৌশল বৈধ বরং কল্যাণকরও বটে যেসকল কৌশল হারাম থেকে বাঁচা কিংবা কোন সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য অবলম্বন করা হয় সেগুলোকে হানাফী ফিক্বহবিদগণ সুস্পষ্টভাবে জায়েয ঘোষণা করেছেন। হানাফী ফিক্বহ গ্রন্থসমূহে এ ধরণের বহু কৌশল বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া আমাদের অধিকাংশ দ্বীনি মাদরাসা 'তামলীক' এর জায়েয কৌশলের ভিত্তিতেই পরিচালিত হচ্ছে। কোন প্রতিষ্ঠান 'তামলীক'-এর শর্ত পূরণ না করলে তাকে অবশ্যই সমালোচিত হতে হয়। কিন্তু এ কারণে সকল মাদরাসা যাকাতের নাজায়েয ব্যবহারের কারণে হারামে লিপ্ত বলাটা নিশ্চয় চরম ভুল হবে।

বাস্তবতা হল, কুরআন ও হাদীসে জায়েয এবং নাজায়েয উভয় ধরণের কৌশলের উল্লেখ আছে। একদিকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়াহুদীদের অভিশাপ দিয়েছেন এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের উপর চর্বি হারাম করেছিলেন কিন্তু তারা তা গলিয়ে বিক্রয় করতে শুরু করল।

"لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها"

(صحيح البخاري، باب لايذاب شحم الميتة، حديث: ٢٠٧١)

এই হীলা বা কৌশলকে অভিশাপের কারণ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে কুরআনে কারীমে আসহাবুস্ সাবতের উপর আযাবের কথা আলোচিত হয়েছে। শনিবার দিন মাছ ধরাকে তাদের জন্য হারাম করা হয়েছিল। কুরআনে কারীমে শুধু এটুকুই আলোচিত হয়েছে যে, শনিবার দিন তাদের পরীক্ষার জন্য অনেক মাছ আসত, অন্য দিন আসত না, তাই তারা শনিবার দিন সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করল। এই বাড়াবাড়ি সম্পর্কে বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে বলা হয়েছে, তারা শনিবার জাল বিছিয়ে মাছ আটকিয়ে ফেলত, কিন্তু ধরত না। শনিবার শেষ হলে তারা এগুলোকে ধরে নিত। কোন কোন মুফাসসির বলেছেন, তারা হারামকে হালাল করার জন্য এই কৌশল অবলম্বন করেছিল, একারণেই তাদের উপর আযাব এসেছে। কোন কোন মুফাসসির বলেছেন, তারা এই কৌশল দিয়েই আরম্ভ করেছিল, তবে পরে শনিবারেই তারা মৎস শিকার শুরু করে, একারণেই আযাব আসে। কোন কোন মুফাসসির যেমন, ইমাম আবু বকর জাস্সাস বলেছেন, কৌশলের কারণে আযাব আসেনি; বরং তাদের জন্য শনিবার দিন মাছ আটকানো মাছ ধরার মতই হারাম ছিল, তাই আযাব এসেছে।-(আহকামু কোরআন লিল জাসসাস খন্ড:৩ পৃ:১৭৬)

অন্যদিকে কুরআনে কারীমেই আছে যে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম আপন ভাইকে নিজের কাছে রেখে দেয়ার জন্য নিজের পাত্র তার মালের মধ্যে রেখে দিয়ে কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। এই কৌশলকে আল্লাহ নিজের প্রতি সম্বোধন করে বলেছেন: -"كذلك كدنا ليوسف" (سورة يوسف: ٧٦) অর্থাৎ, আমি ইউসুফের জন্য এভাবে কৌশল অবলম্বন করেছি।

তাছাড়া হযরত আইয়ূব আলাইহিস্ সালাম আপন স্ত্রীকে একশত চাবুক মারার শপথ করলেন, পরে লজ্জিত হলে আল্লাহ পাক তাঁকে কৌশল বাতলে দিয়ে বলেন,

"خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولاتحنث"-(سورة ص : ٤٤)

অর্থাৎ, তুমি তোমার হাতে একমুঠো তৃণশলা নাও, তাদ্বারা আঘাত কর এবং শপথ ভঙ্গ কর না।

এখানে একদিকে হযরত আইয়ূব আলাইহিস্ সালামের সম্মানিতা স্ত্রীকে অন্যায় কষ্ট থেকে বাঁচানোর ও অন্যদিকে হযরত আইয়ূব আলাইহিস্ সালামকে শপথ ভঙ্গ করার পাপ থেকে বাঁচার একটি কৌশল ছিল, যা আল্লাহ পাক নিজেই শিখিয়ে দিয়েছেন। এ কৌশল কি হযরত আইয়ূব আলাইহিস্ সালামের জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট নাকি এটা দ্বারা অন্য মানুষেরাও উপকৃত হতে পারবে– এ ব্যাপারে ফিক্বহবিদগণের মধ্যে ব্যাপক আলোচনা হয়েছে। হযরত ইমাম মালেক রহ.-এর মত হল, এটা হযরত আইয়ুব আলাইহিস্ সালামের জন্য নির্ধারিত, অন্য কারো জন্য এটা প্রযোজ্য নয়। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা রহ, ইমাম শাফেয়ী রহ, ও ইমাম যুফার রহ. বলেছেন, এটি একটি সাধারণ হুকুম; কেউ এধরণের ঘটনার সম্মুখীন হলে সেও এর উপর আমল করতে পারবে। আল্লামা আলূসী রহ. রূহুল মাআনীতে লেখেন

"وأخرج إبن عساكرعن إبن عباس: لايجوز ذلك لأحد بعد أيوب إلا الأنبياء عليهم السلام، وفي أحكام القرآن العظيم للجلال السيوطي عن مجاهد قال: كانت هذه لأيوب خاصة. وقال الكيا: ذهب الشافعي وأبوحنيفة وزفرإلى أن من فعل ذلك فقد برّ في يمينه وخالف مالك ورآه خاصابأيوب عليه السلام. وقال بعضهم: إن الحكم كان عاما ثم نسخ، والصحيح بقاءالحكم ـ" (تفسيرروح المعاني ج:٢٣ ص:٢٠٩ رشيدية لاهور)

যারা এই কৌশলকে সকল মানুষের জন্য জায়েয বলেছেন তারা হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি কাজকে দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেন, যা আবুদাউদ ইত্যাদিতে বর্ণিত হয়েছে। হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়কালে কঙ্কালসার একলোক ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল, শরীয়তের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাকে একশত বেত্রাঘাত করা জরুরী ছিল, কিন্তু তার শরীরের অবস্থা দেখে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একশত শলার একটি বাণ্ডিল দিয়ে একবার আঘাত করার নির্দেশ দিলেন। আল্লামা কুরতুবী রহ. লেখেন:

"الحديث الذي احتج به الشافعي أخرجه أبوداؤد في سننه قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن أبــن شهاب قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصارأنه اشتكى رجل منهم حتى أضــنى فعاد جلدة على عظم فدخلت عليه جارية لبعضهم فهشّ لها فوقع عليهـــا، فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك، وقال : اســتفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإني قد وقعت على جارية دخلت علــيّ ــ فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: مارأينا بأحد من الناس من الضرمثل الذي هوبه؛ لو حملناه إليك لتفسخت عظامه ماهو إلا جلد على عظم؛ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له مائـــة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدةــ قال الشافعي: إذا حلف ليضربن فلانا مائة جلدة أو ضربا و لم يقل ضربا شديدا، و لم ينو ذلك بقلبه يكفيه مثـــل هذا الضرب المذكورفي الآية ولايحنث ــ قال ابن المنـــذر: وإذا حلـــف الرجل ليضربن عبده مائة فضربه ضربا خفيفا فهو بارّ عند الشـــافعي وأبي ثوروأصحاب الرأي ــ وقال مالك: ليس الضرب إلا الضرب الذي يؤ لم."

(تفسير القرطبي ج:١٥ ص:١٨٨ دارالكتاب العربي)

হযরত আইয়ূব আলাইহিস্ সালামের এই ঘটনার পর্যালোচনা করতে গিয়ে আল্লামা আলূসী রহ. বলেন:

"وكثير من الناس استدل بها على جواز الحيل وجعلها أصلا لصـــحته، وعندي أن كل حيلة أوجبت إبطال حكمة شرعية لاتقبل كحيلة ســقوط الزكاة وحيلة سقوط الإستبراء وهذا كالتوسط في المسئلة فإن من العلمـــاء

من يجوز الحيلة مطلقا، ومنهم من لا يجوزها مطلقا وقد أطال الكـــلام في ذلك العلامة ابن تيمية." (تفسيرروح المعاني ج:٢٣ ص:٢٠٩ رشيدية لاهور)

"এই ঘটনাকে অনেকে কৌশলের বৈধতার পক্ষে দলিল হিসেবে ব্যবহার করেছেন এবং কৌশলের মূল ভিত্তি হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। আমার মত হল, যেসব কৌশলে শরয়ী কোন হেকমত বাতিল হয়ে যায় তা গ্রহণযোগ্য নয়, যেমন- যাকাত ফাঁকি দেয়ার কৌশল এবং ইস্তেবরা' না করার কৌশল। আর এ মাসআলাতে এটিই হল মধ্যবর্তী মত। কেননা, অনেক উলামায়ে কেরাম আছেন যারা সাধারণভাবে কৌশলকে জায়েয বলেন আবার অনেকে নাজায়েয বলেন। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।"

এছাড়াও বুখারী শরীফে হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাজি. ও হযরত আবু হুরায়রা রাজি.-এর একটি বর্ণনা আছে যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে (অন্য বর্ণনায় যার নাম সাওয়াদ ইবনে গযিয়্যাহ বলা হয়েছে) খায়বারে তহসিলদার হিসেবে প্রেরণ করেন। তিনি একটি বিশেষ প্রকারের খেজুর 'জুনাইব' নিয়ে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলেন। হুযুর জিজ্ঞাসা করলেন, খায়বারের সব খেজুরই কি এরকম? তিনি উত্তরে বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! এরকম নয়! আমরা সাধারণ খেজুর দুই সা' পরিমাণ দিয়ে এই বিশেষ খেজুর এক সা' পরিমান গ্রহণ করি, অথবা সাধারণ তিন সা' খেজুরের বিনিময়ে দুই সা' এই বিশেষ খেজুর ক্রয় করি। হুযুর বললেন, "তোমরা এরকম কর না (কেননা এটা সুদ)। তবে সাধারণ খেজুরগুলো দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় কর, সেই দিরহাম দিয়ে পূনরায় বিশেষ খেজুর 'জুনাইব' কিনে নাও।"

(صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب إذا اراد تمرا بتمرخير منـــه، حـــديث : ٢٠٨٩)

এই ঘটনায় সুদ থেকে বাঁচার জন্য হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে পদ্ধতি বলে দিয়েছেন তাকে কৌশলের বৈধতার পক্ষে দলিল হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

কুরআন ও হাদীসের এসব উদ্ধৃতিসমূহের আলোকে ফিক্বহবিদগণ এই মাসআলার উপর কোন্ কৌশল জায়েয আর কোনটি নাজায়েয তার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

ইমাম আবুবকর খাস্সাফ রহ. যিনি তৃতীয় শতাব্দীর একজন প্রসিদ্ধ হানাফী মাযহাবের ফক্বীহ এবং ইমাম বুখারী রহ.-এর সমসাময়িককালের ছিলেন, তাঁর সম্পর্কে শামসুল আইম্মাহ হুলওয়ানী রহ. বলেন,

الخصاف رجل كبير في العلم، وهو ممن يصح الإقتداء به — (الجواهر المضية للقرشي ج:١١ ص: ٢٣٢)

অর্থাৎ, "খাসসাফ একজন বড়মাপের আলেম এবং তিনি একজন অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব।"

তিনি এবিষয়ে كتاب الحيل নামে একটি পৃথক কিতাব রচনা করেছেন। সেখানে তিনি ইমাম শা'বী রহ.-এর নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি উল্লেখ করেছেন:

"لابأس بالحيل فيما يحل ويجوز، وإنما الحيل شيئ يتخلص به الرجل من المآثم والحرام، ويخرج به إلى الحلال، فما كان من هذا أونحوه فلا بأس، وإنما يكره من ذلك أن يحتال الرجل في حق الرجل حتى يبطله أو يحتال في باطل حتى يموهه ويحتال في شيئ حتى يدخل فيه شبهة . فأما ما كان على هذا القبيل الذي قلنا فلا بأس بذلك. وهذا كتاب فيه أشياء مما يحتاج الناس اليها في معاملاتهم وأمورهم

(كتاب الحيل للخصاف رحمه الله تعالى ص:٤)

"হীলা বা কৌশল এমন, যা দ্বারা মানুষ গুনাহ ও হারাম থেকে বেঁচে হালালের দিকে আসতে পারে। সুতরাং, যেসব কৌশল এমন হবে তাতে কোন অসুবিধা নেই। আর সেসব কৌশলই মাকরূহ (অবৈধ), যা দ্বারা কোন মানুষের হক বাতিল করা হয়, কোন বাতিল জিনিসের উপর ছদ্মাবরণ দেয়া হয় অথবা, কোন জিনিসে সন্দেহ সৃষ্টি করা হয়। তবে কৌশল যদি সে রকম যেমনটি আমরা উল্লেখ করেছি, তাহলে কোন অসুবিধা নেই

এই কিতাবে এমনসব বিষয় আলোচিত হয়েছে যা কাজকর্ম এবং মুআমালা'য় প্রয়োজন হয়।"

এরপর ইমাম খাসসাফ রহ. ফিক্বহের বিভিন্ন অধ্যায় সম্পর্কিত মাসআলা উল্লেখ করে কোন্ কৌশল জায়েয আর কোনটি জায়েয নয় তা বলেছেন। এতে সুদ থেকে বাঁচার বিভিন্ন কৌশলের বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

অনুরূপভাবে ইমাম বুরহানুদ্দীন ইবনে মাযাহ রহ. তাঁর সুপ্রসিদ্ধ কিতাব 'আল মুহীত্ব'-এ কিতাবুল হিয়াল নামে ২৯৪ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি পৃথক অধ্যায় রচনা করেছেন। এর শুরুতে তিনি বলেন:

"مذهب علمائنا أن كل حيلة يحتال بها الرجل لإبطال حق الغير، أو لإدخال شبهة فيه، أو لتمويه باطل، فهي مكروهة، وكل حيلة يحتال بها الرجل ليتخلص بها عن الحرام، أو ليتوصل بها إلى الحلال، فهي حسنة، وهي معنى ما نقل عن الشعبي رحمه الله: لا بأس بالحيل فيما يحل ويجوز، والأصل في جواز هذا النوع من الحيل قول الله تعالى 'وخذبيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث' هذا تعليم المخرج لأيوب صلوات الله على نبينا وعليه عن يمينه التي حلف ليضربن إمرأته مائة عود، وقد تعلق محمد رحمه الله بهذه الآية في مسائل الحيل، والخصاف لم يتعلق بها في حيلة ـــ

قال مشائخنا رحمهم الله : إنما لم يتعلق بها الخصاف لأن حكمها منسوخ ، وعامة المشائخ رحمهم الله على أن حكمها ليس بمنسوخ، وهو الصحيح من المذهب (المحيط البرهاني ج:٢١ ص: ٦٧ ط: إدارة القرآن)

"আমাদের (হানাফী) উলামাদের মাযহাব হল, যেসব কৌশল দ্বারা অন্যের হক বাতিল করা হয় বা অন্যের হককে সন্দেহজনক করে দেয়া হয় বা কোন বাতিল বিষয়ের উপর ছদ্মাবরণ দেয়া হয় সেগুলো মাকরূহ (বা অবৈধ)। আর যেসব কৌশল দ্বারা কোন মানুষ হারাম থেকে বাঁচতে পারে বা হালাল পর্যন্ত পৌছতে পারে সেগুলো ভাল। 'হালাল ও জায়েয কাজে কৌশল অবলম্বনে কোন অসুবিধা নেই'- ইমাম শা'বীর এই উক্তি থেকে

উপরোক্ত কৌশলই উদ্দেশ্য। এধরণের কৌশল জায়েয হবার মূল দলিল হল, আল্লাহ পাকের ইরশাদ 'তুমি তোমার হাতে একমুঠো তৃণশলা নাও, তাদ্বারা আঘাত কর এবং শপথ ভঙ্গ করো না'। এ আয়াতে হযরত আইয়ূব আলাইহিস্ সালামকে শপথ থেকে বেরিয়ে আসার কৌশল শিক্ষা দেয়া হয়েছে, যখন তিনি তাঁর স্ত্রীকে একশত বেত্রাঘাত করার শপথ করেছিলেন। কৌশলের মাসআলাসমূহে ইমাম মুহাম্মদ রহ. এই আয়াত থেকে দলিল পেশ করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম খাস্‌সাফ রহ. তা করেননি। আমাদের মাশায়েখগণ বলেন, ইমাম খাস্‌সাফ রহ. এই আয়াতের মাধ্যমে দলিল দেয়া থেকে বিরত থাকার কারণ হল, তাঁর দৃষ্টিতে এর হুকুম রহিত হয়ে গেছে। তবে অধিকাংশ মাশায়েখদের মত হল, এই আয়াতের হুকুম এখনো রহিত হয়নি।"

এরপর তিনি ইতোপূর্বে বর্ণিত খায়বারের খেজুর সম্পর্কিত হাদীস দ্বারা দলিল উপস্থাপন করে বলেছেন: وهذا تعليم الحيلة وإنه نــص في البـــاب অর্থাৎ, "এটা কৌশলের শিক্ষা এবং হাদীসটি এসম্পর্কিত অকাট্য হুকুম"।

আল্লামা আইনী রহ. আল মুহীত্বের উপরোক্ত উদ্ধৃতি উল্লেখ করে বলেছেন:

وهي الفراروالهروب عن المكروه والإحتيال للهروب عن الحرام والتباعد عن الوقوع في الآثام لابأس به، بل هو مندوب اليه. وأما الإحتيال لإبطال حق المسلم فإثم وعدوان، وقال النسفي في الكافي عن محمدبن الحسن: قال ليس من أخلاق المؤمنين الفرار من أحكام الله بالحيل الموصلة إلى إبطـــال الحق. (عمدة القاري شرح صحيح البخاري ج:٢٤ ص:١٦٤ دار الكتب العلمية)

"কোন মাকরূহ ও হারাম জিনিস থেকে পলায়ন এবং গুনাহে পতিত হওয়া থেকে বাঁচার চেষ্টা করার নামই হল কৌশল বা হীলা। এতে কোন অসুবিধা নেই; বরং তা পছন্দনীয়। তবে কোন মুসলমানের হক নষ্ট করার জন্য কৌশল করা গুনাহ ও জুলুম। ইমাম নাসাফী রহ. কাফী নামক কিতাবে ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর এই উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন, মুমিনের

চরিত্র এমন নয় যে, অন্যের হক বাতিলের জন্য কৌশল অবলম্বন করে আল্লাহর আহকাম থেকে দুরে সরে যাবে।"

হযরত ইমাম আবুবকর জাস্সাস রহ. 'আহকামুল কুরআন' কিতাবের বিভিন্ন জায়গায় কৌশলের বৈধতার উপর আলোচনা করেছেন। সুরায়ে ইউসুফের তাফসীর করতে গিয়ে তিনি কুরআন ও হাদীসের অনেক উদাহরণ পেশ করেছেন যেখানে কোন হারাম থেকে বাঁচার জন্য কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। এরমধ্যে তিনি হযরত আইয়ূব আলাইহিস্ সালাম এবং খায়বারের খেজুরের ঘটনার উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও আরো অনেক উদাহরণ পেশ করে পরিশেষে বলেছেন:

"فهذه وجوه امرالنبي صلى الله عليه وسلم فيها بالإحتيال في التوصل إلى المباح، وقد كان لولا وجه الحيلة فيه محظورا. وقد حرم الله الوطئ بالزنا وأمرنا بالتوصل إليه بعقد النكاح وحظر علينا أكل المال بالباطل، وأباحه بالشرى والهبة ونحوها فمن أنكر التوصل إلى استباحة ما كان محظورا من الجهة التي اباحته الشريعة فإنما يرد أصول الدين وما قد ثبتت به الشريعة — فإن قيل: حظرالله تعالى على اليهود صيد السمك يوم السبت حبسوا السمك يوم السبت وأخذوه يوم الأحد فعاقبهم الله عليه، قيل له: قد أخبرالله تعالى أنهم اعتدوا في السبت، وهذا يوجب ان يكون حبسها في السبت قد كان محظورا عليهم، ولو لم يكن حبسهم لها في السبت محرما لما قال: اعتدوا منكم في السبت

(احكام القرآن للجصاص، سورة يوسف ج:٣ ص:١٧٦، سهيل اكيدمي، لاهور)

"এগুলো বিভিন্ন উদাহরণ যাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন মুবাহ পর্যন্ত পৌঁছতে কৌশল অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন। যেখানে এই কৌশলগুলো গৃহিত না হলে ঐ কাজগুলো নিষিদ্ধ হয়ে যেত। আল্লাহ পাক ব্যভিচারের সূত্রে দৈহিক মিলনকে হারাম করেছেন কিন্তু সে

পর্যন্ত পৌঁছতে আমাদেরকে বিবাহের নির্দেশ দিয়েছেন। অন্যায়ভাবে কারো মাল ভক্ষণে তিনি আমাদের নিষেধ করেছেন কিন্তু বেচাকেনা ও দান দাক্ষিণ্যের মাধ্যমে তা তিনি আমাদের জন্য জায়েয করেছেন। তাই কোন নিষিদ্ধ কাজ পর্যন্ত পৌঁছার জন্য এই জায়েয পদ্ধতি যাকে শরীয়ত মুবাহ বলেছে তাকে অস্বীকার করা মানে দ্বীনের মূলনীতি ও শরীয়তের প্রামান্য কার্যাবলীকে অস্বীকার করা। যদি বলা হয়, আল্লাহ পাক শনিবারদিন ইয়াহুদীদের জন্য মৎস শিকার নিষিদ্ধ করেছিলেন, তারা শনিবার মৎস আটকিয়ে রোববারে তা শিকার করত, একারণে আল্লাহ তাদের আযাব প্রদান করেন। উত্তরে বলা হবে, আসলে শনিবার মাছ আটকিয়ে রাখাও তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। যদি তা নিষিদ্ধ না হত তাহলে আল্লাহপাক বলতেন না যে, 'তারা শনিবার দিন সীমালংঘন করেছে'।"

বিষয়টির উপর হানাফী ফিক্বহবিদগণের মধ্যে শামসুল আইম্মাহ সারাখসী রহ. বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন:

"إختلف الناس في كتاب الحيل أنه من تصنيف محمد رحمه الله ام لا ؟ كان أبو سلمان الجوزجاني ينكر ذلك ويقول: من قال: إن محمدا رحمه الله صنف كتابا سماه الحيل فلا تصدقه، وما في ايدي الناس فإنما جمعه ورّاقو بغداد ــ وقال إن الجهال ينسبون علمائنا رحمهم الله إلى ذلك على سبيل التعيير، فكيف يظن بمحمد رحمه الله أنه سمى شيئا من تصانيفه بهذا الإسم ليكون ذلك عونا للجهال على ما يتقولون؟ وأما أبو حفص رحمه الله كان يقول: هو من تصنيف محمد رحمه الله ، وكان يروي عنه ذلك وهو الأصح ، فإن الحيل في الأحكام المخرجة عن الإمام جائزة عند جمهور العلماء، وإنما كره ذلك بعض المتعسفين لجهلهم وقلة تأملهم في الكتاب والسنة ... (ثم ذكر أمثلة متعددة من الكتاب والسنة في جواز بعض الحيل. ثم قال:) فمن كره الحيل في الأحكام فإنما يكره في الحقيقة أحكام الشرع. وإنما يقع مثل هذه الأشياء من قلة التأمل ــ

فالحاصل: أن ما يتخلص به الرجل من الحرام أو يتوصل به إلى الحلال من الحيل فهو حسن، وإنما يكره ذلك أن يحتال في حق لرجل حتى يبطله، أو في باطل حتى يموهه، أو في حق حتى يدخل فيه شبهة، فما كان علـــى هذا السبيل فهو مكروه، وما كان على السبيل الذي قلنا أو لا فلا بأس به

(المبسوط لشمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى ج:٣٠ ص:٢٠٩-٢١١، دار المعرفة)

“কিতাবুল হিয়াল ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর রচনা কি না? এ ব্যাপারে লোকজন ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করে। আবু সুলাইমান জৌযজানী রহ. এটাকে অস্বীকার করে বলেন, কেউ যদি বলে ইমাম মুহাম্মদ রহ. কিতাবুল হিয়াল নামে কোন কিতাব লিখেছেন, তাহলে তাকে সত্যায়ন কর না। মানুষের হাতে এই নামে যে কিতাব আছে তা বাগদাদের কিতাব বিক্রেতারা সংকলন করেছেন। তিনি আরো বলেন, মূর্খরা আমাদের উলামাদের লজ্জা দেয়ার জন্য তাদের দিকে কৌশলের সম্বোধন করেন। তাই ইমাম মুহাম্মদের ব্যাপারে এ ধারণা কীভাবে করা যায় যে, তিনি তার কোন কিতাবের নাম কিতাবুল হিয়াল (কৌশলের কিতাব) রাখবেন? এতে তো মূর্খদেরই সমর্থন করা হবে। তবে ইমাম আবু হাফস রহ. বলেন, এটি ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এরই রচনা এবং তিনি তা ইমাম মুহাম্মদ থেকে বর্ণনা করেন। এটি তুলনামূলক বিশুদ্ধ মত। কেননা ইমাম সাহেব রহ. থেকে যেসব আহকাম বর্ণিত হয়েছে, তদনুযায়ী জমহুরে উলামায়ে কেরামের মতে কৌশল জায়েয। কট্টরপন্থী কিছু লোক তাদের অজ্ঞতা ও কুরআন-সুন্নাহতে স্বল্প গবেষণার কারণে মাকরূহ বলেছেন।.... (অতঃপর ইমাম সারাখসী কুরআন-সুন্নাহ থেকে কৌশলের অনেক উদাহরণ পেশ করার পর বলেন) তাই কেউ যদি কৌশলকে অবৈধ বা মাকরূহ মনে করে, তাহলে সে শরীয়তের আহকামকে মাকরূহ মনে করে। আর এগুলো সংকীর্ণ গবেষণার ফল।

সার কথা হল, যেসব কৌশল দ্বারা কোন ব্যক্তি হারাম থেকে বাঁচতে পারে বা হালাল পর্যন্ত পৌঁছতে পারে তা ভাল। আর যেসব কৌশল দ্বারা কারো হক নষ্ট করা হয় বা কোন বাতিলের উপর খোলস চড়ানো হয়

অথবা কারো হকের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি করা হয় সেসব কৌশল মাকরূহ। আর যেসব কৌশল আমাদের বর্ণিত রূপ হবে তাতে কোন অসুবিধা নেই।"

আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়্যিম রহ. সেসব উলামাদের অন্তর্ভূক্ত যাদেরকে কৌশলের ঘোর বিরোধী বলে মনে করা হয়। তিনিও ঢালাওভাবে সকল কৌশলকে নাজায়েয বলার পরিবর্তে এর অনেক শ্রেণী বিন্যাস করেছেন। এর তৃতীয় প্রকার সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন:

"القسم الثالث: أن يحتال على التوصل إلى حق أو على دفع الظلم بطريق مباحة لم توضع موصلة إلى ذلك بل وضعت لغيره، فيتخذها هوطريقا الى هذا المقصود الصحيح، أوقد يكون قد وضعت له لكن تكون خفية ولا يفطن لها، والفرق بين هذا القسم والذي قبله أن الطريق في الذي قبله نصبت مفضية إلى مقصودها ظاهرا، فسالكها سالك للطريق المعهود، والطريق في هذا القسم نصبت مفضية إلى غيره فيتوصل بها إلى ما لم توضع له؛ فهي في الفعال كالتعريض الجائزفي المقال أو تكون مفضية إليه لكن بخفاء ونذكر لذلك أمثلة ينتفع بها في هذا الباب ـــ"

(إعلام الموقعين، ج٣ ص٢٨١ ط: دار إحياء التراث العربي)

কৌশল সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের উপরোক্ত আহকাম এবং ফিক্বহবিদগণের উদ্ধৃতি গবেষণা করলে যা বুঝে আসে তা হল, কৌশল তিন প্রকার।

কৌশলের প্রথম প্রকার

১. এটা করা নাজায়েয। কেউ করলেও তার উদ্দেশ্যের প্রভাব শরয়ীভাবে প্রকাশিত হয় না। এটা দুইভাবে হয়।

এক. কোন হারাম জিনিসে প্রকৃত কোন পরিবর্তন ছাড়া কৌশল হিসেবে শুধু তার বাহ্যিক আকৃতি পরিবর্তন করা। এর একটি উদাহরণ ইতোপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। ইহুদীদের জন্য চর্বি হারাম করা হয়েছিল, তারা এটাকে

গলিয়ে ব্যবহার করা শুরু করে। ফলে তাদের প্রতি অভিশাপ দেয়া হয়। এখানে হালাল করার উদ্দেশ্যে চর্বিকে গলানো নাজায়েয ছিল, গলানোর ফলে তাদের উদ্দেশ্যও অর্জিত হয়নি অর্থাৎ, তা হালাল হয়নি। কেননা, চর্বি গলিয়ে ফেললে তাতে প্রকৃত কোন পরিবর্তন আসে না। এই ধরণের কৌশল সম্পর্কে একটি বিশুদ্ধ হাদীসে বলা হয়েছে:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل.

(ابطال الحيل لإبن بطة ١:٥٧، وتفسيرابن كثيرتحت سورة البقرة: ٦٦ ج:١ ص:٢٩٣)

"হযরত আবু হুরায়রা রাজি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, ইহুদীরা যা করেছে তোমরা তা কর না। তাদের মত সামান্য কৌশলের মাধ্যমে তোমরা আল্লাহর হারাম সমূহকে হালাল কর না।"

হানফীদের বক্তব্য অনুযায়ী এর আরেকটি উদাহরণ হতে পারে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই হাদীস "لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة" অর্থাৎ, "দুই জনের যাকাত আদায়যোগ্য পশু একজায়গায় থাকলে যাকাত বেশী হওয়ার ভয়ে পৃথক করা যাবে না। আর যদি পৃথক থাকে তাহলে যাকাত বেশী হওয়ার কারণে একত্রিত করবে না।"-(বুখারী, কিতাবু যাকাত, হাদীস নং- ১৪৫০)।

এখানে চতুষ্পদ জন্তুসমূহের যাকাতের পরিমাণ কমানোর লক্ষ্যে তাদের বিদ্যমান অবস্থার পরিবর্তন করে একত্রিত কিংবা পৃথক করা থেকে বারণ করা হয়েছে। তাই এই নিয়তে এটা করা নাজায়েয এবং কেউ করলেও যাকাত কমানোর যে উদ্দেশ্যে তা করা হচ্ছে হানফীদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী তা অর্জিত হবে না। অর্থাৎ, এ কাজের কারণে যাকাতের পরিমাণে কোন কমতি হবে না; বরং ইতোপূর্বে যে পরিমাণ যাকাত ওয়াজিব ছিল এখনো তা বহাল থাকবে। কেননা, এতে দুই ব্যক্তির মালিকানায় প্রকৃত পক্ষে কোন পরিবর্তন আসেনি।

দুই. কোন জিনিস বা লেনদেনে শুধু আকৃতি নয়; বরং প্রকৃতির পরিবর্তনের চেষ্টা চালানো হয়েছে, তবে যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে তার কারণে শরয়ীভাবে কোন ফলাফল বেরিয়ে আসে না। উদাহরণ স্বরূপ: যাকাতের বছর পুরো হবার সময় যাকাত থেকে বাঁচার জন্য কোন ব্যক্তি বছর পুরো হবার পূর্বেই যাকাতযোগ্য মাল তার স্ত্রীকে দান করল, তবে হস্তান্তর করেনি। এতে প্রথমত, তার এই কাজটিই জায়েয হয়নি এবং যাকাত থেকে পলায়নের চেষ্টা করার কারণে সে গুনাহগার হবে। দ্বিতীয়ত, হস্তান্তর না করার কারণে তার দানও পুরোপুরি শুদ্ধ হয়নি। তাই যে উদ্দেশ্যে সে এই কৌশল অবলম্বন করেছিল তা শরয়ীভাবে অর্জিত হবে না। সুতরাং, তার মাল তার মালিকানা থেকে বের না হবার কারণে আগের মতই যাকাত ওয়াজিব হবে। আরেকটি উদাহরণ হল, যাকাতের টাকা যাকাতের ব্যয়যোগ্য খাত ছাড়া অন্য খাতে ব্যয় করার জন্য 'তামলীক' (কাউকে মালিক বানিয়ে আবার তার কাছ থেকে নেয়া)-এর কৌশল অবলম্বন করা হল, কিন্তু তাতে শর্তসমূহ পূরণ করা হয়নি, যেমন- মৌখিকভাবে তামলীক করা হয়েছে, হস্তান্তর করেনি অথবা এমনভাবে তামলীক করেছে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজেকে মালিক মনে করেনি; বরং এ কাজে নিজেকে বাধ্য মনে করেছে, তাহলে এটাও নাজায়েয হবে। এটা করা হলেও শরয়ীভাবে এর কোন প্রভাব প্রকাশিত হবে না।

কৌশলের দ্বিতীয় প্রকার

২. এখানে কৌশল অবলম্বন কারীর নিয়ত অশুদ্ধ হবার কারণে তার গুনাহ হলেও কৌশলটির প্রভাব প্রকাশিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ: কোন মানুষ যাকাত ফাঁকি দেয়ার জন্য বছর শেষ হবার পূর্বেই নিজের মাল স্ত্রীকে দান করে হস্তান্তরও করে দেয় অথবা তার কাছ থেকে এমন জিনিস কিনে নেয় যার উপর যাকাত আসে না। এক্ষেত্রে যাকাত ফাঁকি দেয়ার কারণে তার গুনাহ হবে। তবে তার এই কৌশলের প্রভাব হিসেবে যাকাত ওয়াজিব হবে না। কেননা, যাকাত ওয়াজিব হবার সময় মালটি তার মালিকানা থেকে বের হয়ে গেছে।

কৌশলের তৃতীয় প্রকার

৩. এ কৌশল অবলম্বনে গুনাহও হয় না এবং শরয়ীভাবে এর প্রভাব প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ, যে উদ্দেশ্যে কৌশল অবলম্বন করা হয়েছিল তা বৈধভাবেই হাসিল হয়। হযরত আইয়ূব আলাইহিস্ সালামকে যে কৌশল শিখানো হয়েছিল এবং হুযুরে আক্বদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বারের খেজুর সম্পর্কে যে কৌশল বলে দিয়েছেন তা এই প্রকারের অন্তর্ভূক্ত। হানফী মাযহাবের ফিক্বহবিদগণ বিভিন্ন জায়গায় যে বৈধ কৌশলের উল্লেখ করেছেন তাও এই প্রকারের অন্তর্ভূক্ত।

ইমাম বুখারী রহ. তাঁর সহীহ গ্রন্থের কিতাবুল হিয়ালে হানফীদের বিরুদ্ধে অসংখ্য আপত্তির বন্যা বইয়ে দিয়েছেন। সেখানে তিনি কৌশলের এই তিন প্রকারকে সামনে রাখেননি; বরং সকল কৌশলকে একই নিক্তিতে মেপে সমানভাবে অস্বীকার করেছেন। অথচ ইমাম বুখারীর উল্লেখিত সকল কৌশলকে হানফী ফিক্বহবিদগণ জায়েয বলেন না।

সুদ সম্পর্কিত কৌশল

এ পর্যন্ত কৌশল সম্পর্কে সাধারণ ও মৌলিক আলেচনা ছিল। ফুক্বাহায়ে কেরাম সুদ সম্পর্কিত অর্থাৎ, সুদের হারাম থেকে বাঁচার জন্য অবলম্বনকৃত কৌশলসমূহকে বিশেষভাবে আলোচনার বিষয়বস্তু বানিয়েছেন। হযরত ক্বাজী খান রহ. একটি পুরো অধ্যায় রচনা করেছেন যেখানে শুধু সুদ থেকে বাঁচার কৌশলসমূহ বলে দেয়া হয়েছে, তিনি এর নাম রেখেছেন: فصل فيما يكون فرارا عن الربا।

সুদ থেকে বাঁচার জন্য যদি এমন কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, যাতে সুদের মাধ্যমে যে পরিমাণ আর্থিক লাভ হয় ঠিক ততটাই এমন কোন জায়েয লেনদেনের মাধ্যমে অর্জিত হয় যা শুধু কৃত্রিমভাবে বাস্তবায়ন করা হয়নি; বরং সেই লেনদেনটিই উদ্দেশ্য হয়, সাথে সাথে তার সকল শরয়ী শর্তসমূহ পূরণ করা হয় এবং তার সকল শরয়ী চাহিদা সমূহের উপর আমল করা হয়, তাহলে তাকে কৌশল বলা যাবে না এবং এর বৈধতার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য কোন মতপার্থক্যও নেই। উদাহরণ স্বরূপ: বাইয়ে মুয়াজ্জাল বা মুরাবাহা মুয়াজ্জালা যা নিজেই উদ্দেশ্য হবে। অর্থাৎ,

ক্রেতা বাস্তবেই কোন জিনিস কিনতে চায় এবং বিক্রেতা ঐ জিনিসটিই বিক্রয় করে, তবে বাকীর কারণে বাজার দর থেকে বেশী মূল্য উসুল করে। এই লেনদেন জায়েয হওয়ার ব্যাপারে ইতোপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। ফুক্বাহায়ে কেরাম এগুলোকে কৌশল হিসেবে অভিহিত করেননি। সুতরাং, যেখানে সুদের বিভিন্ন কৌশল আলোচিত হয়েছে সেখানে উক্ত বেচাকেনাগুলোকে কৌশল হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি।

যদি সুদ থেকে বাঁচার জন্য এমন কোন লেনদেন করা হয় যা নিজে সরাসরি উদ্দেশ্য নয়, তবে লেনদেনটিকে জায়েয করার লক্ষ্যে কৃত্রিমভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে, সাথে শরয়ী শর্তসমূহও পূরণ করা হয়েছে, তাহলে এ ব্যাপারে আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের তিনটি সুস্পষ্ট অবস্থান পরিলক্ষিত হয়।

এক. ইমাম মালেক রহ.-এর অবস্থান হল, যেহেতু লেনদেনটি কৃত্রিমভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং সুদের উদ্দেশ্য অন্য পদ্ধতিতে হাসিল করাই মুখ্য, তাই মুখ্য উদ্দেশ্যের খারাবীর কারণে আমরা লেনদেনটিকে নাজায়েয বলব, যদিও তাতে শরয়ী শর্তসমূহ পূরণ করা হয়েছে।

দুই. ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, শরীয়ত প্রত্যেক লেনদেন শুদ্ধ এবং অশুদ্ধ হবার ব্যাপারে পৃথক পৃথক আহকাম প্রদান করেছে। যেটা জায়েয সেটা জায়েয আর যেটা নাজায়েয সেটা নাজায়েয। কোন জায়েয লেনদেনকে আমরা শুধু এ কারণে নাজায়েয বলতে পারি না যে, তা দ্বারা কোন নাজায়েয লেনদেনের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়। ইমাম শাফেয়ী রহ. كتاب الأم-এ তাঁর এই অবস্থানকে জোরালোভাবে উপস্থাপন করেছেন।

তিন. এই দুই অবস্থানের মধ্যবর্তী অবস্থন হল হানফী উলামাদের। তা হল, যদি কৃত্রিম লেনদেনটির প্রভাব মোটেই প্রকাশিত না হয়, তাহলে আমরা তাকে জায়েয বলব না, আর যদি তার কোন কার্যকর প্রভাব এমনভাবে প্রকাশিত হয় যা তাকে সুদ থেকে সুস্পষ্টভাবে পৃথক করে দেয় তাহলে তা জায়েয হবে।

এ তিনটি অবস্থান 'বাইয়ে ঈনা'র লেনদেনে পুরোপুরিভাবে সুস্পষ্ট হয়।

যেহেতু অনেকে মুরাবাহা মুয়াজ্জালাকে 'বাইয়ে ঈনা'র সমতুল্য অনুমান করেন অথবা এর সাদৃশ্য মনে করেন এবং অনেক জায়গায় এই প্রতিক্রিয়া

ব্যক্ত করা হয়েছে যে, ইমাম মুহাম্মদ রহ. 'ঈনা'র ব্যাপারে যে কঠোর ভাষা ব্যবহার করেছেন তা মুরাবাহা'র জন্যও প্রযোজ্য, তাই 'বাইয়ে ঈনা'র প্রকৃতি এবং এ ব্যাপারে ফুক্বাহায়ে কেরামের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির উপর কিছুটা আলোকপাত করা উচিৎ। যদিও সুদবিহীন ব্যাংকিংয়ে 'বাইয়ে ঈনা'র উপর আমল হয় না।

বাইয়ে ঈনা

'عينة' বাইয়ে ঈনা কোন জিনিস বাস্তব মূল্যের চেয়ে বেশী মূল্যে বাকীতে বিক্রি করাকে বলা হয়। উদাহরণ স্বরূপ: যায়েদের এক হাজার টাকা ঋণ প্রয়োজন। সে আমরের কাছে ঋণ চায়। আমর দিতে রাজি তবে সাথে কিছু লাভ হোক, এটাও চায়। ঋণের উপর লাভ চাইলে তা সুদ এবং হারাম হবে। তাই তারা একটি কৌশল অবলম্বন করে। একটি কাপড় যার বাজার মূল্য একহাজার টাকা আমর যায়েদের কাছে তা এগারশত টাকায় ছয়মাসের বাকীতে বিক্রয় করে। সাথে সাথেই আমর আবার তা যায়েদের কাছ থেকে নগদ এক হাজার টাকা দিয়ে কিনে নেয়। ফল দাড়ায়, আমর যায়েদকে দ্বিতীয় বেচাকেনার মূল্য নগদ এক হাজার টাকা তাৎক্ষনিকভাবে পরিশোধ করে, আবার ছয় মাস পরে প্রথম বেচাকেনার মূল্য হিসেবে সে যায়েদের কাছে ছয়মাস পরে এগারশত টাকা উসুল করবে। এভাবে আমর একশত টাকা লাভ পায়।

এখানে প্রকৃত পক্ষে আমর কাপড় বিক্রয় করতে চায় না আর যায়েদও ক্রয় করতে চায় না। তবুও কৃত্রিমভাবে এই বেচাকেনা এজন্যই করা হয়েছে যাতে করে আমরের লাভ ঋণের উপর না হয়ে বেচাকেনার উপর হয়। একারণেই আমর যায়েদের কাছে কাপড়টি বিক্রয় করে সাথে সাথেই তা আবার কিনে নেয়। উল্লেখ্য, যায়েদ কাপড়টি আবার আমরের কাছে একহাজার টাকায় বিক্রয় করবে– প্রথম বেচাকেনার সময় এমন শর্ত করা হলে লেনদেনটি কারো মতেই জায়েয হবে না। তবে প্রথম বেচাকেনার সময় এরূপ শর্ত আরোপ করা না হলেও বাস্তবে এমনটি হয়েছে, সেক্ষেত্রে উলামায়ে কেরাম বিভিন্ন মত পোষণ করেন। ইমাম মালেক রহ. বলেন, এটা একেবারে কৃত্রিম কার্যক্রম যা সুদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য করা হয়েছে। তাই এটা নাজায়েয। অন্যদিকে ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন,

এখানে উভয় লেনদেন পৃথক পৃথকভাবে সম্পন্ন হয়েছে। প্রথম লেনদেনের সময় যায়েদ আমরের কাছে কাপড়টি পূণরায় এক হাজার টাকায় বিক্রি করবে– এমন শর্ত আরোপ না করার কারণে যায়েদের আইনগত অধিকার আছে কাপড়টি আমরের কাছে বিক্রি না করার। সে ইচ্ছা করলে নিজের কাছে রেখে দিতে পারে আবার অন্যের কাছেও বিক্রি করতে পারে। এরপরও সে যদি তা আমরের কাছে বিক্রি করে তবে তা সন্তুষ্টির ভিত্তিতেই করেছে। এটাকে নাজায়েয বলার কোন কারণ নেই। ইমাম শাফেয়ী রহ. তাঁর রচিত কিতাবুল উম্ম-এ এই অবস্থানটি বিস্তারিত ও জোরদারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। উলামাদের সুবিধার্থে ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর আলোচনাটি অনুবাদ ছাড়াই পেশ করা হল:

" قال الشافعي: وأصل ما ذهب إليه من ذهب في بيوع الأجال أهم رووا عن عالية بنت أنفع أنها سمعت عائشة أو سمعت امرأة ابي السفرتروي عن عائشة أن امرأة سألتها عن بيع باعته من زيد بن أرقم بكذا وكذا إلى العطاء ثم اشترته منه بأقل من ذلك نقدا، فقالت عائشة: بئس ما اشتريت وبئس ما ابتعت، أخبري زيد بن أرقم أن الله عزوجل قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. قال الشافعي: قد تكون عائشة لو كا ن هذا ثابتا عنها عابت عليها بيعا إلى العطاء لأنه أجل غير معلوم، وهذا مما لانجيزه لا أنها عابت عليها ما اشترت منه بنقد وقد باعته إلى أجل، ولو اختلف بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شيئ فقال بعضهم فيه شيئا وقال بعضهم بخلافه كان أصل ما نذهب إليه أنا نأخذ بقول الذي معه القياس، والذي معه القياس زيد بن أرقم. وجملة هذا أنا لانثبت مثله على عائشة مع أن زيد بن أرقم لا يبيع إلا ما يراه حلالا ولا يبتاع مثله، فلو أن رجلا باع شيئا أو ابتاعه نراه نحن محرما وهو يراه حلالا لم نزعم أن الله يحبط من عمله شيئا، فإن قال قائل: فمن أين القياس

مع قول زيد ؟ قلت: أرأيت البيعة الأولى أليس قد ثبت بها عليه الثمن تاما ؟ فإن قال: بلى! قيل: أفرأيت البيعة الثانية أهي الأولى؟ فإن قال: لا، قيل: أفحرام عليه أن يبيع ما له بنقد وإن كان اشتراه إلى أجل؟ فإن قال: لا إذا باعه من غيره، قيل: فمن حرمه منه؟ فإن قال: كأنها رجعت إليه السلعة، أو اشترى شيئا دينا بأقل منه نقدا. قيل: إذا قلت: "كأنّ" لما ليس هو بكائن لم ينبغ لأحد أن يقبله منك. أرأيت لو كانت المسئلة بحالها فكان باعها بمائة دينار دينا واشتراها بمائة أو بمائتين نقدا، فإن قال: جائز، قيل: فلا بد أن تكون أخطأت كان ثَمَّ أو ههنا، لأنه لا يجوز له أن يشتري منه مائة دينار دينا بمائتي دينار نقدا، فإن قلت: إنما اشتريت منه السلعة، قيل: فهكذا ينبغي أن تقول أو لا، ولا تقول: "كأنّ" لما ليس هو كائن، أرأيت البيعة الآخرة بالنقد لو انتقدت أليس ترد السلعة ويكون الدين ثابتا كما هو؟ فتعلم أن هذه بيعة غير تلك البيعة. فإن قلت: إنما اتهمته، قلنا: هو أقل تهمة على ماله منك، فلا تركن عليه، إن كان خطأ ثم تحرم عليه ما أحل الله له لأن الله عزوجل أحل البيع وحرم الربا، وهذا بيع وليس بربا، وقد روي أجازة البيع إلى عطاء عن غير واحد وروي عن غيرهم خلافه، وإنما اخترنا أن لا يباع إليه لأن العطاء قد يتأخر ويتقدم، وإنما الآجال معلومة بأيام موقوتة أو أهلة، وأصلها في القرآن، قال الله عزوجل: 'يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج' وقال تعالى: 'واذكروا الله في أيام معدودات' وقال عزوجل: 'فعدّة من أيام أخر'. فقد وقّت بالأهلة كما وقّت بالعدة، وليس العطاء من مواقيته تبارك وتعالى وقد يتأخر الزمان ويتقدم. وليس تتأخر الأهلة أبدا اكثر من يوم، فإذا اشترى الرجل من الرجل

السلعة فقبضها وكان الثمن إلى أجل فلا بأس أن يبتاعها من الذي اشتراها منه ومن غيره بنقد أقل أو أكثرمما اشتراها به أو بدين كذلك أو عرض من العروض ساوى العرض ما شاء أن يساوي، وليست البيعة الثانية من البيعة الأولى بسبيل، ألا ترى أنه كان للمشتري البيعة الأولى إن كـــان أمـــة أن يصيبها أويهبها أو يعتقها أو يبيعها ممن شاء غيربيعه بأقل أو اكثرمما اشتراها به نسيئة. فإذا كان هكذا فمن حرمها على الذي اشتراها ؟ وكيف يتوهم أحد -- -- وهذا إنما تملكها ملكا جديدا بثمن لها لا بالدنانيرالمتأخرة -- -- أن هذا كان ثمنا للدنانيرالمتأخرة ؟ وكيف إن جاز هذا علـــى الـــذي باعها لايجوز على أحد لو اشتراها؟"

–(كتاب الأم مع موسوعة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، باب بيع الآجال ج:٦ ص:٢٤٩ ط: دار قتيبة)

বাইয়ে ঈনার ব্যাপারে হানাফী ফুক্বাহাদের দু'টি মত পাওয়া যায়। একদিকে ইমাম মুহাম্মদ রহ. বলেন: "هذاالبيع في قلبي كأمثال الجبـــال ذميم اخترعـــه أكلـــة الربـــا" অর্থাৎ, "আমার অন্তরে এ বেচাকেনাটি পাহাড়ের বোঝার মত। এটি একটি নিন্দনীয় লেনদেন যা সুদখোরেরা আবিস্কার করেছে।" –(রদ্দুল মোহতার কিতাবুল কাফালাহ খন্ড:৫ পৃ:৩২৫, ৩২৬ প্র: সাঈদ)

ইমাম মুহাম্মদ রহ. যে ঈনা সম্পর্কে এই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন তার ব্যাখ্যায় ফতোয়ায়ে ক্বাজী খানে বলা হয়েছে:

" وحيلة أخرى أن يبيع المقرض من المستقرض ثم إن المستقرض يبيعها من غيره بأقل مما اشترى ثم ذلك الغيريبيعها من المقرض بما اشـــترى .... وهذه الحيلة هى العينة التي ذكرها محمد رحمه الله تعالى ـــ" –(الخانية على هامش الهندية ج:٢ ص:٢٧٨ ط: رشيدية)

"সুদ থেকে বাঁচার আরেকটি কৌশল হল, ঋণদাতা গ্রহীতাকে কোন জিনিস বাকীতে বিক্রয় করে তাকে দিয়ে দিবে, ঋণগ্রহীতা তা কোন তৃতীয় ব্যক্তির কাছে ক্রয়কৃত মূল্যের কমে বিক্রয় করবে, তৃতীয় ব্যক্তিটি তা পূণরায় ঋণদাতার কাছে বিক্রয় করবে..... এটাই হচ্ছে সে কৌশল যা ইমাম মুহাম্মদ রহ. উল্লেখ করেছেন।"

অন্যদিকে হযরত ইমাম আবু ইউসুফ রহ. বলেন, "ঈনা শুধু জায়েয নয়; বরং সুদ থেকে বাঁচার কারণে এ ধরণের ক্রেতা বিক্রেতার সওয়াব হবে।"

" وعن أبي يوسف رحمه الله أنه قا ل العينة جائزة مأجورة" —(الخانية

على هامش الهندية ج:٢ ص:٢٧٩ ط: رشيدية)

একই কথা হযরত ক্বাজী খান রহ. মাশায়েখে বালখ থেকে উদ্ধৃত করেছেন:

"وقا ل مشائخ بلخ: بيع العينة في زماننا خيرمن البيوع التي تجري في أسواقنا، وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال العينة جـــائزة مـــأجورة وقال: أجره لمكاذ الفرار من الحرام —"

"বালখের মাশায়েখগণ বলেন, বাইয়ে ঈনা বর্তমানে আমাদের বাজারে প্রচলিত অনেক বেচাকেনা থেকে উত্তম। হযরত ইমাম আবু ইউসুফ রহ. থেকে বর্ণিত, ঈনা জায়েয এবং সওয়াবের কাজ এবং তার সওয়াব হারাম থেকে বাঁচার কারণে হবে।"

আল্লামা বীরী রহ. ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর অবস্থানও ইমাম আবু ইউসুফের মত উল্লেখ করেছেন।

(শরহুল আশবাহ লিল বীরী, মাখতুত পৃ:৫৫)

দৃশ্যত এসব বুযুর্গদের অবস্থানে দুই মেরুর দূরত্ব পরিলক্ষিত হচ্ছে। আল্লামা ইবনুল হুমাম রহ. এ দুইয়ের মাঝে সমন্বয় সাধন করে বলেন, নিন্দনীয় ও মাকরূহ হল ঐ প্রকার যা উপরে উল্লেখিত হয়েছে। জায়েয পদ্ধতি হল, উপরোক্ত উদাহরণে আমর যায়েদের কাছে ছয়মাসের বাকীতে এগারশত টাকায় কাপড় বিক্রয় করে দেয়, যায়েদ কাপড়টি আমরের কাছেই পূনরায় বিক্রয় করে না; বরং বাজারে গিয়ে এক হাজার টাকায়

বিক্রয় করে, ফলে বাজার থেকে তাৎক্ষনিকভাবে সে এক হাজার টাকা পায় এবং ছয় মাস পরে ঐ কাপড়ের ধার্যকৃত মূল্য এগারশত টাকা আমরকে পরিশোধ করে। হাম্বলীগণ এই পদ্ধতিকে تورق বা নগদায়ন বলে। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. একে ঈনা অভিহিত করে জায়েয বলেছেন। ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর মতেও এটি জায়েয। কেননা, পণ্যটি যতক্ষণ প্রথম বিক্রেতার কাছে ফিরে না যায় ততক্ষণ তার নাম ঈনা নয়। আল্লামা ইবনুল হুমাম লেখেন:

ثم الذي يقع في قلبي أن ما يخرجه الدافع إن فُعِلت صورة يعود فيها إليه هو أو بعضه، كعود الثوب أو الحرير في الصورة الأولى، وكعود العشـــرة في صورة إقراض الخمسة عشر، فمكروه، وإلا فلا كراهـــة إلا خـــلاف الأولى على بعض الإحتمالات كأن يحتاج المديون فيأبى المسئول أن يُقرض بل أن يبيع ما يساوي عشرة بخمسة عشرإلى أجل فيشتريه المديون ويبيعـــه في السوق بعشرة حالة، ولا بأس في هذا فإن الأجل قابله قسط من الثمن، والقرض غيرواجب عليه دائما بل هو مندوب، فإن تركه بمجرد رغبة عنه إلى زيادة الدنيا فمكروه، أولعارض يُعذَربه، فلا. وإنما يعـــرف ذلـــك في خصوصيات المواد، وما لم ترجع إليه العين التي خرجت منه لا يُسمّى بيع العينة. (فتح القدير كتاب الكفالة ج:٦ ص:٣٢٣،٣٢٤ ط: رشيدية)

"অতঃপর আমার মনে একটি কথা আসছে যে, প্রথম বিক্রেতা যে জিনিসটি বিক্রয় করে যদি তা কিংবা তার কিছু অংশ, যেমন- প্রথম পদ্ধতিতে কাপড় বা রেশম- তার কাছে ফিরে আসে তাহলে বেচাকেনাটি মাকরূহ হবে। অন্যথায় কোন অসুবিধা নেই। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে তা খেলাফে আউলা বা উত্তমের বিপরীত হবে। যেমন: কারো ঋণের প্রয়োজন। সে যার কাছ থেকে ঋণ চায় সে তাকে ঋণ দিতে আগ্রহী নয়; বরং সে চায় দশ (দেরহাম) মূল্যের কোন জিনিস পনের (দেরহাম)-এর বিনিময়ে বাকীতে বিক্রয় করবে। ঋণগ্রহীতা জিনিসটি বাজারে নগদ দশ

(দেরহাম) নিয়ে বাজারে বিক্রয় করে। এতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা, দামের একটি অংশ তাকে (প্রথম বেচাকেনায়) প্রদত্ত সুযোগের বিনিময়ে হবে। ঋণ দেয়া সবসময় ওয়াজিব নয়; বরং মুস্তাহাব। তাই কোন পার্থিব লাভের উদ্দেশ্যে এই মুস্তাহাব কাজ পরিত্যাগ করলে তা মাকরূহ হবে, আর যদি কোন অপারগতার কারণে করে তাহলে মাকরূহও হবে না। প্রত্যেক লেনদেনে এটা আলাদা আলাদাভাবে বুঝা যায়। আর বিক্রয়কৃত জিনিস যতক্ষণ তার কাছে ফেরত না আসে যার কাছ থেকে বের হয়েছিল ততক্ষণ তাকে 'বাইয়ে ঈনা' বলা যাবে না।"

আল্লামা শামী রহ. ইবনুল হুমাম রহ.-এর এই উদ্ধৃতি উল্লেখ করার পর বলেন:

وأقره في البحر والنهروالشرنبلالية وهو ظاهروجعله السيدأبوالسعود محمل قول أبي يوسف وحمل قول محمد والحديث على صورة العود

(الدرالمختار مع ردالمحتار كتاب الكفالة ج:٥ ص:٣٢٥،٣٢٦ ط: سعيد)

"আল বাহরুর রায়েক্ব, আন নাহরুল ফায়েক্ব এবং শারাম্বুলালী প্রমুখ আল্লামা ইবনুল হুমামের এই কথাকে সমর্থন করেছেন। এটি সুস্পষ্ট কথা। মুফতি সৈয়্যদ আবুস সাউদ ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর মতকে এ কথার উপর গণ্য করেছেন। আর ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর মতকে ঐ ক্ষেত্রের উপর গণ্য করেছেন যখন পণ্য ঘুরে ফিরে প্রথম বিক্রেতার কাছে চলে আসে।"

এতে বুঝা যায় যে, ইমাম মুহাম্মদ রহ.ও ঐ পদ্ধতিকে নাজায়েয বলেন না, যখন কোন ব্যক্তি বাকীতে বেশী মূল্যে কাপড় কিনে তা বিক্রেতার কাছে পুণরায় বিক্রি করার পরিবর্তে বাজারে বিক্রি করে টাকা পায়। ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর এই অবস্থান কিতাবুল হুজ্জার উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকেও স্পষ্ট হয়। এখানেও কাপড় কেনা যায়েদর উদ্দেশ্য নয়; বরং নগদ টাকাই তার উদ্দেশ্য। কিন্তু উদ্দেশ্য অর্জনে সে সুদ থেকে বাঁচার জন্যই এই পন্থা অবলম্বন করেছে। তাই এটি একটি কৌশল। তবে যেহেতু এই বেচাকেনার প্রতিক্রিয়ায় যায়েদ বাস্তবেই কাপড়টির মালিক হয়, আবার তৃতীয় ব্যক্তির কাছে বিক্রি করে, তাই এই কৌশলটি ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর মতেও জায়েয। সত্যিকার অর্থে যদি সুদের হারাম থেকে বাঁচার জন্য

এ কাজ করা হয়ে থাকে, তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর মতে এটা শুধু জায়েযই নয়; বরং সওয়াবের কারণও বটে। হানফী মাযহাবের পরবর্তী ফিকুহবিদগণের অবস্থানও এটা।

যাই হোক! সুদ থেকে বাঁচার জন্য যেসব কৌশল অবলম্বন করা হয় তার ব্যাপারে ফিকুহবিদগণের অবস্থান এই তিনটি। দৃষ্টিভঙ্গির এই মতবিরোধের কারণে উভয় পক্ষের আবেগপ্রবণ কিছু লোক অন্যকে সমালোচনার লক্ষ্যবস্তুতেও পরিণত করেছে। যারা মালেকী মাযহাবের অনুসারী তারা শাফেয়ী ও হানফীদেরকে কৌশল ও চালবাজীর সহায়ক বলে অভিযুক্ত করেছে। এ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই ইমাম বুখারী রহ. তার কিতাবুল হিয়াল লিখেছেন। কোন কোন শাফেয়ী ও হানফী আলেম মালেকীদের অবস্থানকে ভূল ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং বিনা কারণে হালালকে হারাম বলা হয়েছে বলে আপত্তি উত্থাপন করেছেন। প্রকৃত সত্য হল, উভয় দলের কাছেই মজবুত দলিল প্রমাণ আছে এবং তাদের কাউকেই বাতিল বলা যাবে না। এ বিষয়ে ইমাম শাতেবী রহ. খুবই ভারসাম্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন। যদিও তিনি মালেকী মাযহাবের অনুসারী হিসেবে কৌশল ও বাকীতে বিক্রয়ের ব্যাপারে ইমাম মালেকের মতো দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন, তবুও তিনি নিজ দলের লোকদের সামনেই শাফেয়ী ও হানফীদের অবস্থানকে জোরদারভাবে বর্ণনা করে বলেন, তাদের অবস্থানকে ভারসাম্যহীন বলা বাড়াবাড়ি ছাড়া কিছু নয়।

যেহেতু আল্লামা শাত্বেবী রহ. একজন উঁচু মাপের ব্যক্তি এবং তাঁর আলোচনাটি খুবই ভারসাম্যপূর্ণ ও উপকারী তাই কিছুটা দীর্ঘ হলেও তা এখানে উদ্ধৃত করা হল:

”ومن ذلك مسائل بيوع الآجال؛ فإن فيها التحيل إلى بيع درهم نقدا بدرهمين إلى أجل، لكن بعقدين كل واحد منهما مقصود في نفســـه، وإن كان الأول ذريعة؛ فالثاني غيرمانع لأن الشارح إذا كان قـــد أبـــاح لنـــا الانتفاع بجلب المصالح ودرء المفاسدعلى وجوه مخصوصة؛ فتَحَرِّي المكلف تلك الوجوهَ غيرُ قادح، وإلا كان قادحا في جميع الوجوه المشـــروعة، وإذا

فُرض أن العقد الأول ليس بمقصود العاقد، وإنما مقصوده الثاني؛ فالاول إذاً متزّل مترلة الوسائل، والوسائل مقصودة شرعاً من حيث هى وسائل، وهذا منها، فإن جازت الوسائل من حيث هي وسائل؛ فليجز ما نحن فيــه، وإن مُنِع ما نحن فيه؛ فلتُمنع الوسائل على الإطلاق، لكنها ليست على الإطلاق ممنوعةً إلا بدليل، فكذلك هنا لايُمنع إلا بدليل ـــ

بل هنا ما يدل على صحة التوسل في مسئلتنا، وصحة قصد الشـــارع إليه في قوله عليه الصلاة والسلام: (بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالـــدراهم جنيبا)؛ فالقصد ببيع الجمع بالدراهم التوسل إلى حصول الجنيب بـــالجمع لكن على وجه مباح، ولافرق في القصد بين حصول ذلك مع عاقد واحد وعاقدين، إذ لم يفصل النبي عليه الصلاة والسلام ـــ

وقول القائل: إن هذا مبني على قاعدة القول بالذرائع غير مفيد هنـــا؛ فإن الذرائع على ثلثة أقسام:

منها: ما يُسدّ بإتفاق؛ كسبّ الأصنام مع العلم بأنه مؤد إلى ســـبّ الله تعالى، وكسبّ أبوي الرجل إذا كان مؤدّيا إلى سبّ ابوي السابّ؛ فإنـــه عُدّ في الحديث سبّا من السابّ لأبوي نفسه، وحفرالآبارفي طريق المسلمين مع العلم بوقوعهم فيها، وإلقاء السم في الأطعمة والأشربة التي يعلم تناول مسلمين لها ـــ

ومنها: ما لا يُسدّ بإتفاق، كما إذا أحب الإنسان أن يشتري بطعامـــه نضل منه أو أدنى من جنسه؛ فيتحيّل ببيع متابعـــه ليتوصّـــل بـــالثمن إلى مقصوده، بل كسائر التجارات؛ فإن مقصودها الذي أبيحت له إنما يرجع ـ تحيّل في بذل دراهم في السلعة ليأخذ أكثرمنها ـــ

ومنها: ما هو مختلف فيه ومسئلتنا من هذا القسم؛ فلم نخرج عن حكمه بعد والمنازعة باقية فيه ـــ

وهذه جملة ما يمكن أن يقال في الإستدلال على جواز التحيل في المسئلة، وأدلة الجهة الأخرى مقررة واضحة شهيرة؛ فطالعها في موضعها. وإنما قُصد هنا هذا التقرير الغريب لقلة الإطلاع عليه من كتب أهله؛ إذ كتب الحنفية كالمعدومة الوجود في بلاد المغرب، وكذلك كتب الشافعية وغيرهم من أهل المذاهب، ومع أن إعتياد الإستدلال لمذهب واحد ربّما يكسب الطالب نفورا وإنكارا لمذهب غير مذهبه من غير إطلاع على مأخذه؛ فيورث ذلك حزازة في الإعتقاد في الأيمة الذين أجمع الناس على فضلهم وتقدّمهم في الدين واضطلاعهم بمقاصد الشارع وفهم أغراضه، وقد وُجد هذا كثيرا ـــ"

—(الموافقات للشاطبي ـــ كتاب المقاصد القسم الثاني: مقاصد المكلف ج:٢ ص:٣٧٨–٣٩١ ط: المطبعة الرحمانية بمصر)

"কৌশলের একটি প্রকার হল, মেয়াদী বেচাকেনার মাসআলাসমূহ। যেখানে নগদ এক দেরহামের বিপরীতে বাকী দুই দেরহামের বিনিময়ের জন্য কৌশল অবলম্বন করা হয়। কাজটি দু'টি মুখ্য ও পৃথক লেনদেনের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। প্রথম লেনদেনটি (দ্বিতীয় লেনদেনের জন্য) মাধ্যম হলেও দ্বিতীয় লেনদেন নিষিদ্ধ নয়। কেননা, শরীয়ত রচয়িতা আমাদেরকে সুবিধা লাভের জন্য ও ক্ষতি দূরীভূত করার জন্য কিছু বিশেষ পদ্ধতি দ্বারা সুবিধাভোগ করার সুযোগ করে দিয়েছেন। তাই খুঁজে খুঁজে এসব পদ্ধতি অবলম্বন করা ক্ষতিকর নয়; ক্ষতিকর হলে শরীয়তের সকল বৈধ পদ্ধতিতেই হতো। যদি ধরে নেয়া হয় যে, প্রথম লেনদেন উদ্দেশ্য ছিল না; বরং দ্বিতীয় লেনদেন উদ্দেশ্য ছিল, তাহলে প্রথম লেনদেন অসিলা বা মাধ্যম হয়ে যাবে। আর মাধ্যম হিসেবে মাধ্যমও শরীয়তে মুখ্য হয়ে যায়।

এটাও সেরকম। তাই মাধ্যম হিসেবে মাধ্যম যদি জায়েয হয় তাহলে আমরা যে মাসআলা আলোচনা করছি তাও জায়েয হবে। যদি তাকে নাজায়েয বলা হয়, তাহলে সাধারণভাবে সকল মাধ্যম নাজায়েয হয়ে যাবে। অথচ বাস্তবতা হল, সকল মাধ্যম নাজায়েয বা নিষিদ্ধ নয়; নিষিদ্ধ হবার জন্য দলিলের প্রয়োজন। তাই এখানেও দলিল ছাড়া নিষিদ্ধ বলা যাবে না।

বরং আমাদের আলোচিত মাসআলায় এমন একটি দলিল আছে, যা এ ধরণের লেনদেনকে মাধ্যম বানানোর বৈধতার পক্ষে এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক একে পরিশুদ্ধতার ইচ্ছার পক্ষে প্রমাণ বহন করে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'মিশ্রিত খেজুরগুলোকে দেরহামের বিনিময়ে বিক্রয় কর, অতঃপর ঐ দেরহাম দিয়ে জুনাইব খেজুর কিনে নাও'। এখানে মিশ্রিত খেজুরকে দেরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করার আসল উদ্দেশ্য ছিল মিশ্রিত খেজুরের পরিবর্তে জুনাইব খেজুর গ্রহণ করা, তবে তা বৈধ পন্থায়। সুতরাং, উদ্দেশ্য যেহেতু এটাই, তাই লেনদেন একজনের সাথে করা হোক কিংবা দুইজনের সাথে, তাতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যপারে বিস্তারিত কিছু বলেননি। কেউ যদি বলে, জায়েয না হওয়ার মতটি سد ذرائع 'মাধ্যম বন্ধ করা'র মূলনীতির ভিত্তিতে করা হয়েছে; তাহলে কথাটি গ্রহণ করা যাবে না। কেননা, মাধ্যম তিন প্রকার:

এক: যেসব মাধ্যমের পথ বন্ধ করা সর্বসম্মতিক্রমে জরুরী। যেমন, প্রতিমাকে গালি দেয়া, যখন এটা নিশ্চিত হয় যে, প্রত্যুত্তরে (মুশরিকদের পক্ষ থেকে) আল্লাহর সম্মানে বেয়াদবী করা হবে।.......

দুই: যেসব মাধ্যমের পথ সর্বসম্মতিক্রমে বন্ধ করা হয় না। যেমন, কেউ চায় যে, নিজের কাছে মজুদ শস্যের চেয়ে ভাল শস্য কিনবে অথবা, নিজের কাছে মজুদ কোন জিনিস থেকে কম উন্নত জিনিস (বেশী পরিমাণে) কিনবে এবং এজন্য সে তার মাল বিক্রয় করে নগদ টাকা জমা করে, যাতে করে উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারে। এটাতো সকল ব্যবসায়ীদেরই অভ্যাস যে, কোন মাল কেনার জন্য টাকা এ লক্ষ্যেই তারা ব্যয় করে যাতে (তা বিক্রয় করে) আরো অধিক টাকা পায়।

তিন: যে মাধ্যমের পথ বন্ধ করা হবে কি না এ ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। আমাদের আলোচিত মাসআলাও এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। আলোচনা এই প্রকারের ব্যাপারেই চলছিল, যা এখনো শেষ হয়নি।

এই হল, সেসব দলিলের সার সংক্ষেপ, যা এই মাসআলায় কৌশল অবলম্বনের বৈধতার পক্ষে উপস্থান করা যেতে পারে। ভিন্ন অবস্থান গ্রহণকারীদে-র (মালেকীদের) দলিলসমূহ প্রসিদ্ধ, অবধারিত ও সুস্পষ্ট। এগুলো আপন জায়গায় দেখে নেয়া যেতে পারে। কিন্তু এখানে আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, ঐ দলিলের উল্লেখ করা, যা (আমাদের কাছে) একেবারে নতুন। কেননা, মানুষ সরাসরি ঐ দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তাদের কিতাব থেকে এ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে পারেনি। কারণ, পশ্চিমা দেশগুলোতে হানাফী মাযহাবের কিতাবগুলো নেই বললেই চলে। শাফেয়ী ও অন্যান্য মাযহাবের কিতাবসমূহেরও একই অবস্থা। আরো কারণ হল, এক মাযহাবের দলিলে অভ্যস্থ হয়ে পড়লে অনেক সময় ছাত্রদের মনে নিজের মাযহাব ছাড়া অন্য মাযহাবের মূল সম্পর্কে ধারণা না থাকায় তাদের ব্যাপারে ঘৃণা ও বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হয়। এতে ইমামদের ব্যাপারেও একটি বিরূপ ধারণা জন্মায়। অথচ ইমামগণের মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব এবং শরীয়তের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুধাবনে পূর্ণ দক্ষতার ব্যাপারে সকল মানুষের ঐকমত্য আছে।"

এ হল, কৌশল সম্পর্কে ফুক্বাহায়ে কেরামের বর্ণিত বিস্তারিত বিবরণ। এ থেকে বুঝা যায় যে, ফুক্বাহায়ে কেরাম অত্যন্ত সুক্ষ্মদৃষ্টির মাধ্যমে সব বিষয়গুলোকে বিশ্লেষণ করে সঠিক জায়গায় উপস্থাপন করেছেন। তাঁরা কৌশলের নাম শোনার সাথে সাথে ক্রোধান্বিত হয়ে এর প্রকৃতি না দেখে এমনটি বলেননি যে, এটা প্রকাশ্য সুদ থেকেও বেশী হারাম; বরং যেসব কৌশলকে তাঁরা নাজায়েয বলেছেন যেমন, ঈনা– সেগুলোর জন্যও তারা সর্বোচ্চ 'মাকরূহ' শব্দ ব্যবহার করেছেন; হারাম শব্দের ব্যবহার করেননি। কোন ফিক্বহবিদ একে সুদের চেয়েও বেশী হারাম বলেননি।

যাই হোক! উপরোক্ত সবিস্তার আলোচনার আলোকে 'ঈনা'র কৌশল নাজায়েয হওয়াটাই প্রাধান্য পায়। সুতরাং, পাকিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্যে সুদবিহীন ব্যাংকগুলোতে 'ঈনা'কে পরিপূর্ণভাবে পরিহার করা হয়। (তবে শাফেয়ী মতাবলম্বী সংখ্যাগরিষ্ট মালয়েশিয়াতে কিছু ব্যাংকে এর ব্যবহারের

কথা শোনা যায়)। কিন্তু সুদ থেকে বাঁচার জন্য বৈধ কৌশলের ব্যবহার সব যুগেই করা হয়েছে।

এটা ঠিক যে, যেখানে অন্য পদ্ধতি অবলম্বন করা সম্ভব সেখানে কৌশলকে পৃথক রীতি ও অভ্যাসে পরিণত করা উত্তম কর্মকৌশল হতে পারে না। তাই যাদের কাছে সবধরণের উপকরণ ও মাধ্যম আছে, সেই সরকারকে আমি সম্বোধন করে তাদের শতকোটি টাকার বিনিয়োগে শুধু কৌশলের ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালনার সমালোচনা করেছি। তাই বলে এর উদ্দেশ্য এটা নয় যে, যেসব কৌশল জায়েয তা রীতি ও অভ্যাসে পরিণত করা শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম; বিশেষত সেসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের জন্য, যাদের কাছে অন্য কোন মাধ্যম থাকে না। অতএব, কৌশলকে অভ্যাসে পরিণত করা উচিৎ নয়– এজাতীয় কথা বললে কোন আপত্তি ছিল না; অথচ বলা হয়েছে, বৈধ কৌশলসমূহের উপর আমল করা বা অভ্যস্থ হওয়া নাজায়েয। প্রশ্ন হচ্ছে- যে কৌশলকে ফিক্বহবিদগণ জায়েয বলেছেন তাকে অভ্যাস বানানো শরয়ীভাবে নাজায়েয হলে তার পরিমাণ কী হবে? অর্থাৎ, কতবার ঐ লেনদেন করা জায়েয আর কতবার করা নাজায়েয? যেসব ফিক্বহবিদ কৌশলের উপর আলোচনা করেছেন, যাদের কিছু উদ্ধৃতি পূর্বে আলোচিত হয়েছে, তাদের কেউ কৌশলের বৈধতার জন্য এমন শর্ত আরোপ করেননি যে, একে রীতি ও অভ্যাস হিসেবে ব্যবহার করা হারাম এবং সুদ অপেক্ষা বেশী হারাম।

কিছু সম্মানিত ব্যক্তি বৈধ কৌশলসমূহ অভ্যাস বানানো জায়েয না হওয়ার উপর দলিল পেশ করতে গিয়ে হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহ.-এর একটি উদ্ধৃতি তার যোগসূত্র থেকে আলাদা করে উল্লেখ করেছেন। এর মাধ্যমে কৌশলকে অভ্যাস বানানো নিষিদ্ধ হবার ব্যাপারে দলিল দেয়ার চেষ্টা করেছেন। যে উদ্ধৃতিটি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল:

”واعلم أن مثل هذا الحكم إنما يراد به أن لا يجري الرسم به وألا يعتاد تكسب ذلك الناس لا ألا يفعل شيئ منه أصلا ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لبلال: بع التمر ببيع آخر ثم اشتربه.“

আমার মনে হচ্ছে এখানে যেহেতু বলা হয়েছে "এই হুকুমের মর্মার্থ হল, একে অভ্যাস বানানো যাবে না" তাই তারা কোন চিন্তাভাবনা না

করেই এটাকে উদ্ধৃত করেছে। এখানে 'هـــذا الحكـــم' বলে কোন দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? পুরো উদ্ধৃতির মর্মার্থ বা উদ্দেশ্য কী? প্রকৃত পক্ষে হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহ. 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' নামক কিতাবটি শরয়ী আহকামসমূহের রহস্য বর্ণনার জন্য লিখেছেন। উল্লেখিত উদ্ধৃতির পূর্বে তিনি ربا الفضل বর্ধিতাংশের সুদ হারাম হওয়ার রহস্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, একই ধরণের জিনিসে ভাল এবং মন্দকে পার্থক্য করে শুধু ভালোটা ব্যবহার করার মানসিকতা বিলাসিতার পরিচায়ক, তাই শরীয়ত ঐ একই জিনিসগুলোর মধ্যে (গম, জব, খেজুর ইত্যাদিতে) ভালো মন্দের পার্থক্যকে বিনাশ করে নির্দেশ দিয়েছে যে, এসব জিনিসগুলো পরস্পর সমান সমান করে বিক্রয় করতে হবে, যাতেকরে এটা স্পষ্ট হয় যে, শুধু ভালো জিনিস ব্যবহার করার মানসিকতা শরীয়তে পছন্দনীয় নয়। আদেশটি এজন্যই দেয়া হয়েছে যাতে মানুষ সবসময় ভালো জিনিসের চিন্তায় পড়ে না থাকে এবং এটাকে অভ্যাসে পরিণত করে না ফেলে। কিন্তু এর উদ্দেশ্য এটা নয় যে, ভালো জিনিসের ব্যবহার একেবারে নাজায়েয। তাই কোন জায়েয পন্থায় যদি কোন ভালো জিনিস অর্জিত হয় তাহলে তাতে গুনাহ হবে না। যেমন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত বেলাল রাজি.কে বলেছেন, অনুন্নত মানের খেজুর দেরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করে সেই দেরহাম দিয়ে উন্নতমানের খেজুর কিনে নাও। তৎকালীন সময়ে যেহেতু দেরহামের বিনিময়ে বেচাকেনার প্রচলন কম ছিল এবং মানুষ জিনিসের বিনিময়ে জিনিসের বেচাকেনা করত, তাই উন্নতমানের জিনিসের বেচাকেনা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। হযরত শাহ সাহেব রহ.-এর উদ্ধৃতিটি পুরো পড়লে এই উদ্দেশ্যটি বুঝে আসবে। তিনি বলেন:

" والثاني: ربا الفضل، والأصل فيه الحديث المســتفيض ((الــذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بــالتمروالملح بالملح مثلا بمثل وسواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعــوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد)) وهو مسمى بربا تغليظا وتشبيها له بالربــا الحقيقي على حد قوله عليه السلام ((المنجم كاهن)) وبه يفهم معنى قوله

صلى الله عليه وسلم ((لاربا إلا في النسيئة)) ثم كثُر في الشرع استعمال الربا في هذا المعنى حتى صارحقيقة شرعية فيه أيضا ـــ والله أعلم

وسرالتحريم أن الله تعالى يكره الرفاهية البالغة كالحرير والإرتفاقات المحوجة إلى الإمعان في طلب الدنيا كآنية الذهب والفضة وحليّ غيرمقطع من الذهب وكالسوار والخلخال والطوق، والتدقيق في المعيشة والتعمق فيها، لأن ذلك مراد لهم في أسفل السافلين صارف لأفكارهم إلى ألوان مظلمة، وحقيقة الرفاهية طلب الجيد من كل ارتفاق والإعراض عن رديئه والرفاهية البالغة اعتبار الجودة والرداءة في الجنس الواحد.

وتفصيل ذلك أنه لا بد من التعيش بقوت مّا من الأقوات والتمسك بنقد مّا من النقود، والحاجة إلى الأقوات جميعها واحدة، ومبادلة إحدى القبيلتين بالأخرى من أصول الارتفاقات التي لا بد للناس منها، ولاضرورة في مبادلة شيئ بشيئ يكفي كفايته، ومع ذلك فأوجب اختلاف أمزجتهم وعاداقم أن تتفاوت مراتبهم في التعيش، وهو قوله تعالى((نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا)) فيكون منهم من يأكل الأرزوالحنطة ومنهم من يأكل الشعيروالذّرة ويكون منهم من يتحلّى بالفضة ـــ

وأما تميّز الناس فيما بينهم بأقسام الأرز والحنطة مثلا واعتبارفضل بعضها على بعض وكذلك اعتبا ر الصناعات الدقيقة في الذهب وطبقات عياره فمن عادة المسرفين والأعاجم والإمعان في ذلك تعمّق في الدنيا، فالمصلحة حاكمة بسدّ هذا الباب. وتفطّن الفقهاء أن الربا المحرم يجري في غيرالأعيان الستة المنصوص عليها، وأن الحكم متعد منها إلى كل ملحق

بشيئ منها، ثم اختلفوا في العلة (إلى قوله......) واعلم أن مثل هذا الحكم إنما يراد به أن لا يجري الرسم به وإلا يعتاد تكسب ذلك الناس لا ألا يفعل شيئ منه أصلا ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لبلال: بع التمر ببيع آخرثم اشتربه." —(حجة الله البالغة ج:٢ ص:٢٨٤—٢٨٧ ط: قديمي)

লক্ষ্য করুন! এই উদ্ধৃতির সাথে আমাদের আলোচ্য মাসআলার কী সম্পর্ক? শুধু এ কথা দেখে যে, শাহ সাহেব রহ. কোন জিনিসের অভ্যাস থেকে বাঁচানোকে হুকুমের রহস্য বলে গণ্য করেছেন– এমন একটি অসম্পূর্ণ উদ্ধৃতি তার যোগসূত্র থেকে পৃথক করে উল্লেখ করা হয়েছে। একটু চিন্তা করা হয়নি যে, এখানে তিনি কৌশলকে অভ্যাসে পরিণত করার মাসআলার কথা উল্লেখই করেননি; বরং তিনি এক শ্রেণীভূক্ত জিনিসের পারস্পরিক বিনিময়কালে কম বেশী করার কথা উল্লেখ করেছেন। শরীয়ত যেহেতু এটা পছন্দ করে না তাই এটাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

জানা থাকা দরকার যে, হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহ. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা নামক কিতাবটি শরীয়তের আহকামসমূহের হেকমত ও রহস্য বর্ণনার জন্য লিখেছেন। আর হেকমতের বিষয় হল, প্রথমত: তা কুরআন-সুন্নাহ'র অকাট্য উদ্ধৃতি নয়, তাই এতে বিভিন্ন মত থাকতে পারে। দ্বিতীয়ত: হেকমতের উপর হুকুমের ভিত্তি কখনোই হয় না। হযরত শাহ সাহেব রহ. তার কিতাবের ভুমিকাতেই বিষয়টি স্পষ্ট করে বলেছেন:

نعم كما أوجبت السنة هذه وانعقد عليها الإجماع فقد أوجبت أيضا أن نزول القضاء بالإيجاب والتحريم سبب عظيم في نفسه مع قطع النظرعن تلك المصالح لإثابة المطيع وعقاب العاصي .... وأوجبت أيضا أنه لايحل أن يتوقف في امتثال أحكام الشرع إذا صحت بها الرواية على معرفة تلك المصالح. (حجة الله البالغة ج:١ ص:٣٢—٣٣)

"হ্যা! সুন্নাহ যেভাবে এ বিষয়টি ওয়াজিব করেছে এবং এর উপর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেভাবেই এটাও ওয়াজিব করেছে যে, কোন

জিনিসের মুবাহ বা হারাম হওয়ার সিদ্ধান্ত আসাটা কৌশল বা হেকমতের কারণে নয়; বরং আনুগত্য স্বীকারকারীকে সওয়াব ও অমান্যকারীকে আযাব দেয়ার কারণে হয়। এটাও ওয়াজিব করেছে যে, শরীয়তের আহকাম যখন কোন সহীহ বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় তখন তা পালন করার জন্য হেকমতের উপর নির্ভরশীল হওয়া হালাল নয়।"

হযরত শাহ সাহেব রহ.-এর বর্ণিত হেকমতগুলোকে যদি আহকামের ভিত্তি বলে ধরেও নেয়া হয় তাহলে তিনি সুদের আলোচনায় এর হারাম হওয়ার হেকমত সম্পর্কে যা বলেছেন তা হল:

"وكذلك الربا، وهوالقرض على أن يؤدي إليه أكثرأو أفضل مما أخذ سحت باطل فإن عامة المقترضين بهذا النوع هم المفاليس المضطرون، وكثيرا مّا لا يجدون الوفاء عند الأجل فيصيرأضعافا مضاعفة لايمكن التخلص منه أبدا." —(أيضا ج:٢ ص: ٢٨٣)

"অনুরূপ সুদ, যার প্রকৃতি হল- সেখানে এ শর্তে ঋণ দেয়া হয় যে, ঋণগ্রহীতা যা নিয়েছে তার থেকে বেশী বা উত্তম আদায় করবে, এটা হারাম ও বাতিল। কেননা, এধরণের ঋণগ্রহীতা সাধারণত গরীব শ্রেণীর লোকেরাই হয়ে থাকে। অধিকাংশ সময় এমন হয় যে, মেয়াদ শেষে তাদের কাছে আদায়ের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ থাকে না, এতেকরে সুদ দ্বিগুন-বহুগুন বাড়তে থাকে, যা থেকে কখনো পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব হয় না।"

উল্লেখ্য, এই উদ্ধৃতির কারণে বলা যাবে না যে, ঋণগ্রহীতা যদি ধনী হয় এবং সময়মত আদায় করার সামর্থ্যবান হয়, তাহলে তার কাছ থেকে সুদ নেয়া জায়েয হবে। তাই হেকমত আলোচনায় কোন ইঙ্গিত থেকে কোন ফিক্বহী মাসআলা নির্গত করা মূলনীতি বিরোধী।

মোট কথা, ফুক্বাহায়ে কেরাম যেসব কৌশলকে জায়েয বলেছেন, অন্য মাধ্যম থাকাবস্থায় সেগুলোকে কাজে লাগানো শোভনীয় নয়, আবার এগুলোকে হারাম বলাও ভুল হবে। বিশেষত সেসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, যাদের কাছে অন্য উপকরণ বা মাধ্যম থাকে না। সুতরাং, কোন দ্বীনি মাদরাসা সমস্ত শর্ত পূরণপূর্বক তামলীকের কৌশলের উপর পরিচালিত হলে এবং তাকে রীতিতে পরিণত করলে কেউ তা নাজায়েয

বলেন না। আমরা শুরুতেই জামেয়াতুল উলুম আল ইসলামীয়া বিন্নুরী টাউনের দারুল ইফতার একটি ফতোয়া উল্লেখ করেছিলাম, যেখানে এমন একটি কৌশল অনুমোদিত হয়েছে, যাকে নিদেন পক্ষে সন্দেহজনক বলতেই হয়; বরং তাতে নাজায়েয হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।

এমনিভাবে হিন্দুস্তানে মুসলমানদেরকে ঋণসহযোগীতা প্রদানের জন্য কিছু প্রতিষ্ঠান কায়েমের চেষ্টা করা হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে একটি প্রস্তাব আকাবির উলামাদের সামনে উপস্থাপিত হয়েছে। উক্ত প্রস্তাব এবং এ সম্পর্কে নিকট অতীতের আকাবির উলামায়ে দেওবন্দের একটি ফতোয়া কেফায়েতুল মুফতী থেকে উদ্ধৃত করা হল:

"**প্রশ্ন:** যদি এমন কোন কমিটি করা হয় যার উদ্দেশ্য মুসলমানদের অর্থনৈতিক অবস্থার সংশোধন, মহাজনদের জুলুম থেকে বাঁচানো এবং এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে মুসলমানদেরকে সুদবিহীন ঋণ প্রদান করে ও নিম্নোক্ত মূলনীতির নির্ধারণ করে, তাহলে কি তা জায়েয হবে?

এক. কমিটি একটি কাগজ তৈরী করে যার মূল্য ঋণের পরিমাণ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেমন, দশ টাকার জন্য ৪ (আনা), পঁচিশ টাকার জন্য ৮(আনা), পঞ্চাশ টাকার জন্য ১৬(আনা অর্থাৎ, এক টাকা) ইত্যাদি। যেভাবে সরকারী স্ট্যাম্পের উপর চুক্তি লেখা হয়; সুদবিহীন হলেও।

দুই. যে ব্যক্তি কমিটির কাছ থেকে এই কাগজ কিনবে তাকে কমিটি চাহিদা অনুযায়ী ঋণ প্রদান করবে।

তিন. কমিটি একজন রেজিষ্ট্রার নির্ধারণ করে, যার কাছে ঐ চুক্তি রেজিষ্ট্রি করা হয়। এর জন্য সামান্য কিছু টাকা ঋণগ্রহীতাকে রেজিষ্ট্রারের কাছে পরিশোধ করতে হয়, যা থেকে রেজিস্ট্রারের অফিস খরচ মেটানো হয়।

চার. কমিটি আরেকটি নিয়ম করেছে যে, কোন ঋণ এক বছরের বেশী মেয়াদের হবে না। এক বছরের বেশী সময় কেউ ঋণ নিজের কাছে রাখতে চাইলে তা নতুন ঋণ হিসেবে গণ্য হবে এবং একে ১ ও ২ নম্বর হিসেবে ধরে নেয়া হবে (অর্থাৎ, দ্বিতীয়বার কাগজ কিনতে হবে)।

এখন প্রশ্ন হল, এসব নিয়ম নীতির মাধ্যমে এ কমিটি প্রতিষ্ঠা করা শরীয়ত মতে জায়েয কি না? লেনদেনটি সঠিক কি না?

ফতোয়া প্রার্থী

(মাওলানা) আব্দুস্‌সামাদ রহমানী (মুঙ্গিরী)

মাওলানা সহুল উসমানী রহ. এর উত্তর

কমিটি মুসলমানদের জন্য খুবই উপকারী। এখানে শরয়ীভাবে কোন খারাবী নেই। লেনদেনটি শরীয়ত মতে জায়েয। কমিটি কাগজ বিক্রি করে ঋণ দেয়া 'بيــع جرمنفعــة' অর্থাৎ, লাভজনক বেচাকেনা হিসেবে হবে; 'قــرض جرمنفعــة' অর্থাৎ, লাভজনক ঋণ হিসেবে নয়। যেমন ফতোয়া শামী'র ৪র্থ খন্ডের ১৯৪ নং পৃষ্ঠায় আছে:

"فإن تقدم البيع بأن باع المطلوب معه المعاملة من الطالب ثوبا قيمتــه عشرون دينارا بأربعين دينارا ثم أقرضه ستين دينارا أخرى حتى صارله على المستقرض مائة دينار وحصل للمستقرض ثمانون دينارا ذكرالخصاف أنــه جائز — وهذا مذهب محمدبن سلمة إمام (إلى أن قال) وكان شمس الأئمــة الحلواني يفتي بقول الخصاف وابن سلمة ويقول: هذا ليس بقرض جرمنفعة بل هذا بيع جرمنفعة وهو القرض" ـــ انتهى مختصرا ـــ

মুহাম্মদ সহুল উসমানী
প্রিন্সিপ্যাল, মাদরাসা শামসুল হুদা, পাটনা
১৪ রবিউল আউয়াল, ১৩৪৫হিঃ।

(উল্লেখ্য হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সহুল উসমানী রহ. হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.-এর খুব ঘনিষ্ট ছাত্রদের একজন ছিলেন)

উত্তরদাতা সঠিক

–মুহাম্মদ উসমান গণি, নাযেম ইমারতে শরইয়্যা, প্রদেশ বাহার ওয়াড়িসা পহলওয়ারী শরীফ, পাটনা।

২৬-৩ ৪৫হিঃ

উত্তরদাতা ঠিক বলেছেন

–সৈয়্যদ মুহাম্মদ ক্বাসেম রহমানী।"

হযরত মাওলানা সৈয়্যদ হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. এই ফতোয়ার সত্যায়ন করেছেন এভাবে:

"এভাবে এই কমিটি জায়েয। আমি যতদুর বুঝি এখানে শরয়ী কোন বাধা নেই। তাই এভাবে মুসলমানদের খোজখবর নেয়ার কারণে অনেক সওয়াবের আশা করা যায়। ॥আল্লাহই ভাল জানেন॥

–হুসাইন আহমদ (শায়খুল হিন্দের স্থলাভাষিক্ত)"

আগ্রা'র মুফতী নেসার আহমদ রহ. এতে কিছু সংযোজন করেছেন:

"জিজ্ঞাসিত পদ্ধতিতে মুসলমানদের উন্নতির লক্ষ্যে কমিটি তৈরী করা অন্যভাবে বললে মজলিসও বলা যায়- একটি প্রশংসনীয় কাজ। এখানে নাজায়েয হওয়ার কোন কারণ জানা নেই। মূল্য দিয়ে কমিটির কোন কাগজ খরিদ করতে কোন অসুবিধা নেই। ব্যবসায় কাগজ এক লাখ টাকা নিয়েও বিক্রয় কর যায়। ফাতহুল ক্বাদীরে আছে: 'ولو باع كاغذة بـألف يجوز ولا يكره' কুরআনে কারীমে আছে: ((ولا تأكلوا امـوالكم بيـنكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم)) কাগজ মালের সংজ্ঞাভুক্ত। বাহরুর রায়েক্বে আছে: 'ما يميل إليه الطبع ويمكن إدخاره' কাগজ এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। কমিটি নিজের স্থায়িত্ব ও সুদৃঢ়করণের জন্য কোন আইন তৈরী করলে যতক্ষণ তা শরীয়তবিরোধী না হবে ততক্ষণ তার সবই জায়েয। ॥আল্লাহই ভাল জানেন॥

–নেসার আহমদ
মুফতী, আগ্রা জামে মসজিদ
৬নভেম্বর ১৯৬৫ইং, জুমাবার।"

হযরত মাওলানা সানাউল্লাহ রহ. অমৃতসরী এর উপর লিখেছেন:

'إنما الأعمال بالنيات' হিসেবে তাদের নিয়ত শুভ। তাই জায়েয।

–মুফতী আবুল ওয়াফা সানাউল্লাহ, অমৃতসর।

তবে হযরত মুফতী কেফায়েতুল্লাহ রহ. সতর্কতা অবলম্বন করে কাগজের বিক্রয়লব্ধ টাকা এবং রেজিস্ট্রি ফি শুধু দাফতরিক কাজে সীমাবদ্ধ রাখার এবং বেঁচে যাওয়া অর্থ সদকা করে দেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু এটা এজন্যই যে, কমিটি মানুষের চাঁদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি বলেন:

"هوالموفــق: এই কমিটির পুঁজি সম্ভবত চাঁদা থেকে অর্জিত হবে। অতএব, ঐ কাগজের মূল্যের মুনাফা এবং রেজিস্ট্রি ফিসের বেঁচে যাওয়া অর্থ যদি শুধু দাফতরিক কাজের জন্য ব্যয় করা হয়, পুঁজিদাতাদের অংশ অনুযায়ী ভাগ করে দেয়া না হয়, আইনগতভাবে তাদেরকে তা চাওয়ার অধিকারও দেয়া না হয়, অতিরিক্ত মুনাফাকে কখনো যদি পুঁজিদাতাদের হক সাব্যস্ত করা না হয়; বরং কমিটির কার্যক্রম শেষ হলে অবশিষ্ট লভ্যাংশ গরিবদের মাঝে বিতরনের নিয়ম করা হয় এবং ঋণ থেকে লাভবান হয় এমন কোন পদ্ধতি না থাকে, তাহলে তাতে কোন অসুবিধা আছে বলে মনে হয় না। ॥আল্লাহই ভাল জানেন॥

–মুহাম্মদ কেফায়েতুল্লাহ, মাদরাসা আমিনীয়া, দিল্লী।" –(কেফায়েতুল মুফতী খন্ড:৮ পৃ:১৩০-১৩১)

উল্লেখ্য, এখানে ঋণ দেয়ার জন্য একটি কাগজের বিপরীতে তার প্রকৃত মূল্যের তুলনায় বেশী উসুল করা, কাগজের দাম ঋণের পরিমাণ অনুসারে বৃদ্ধি করা এবং বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও ঋণ আদায় করা না হলে পূণরায় কাগজ কেনা জরুরী করে দেয়া ইত্যাদি- সবকিছুই কৌশল। এসব বুযুর্গ ব্যক্তিগণ এই কৌশলকে শুধু জায়েযই মনে করেননি; বরং হযরত মাদানী রহ. এটাকে কমিটির পৃথক কর্মপন্থা সাব্যস্ত করে বলেছেন, মুসলমানদের খোঁজখবর নেয়ার কারণে অনেক সওয়াবের আশা করা যায়। অতএব, এরই ভিত্তিতে পরবর্তীতে 'মুসলিম ফান্ড' প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানেও প্রশ্ন উঠেছিল, এভাবে কাগজ ক্রয় বিক্রয়ের হুকুম কী হবে? কোন কোন আলেম আপত্তি উত্থাপন করে বলেছিলেন, এটা শরীয়ত মতে জায়েয হবে না, এটি একটি নাজায়েয কৌশল। এর উত্তরে হযরত মাওলানা মুফতী মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহী রহ. লেখেন:

"আর্থিক লেনদেনে একই শ্রেণীভুক্ত জিনিসে হলেও একপক্ষ যদি বেশী পায় তাহলে তা দুই প্রকার। কোন সময় এ অতিরিক্ত অংশ হারাম হয়, আবার কোন সময় হালাল। হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে উত্তম খেজুর আনা হলে হুজুর জিজ্ঞাসা করলেন 'ওখানে সব খেজুরই কি এ রকম?' বলা হল, না! দুই সা' সাধারণ খেজুর দিয়ে এক সা' উন্নতমানের খেজুর নেয়া হয়। হুযুর বললেন, এটা সুদ হবে।

মাশহুর হাদীসে ছয় জিনিসের ব্যাপারে বলা হয়েছে, مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا । এখানে খেজুরও আছে। পরে তিনি পদ্ধতি শিখিয়ে দেন যে, উন্নতমানের খেজুর তোমরা মুদ্রার বিনিময়ে খরিদ করো। যেমন, এক টাকায় এক সা'। আবার বিক্রেতা ঐ টাকার বিনিময়ে তোমাদের কাছ থেকে দুই সা' খেজুর নিয়ে নিবে। কাজতো সেটাই- একদিকে এক সা' অন্যদিকে দুই সা'– যা নিষিদ্ধ। কিন্তু এক সা' ও দুই সা'-এর লেনদেনটি সরাসরি করা হয়নি; বরং উভয় দিক থেকে টাকার বিনিময়ে খেজুর কেনা হয়েছে।

হযরত ইমাম বুখারী রহ. কিতাবুল হিয়ালে قال بعض الناس বলে কিছু আপত্তি উত্থাপন করেছেন। তিনি পরিণতি লক্ষ্য করেছেন, মাঝখানে কি প্রতিবন্ধকতা ছিল তা গভীরভাবে চিন্তা করেননি। বেচাকেনার মূল্য তাই সাব্যস্ত হয় যা দু'পক্ষের সন্তুষ্টির ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। হুযুর পাক সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাতাইশ উটের বিনিময়ে একটি চাদর খরিদ করেছিলেন।

কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সুদ থেকে বাঁচার নিয়ত করে যদি তা প্রকাশ করে তাহলে তার প্রকাশিত মতের বিপরীতে মত কায়েম করার কি কারো অধিকার আছে? هلا شققت قلبه؟ হাদীসে আছে لكل امرئ ما نوى। ফিকাহ'য় আছে: 'الأمور بمقاصدها'। তাই সুদ নেয়ার জন্য কোন চেষ্টা বা কৌশল অবলম্বন করা নিষিদ্ধ, আর সুদ থেকে বাঁচার জন্য চেষ্টা ও কৌশল অবলম্বন করা সঠিক। নামাযের মত প্রধান ইবাদতও নিয়ত অশুদ্ধ হবার কারণে মুখের উপর নিক্ষেপ করা হবে এবং এর ফল হিসেবে ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই মিলে না। কুরআনে বলা হয়েছে 'فويل للمصلين'। অনুরূপভাবে হিজরতও গ্রহণযোগ্য হয় না। যে ব্যক্তি সুদ থেকে বাঁচতে চায় সে সওয়াব পাবে। লেনদেন দু'টি হলে, এক: ঋণ, যার সম্পর্ক টাকা ও বন্ধকের সাথে, দুই: বেচাকেনা, যার সম্পর্ক কাগজ ও ফরমের সাথে, দুটো সঠিক হলে পুরোটাকে সঠিক বলার সুযোগ আছে। যেমন- হযরতে

আক্বদাস মাওলানা থানভী রহ. হাওয়াদিসুল ফাতাওয়া'র ২য় অংশে ১৫৫ পৃষ্ঠায় এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন:

(উত্তর) মানি অর্ডার দুই লেনদেনের সমষ্টিতে হয়। এক: ঋণ- যা মূল টাকার সাথে সম্পৃক্ত, দুই: ইজারা- যা ফরম পূরণ ও প্রেরণের ফিস হিসেবে নেয়া হয়। এ দু'টিই পৃথকভাবে জায়েয আছে, সুতরাং, দু'টি সমষ্টিগতভাবেও জায়েয হবে। আর যেহেতু এর সাথে মানুষের ব্যাপক সম্পৃক্ততা আছে তাই এই ব্যাখ্যা করে এটাকে জায়েয বলা উচিৎ।

তারিখঃ ৯ শাওয়াল ১৩৩২ হিজরী।

যদি صفقة في صفقة অর্থাৎ, এক লেনদেনের মধ্যে আরেক লেনদেন হচ্ছে- এই আপত্তি তোলা হয়, তাহলে তো মানি অর্ডারেও এমনটি হয়। অন্যদিকে 'মুসলিম ফান্ড' থেকে টাকা নেয়ার ক্ষেত্রেও দু'টি লেনদেন হয়। এক: رهن بالقرض বা قرض بالرهن অর্থাৎ, বন্ধক দিয়ে ঋণ বা ঋণ দিয়ে বন্ধক, এর সম্পর্ক টাকার সাথে আর বন্ধকী জিনিস স্বর্ণালংকার ইত্যাদি হয়। দুই: বেচাকেনা, এর সম্পর্ক কাগজ, ফরম ও চুক্তিনামা ইত্যাদির সাথে। উভয় লেনদেন পৃথকভাবে জায়েয আছে। তাই সম্মিলিতভাবেও জায়েয হবে।

তবে ফরমের দাম অনেক বেশী। কিছু জিনিস এমন যার প্রকৃত মূল্যমান কম হলেও কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে তার দাম বেড়ে যায়। যেমন, সরকারী স্ট্যাম্প বিভিন্ন মূল্যের হয়ে থাকে। এগুলো বাস্তবে এত দামী না হলেও এগুলোর মাধ্যমে বিচারিক কার্যক্রম পরিচালিত হয় বিধায় দাম বেশী। অনুরূপভাবে এই ফরমগুলোর প্রকৃত মূল্য যত কমই হোক যেহেতু এগুলোর মাধ্যমে ঋণ ও বন্ধকের লেনদেন সহজে সম্পাদিত হয়, তাই এর দাম বৃদ্ধিতে কোন আপত্তি উত্থাপনের সুযোগ নেই।

হযরত থানভী রহ. মানি অর্ডার জায়েয হওয়ার আরেকটি কারণ বলেছেন, জনসাধারণের ব্যাপক সম্পৃক্ততা। কিন্তু তা প্রথম কারণ –অর্থাৎ দু'টি ভিন্ন জায়েয লেনদেন সমষ্টিগতভাবেও জায়েয– এর মাধ্যমে জায়েয হয়ে গেছে। দ্বিতীয় কারণ অর্থাৎ, জনগনের ব্যাপক সম্পৃক্ততা হারামকে হালাল করতে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। তাই বুঝা গেল, ব্যাপক সম্পৃক্ততা কারণ হিসেবে নয়; বরং হেকমত হিসেবে উল্লেখ কর

হয়েছে। আসল কারণ হল প্রথমটিই, অর্থাৎ দু'টি পৃথক লেনদেন।" -(ফতোয়া মাহমুদিয়া খন্ড:৪ পৃ:২২৪-২২৬ প্র: ক্বাদীম)

এ সকল আলোচনার সার সংক্ষেপ হল, সুদ থেকে বাঁচার জন্য কোন কৌশল অবলম্বন করা হলে হানাফী ফিক্বহবিদগণ তাকে পরিপূর্ণ জায়েয বলেন। সুদবিহীন ব্যাংক ব্যবস্থায় এমন কোন কৌশল গ্রহণ করা হয় না যাকে 'ঈনা' বলা হয়। এমনকি قلب الدين বা ঋণ পরিবর্তনের যে কৌশলকে ইমাম আবু হানিফা রহ. ও ইমাম মুহাম্মদ রহ. স্পষ্টভাবে জায়েয বলেছেন, তাও সুদবিহীন ব্যাংকিংয়ে ব্যবহার করা হয় না। যেসব কৌশল সেখানে গৃহিত হয়ে থাকে তা শরীয়তের জায়েয সীমারেখার মধ্যে থেকে হয়ে থাকে। এগুলোকে নাজায়েয বলা ফুক্বাহায়ে কেরামের উপরোক্ত উদ্ধৃতিসমূহের আলোকে মোটেই ঠিক নয়।

মুরাবাহা'র বাস্তব কর্মপদ্ধতি

ইতোপূর্বে আলোচনায় এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, মুরাবাহা মুয়াজ্জালায় যেখানে ক্রেতা বিক্রেতার উদ্দেশ্য থাকে প্রকৃত বেচাকেনা, তাকে মৌলিকভাবে কোন কৌশল বলা যাবে না; বরং এটা বেচাকেনারই একটা প্রকারভেদ, যা জায়েয হবার ব্যাপারে উম্মতের অধিকাংশ ফিক্বহবিদগণ ঐক্যবদ্ধ।

তবে সুদবিহীন ব্যাংকিংয়ের কার্যক্রমে এটাকে দেখতে কৌশলের মত মনে হবার কারণ হল– ব্যাংকের নিজের গুদামে কোন মাল থাকে না, সে কোন একটি জিনিসের ব্যবসা করে না; বরং তার কাছে বিভিন্ন জিনিসের খরিদদার আসে, যে জিনিসের খরিদদার তার কাছে আসে সেই জিনিস ব্যাংক কিনে তার কাছে বিক্রি করে এবং এই বেচাকেনার জন্য ঐ ব্যক্তিকেই নিজের প্রতিনিধি বানায়। প্রতিনিধি ব্যাংকের জন্য বাজার থেকে জিনিসটি ক্রয় করে ব্যাংকের কাছ থেকে তা বাকীতে ক্রয় করে। এখন দেখার বিষয় হল, এই দুই কারণে এই লেনদেনকে কি নাজায়েয কৌশল বলা যাবে?

ব্যাংকের কাছে মাল থাকে না; বরং কোন গ্রাহক আসলে তা ক্রয় করে গ্রাহকের কাছে বিক্রয় করে– এ কাজটি সম্পর্কে বলতে হয়, ব্যাংক যদি তার মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণে নিয়ে জিনিসটি বিক্রয় করে, তাতে ফিক্বহী দিক থেকে কোন আপত্তি থাকতে পারে না। দেওবন্দে আমার মহান পিতা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ.-এর কাছে এই প্রশ্নটি করা হয়েছিল। নিম্নে প্রশ্ন ও উত্তরটি উদ্ধৃত হল।

"প্রশ্ন (৭৩৫) বর্তমান সময়ে ব্যবসা বাণিজ্যে একটি সাধারণ নিয়ম পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, মানুষ নিজেদেরকে ব্যবসায়ী বলছে, কোন কোন জিনিসের ব্যবসাও করছে, অথচ তাদের নিয়মিত কোন দোকান নেই। কারো কাছ থেকে কোন অর্ডার আসলে বাজার থেকে সেই মাল খরিদ করে এর উপর নিজের লাভসহ হিসাব করে ক্রেতার কাছে পাঠিয়ে দেয়। এধরণের মুনাফা কি জায়েয হবে?

(উত্তর) যদি এতে কোন ধোকাবাজী করা না হয় এবং এটাই এখানকার বাজার মূল্য- এ রকম বলা না হলে মুনাফাটি জায়েয হবে। তবে বেশী

মুনাফা ধরে উচ্চমূল্যে বিক্রয় করা মানবিকতা পরিপন্থী। তাই এটা শুভ নয়। ফতোয়া বাযযাযীয়াতে কোন কোন হানাফী ইমামকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, উচ্চমূল্যে বিক্রয় করা মাকরূহ।" -(ইমদাদুল মুফতীয়ীন পৃ:৮৪৪)।

ওকালত বা প্রতিনিধিত্বের মাসআলা

এখন দেখা দরকার, ক্রেতাকে তার নিজের জন্য ক্রয় করতে প্রতিনিধি বানানো কেমন?

এখানে প্রথমেই পরিস্কার করে নেয়া উচিৎ যে, গ্রাহককে প্রতিনিধি বানানোর পদ্ধতি সবসময় অবলম্বন করা হয় না। অনেক ক্ষেত্রে ব্যাংক সরাসরি ক্রয় করে গ্রাহকের কাছে বিক্রয় করে। সুদবিহীন ব্যাংকসমূহের শরীয়া বোর্ডগুলো নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানকে খুবই জোর দিয়ে বলে যে, গ্রাহককে প্রতিনিধি না বানিয়ে যতটুকু সম্ভব সরাসরি কিনতে। এখন ধীরে ধীরে এটা প্রাধান্য লাভ করছে। আরেকটি উল্লেখযোগ্য কথা হল, ১৯৮২ ইং সনে অনুষ্ঠিত 'মজলিসে তাহক্বীকে মাসায়িলে হাজেরা'র বৈঠকে এ কর্মপদ্ধতির উপর গভীর চিন্তা ভাবনা করা হয়। বিষয়টি রেজুলেশনে স্থান না পেলেও হযরত মাওলানা মুফতী রশীদ আহমদ রহ. মজলিসের সিদ্ধান্ত আহসানুল ফাতাওয়াতে প্রকাশকালে টিকায় নোট আকারে লিখেন: "মজলিস এটাও সংযোজন করেছিল যে, ব্যাংক তার এজেন্টকর্তৃক নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের সত্যায়নের জন্য নিজের কোন প্রতিনিধি পাঠাবে, যিনি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সার্টিফিকেট দিবেন। বিষয়টি সম্ভবত ভুলে লেখায় আসেনি।" -(আহসানুল ফাতাওয়া খন্ড:৭ পৃ:১১৯)

হযরত মাওলানা মুফতী আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব হযরত মুফতী সাহেব মরহুমের এই কথার ভিত্তিতে বলেছেন, "যেহেতু এর উপর কাজ করা হচ্ছে না, তাই ব্যাংকের এই কার্যক্রমের উপর ভরসা না রাখতে পারাটাই স্পষ্ট।" -(জাদীদ মাআশী মাসায়িল পৃ:১৫৮)

মজলিসটি যেহেতু দীর্ঘদিন আগে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এই একটি লেখা ছাড়া অন্য কোন রেকর্ডও নেই, তাই দায়িত্ব নিয়ে কিছু বলাতো মুশকিল। তবে আমার যতটুকু মনে পড়ে, আলোচনা এ রকম ছিল না যে, ব্যাংকের কোন প্রতিনিধি নিয়ন্ত্রণের সত্যায়ন করবে; বরং আলোচনা এ

রকম ছিল, সে নিজে গিয়ে কেনাবেচা করবে অর্থাৎ, প্রতিনিধি বানানোর প্রয়োজন হবে না। কথাটি আলোচনায় অবশ্যই এসেছে, তবে এটাকে আবশ্যকীয় শর্ত মনে করা হয়নি এবং প্রতিনিধি বানানোর অনুমতি দেয়া হয়েছে বিধায় তা লেখায় উল্লেখ করা হয়নি। যখন সবাই এর উপর স্বাক্ষর করেছিলেন তখন কেউ এর উপর আপত্তি উত্থাপন করেননি। যদিও লেখার সিদ্ধান্ত হয়ে ভুলে লেখা না হয়, তবুও লেনদেনটি জায়েয হওয়া যে এর উপর নির্ভরশীল নয়, তা স্পষ্ট। তবে মানসিক প্রশান্তি ও নিশ্চয়তা লাভের জন্য তার উল্লেখ মুখ্য হতে পারে। আর এই নিশ্চয়তা অন্য কোনভাবে অর্জিত হলেও এই মাসআলার শরয়ী অবস্থানে কোন হেরফের হবে না। এখন এই নিশ্চয়তা হাসিলের জন্য সুদবিহীন ব্যাংকের তত্ত্বাবধায়কগণ এ বিষয়ের উপরও গুরুত্বারোপ করেন যে, যেখানে নিয়ন্ত্রণ সন্দেহজনক হয় সেখানে সে নিজে অথবা প্রতিনিধি পাঠিয়ে ক্রয় ও নিয়ন্ত্রণের নিশ্চয়তা বিধান করবে। কেননা, আসল কথা হল, যে জিনিসের উপর মুরাবাহা হচ্ছে, তা শুধু ব্যাংকের মালিকানাতে আসে তা নয়; বরং উকিল বা প্রতিনিধির মাধ্যমে তার নিয়ন্ত্রণও গ্রহণ করে। পরে প্রতিনিধি নিয়মতান্ত্রিকভাবে ইজাব-কবুলের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে ক্রয় করে। এ ক্ষেত্রে এর বৈধতার উপর কোন আপত্তি আসতে পারে, তা আমার বুঝে আসে না। অতএব, হযরত মাওলানা মুফতী হামিদুল্লাহ জান সাহেব- যিনি সুদবিহীন ব্যাংকিংয়ের বিপক্ষে ফতোয়া দিয়েছেন- তিনিও এর বৈধতা মেনে নিয়ে লেখেন:

"যদি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বাজার থেকে সরাসরি নিজের জন্য কিনে মালিকানা ও কব্জায় আসার পর তা আগ্রহী ব্যক্তিকে দিয়ে দিবে– এরূপ করতে না পারে, তাহলে সে ঐ আগ্রহী ব্যক্তির সাথে প্রতিনিধিত্বের চুক্তি করবে। এই চুক্তির ভিত্তিতে ব্যক্তিটি ঐ প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির প্রতিনিধি হিসেবে তার প্রার্থিত জিনিসটি মক্কেলের জন্য কিনে তার উপর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করবে। আবার তার কাছ থেকে নিজের প্রয়োজনে নতুন লেনদেনের মাধ্যমে নিজের জন্য কিনবে। এটা শরয়ী দৃষ্টিতে জায়েয। কিন্তু এটা জানা জরুরী যে, ঐ ব্যক্তির এখানে পৃথক দুটি অবস্থান ছিল, এভাবে যে, প্রথমত: সে প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসেবে বাজার থেকে তার মক্কেলের জন্য ক্রয় করে এবং বেচাকেনা শেষ হবার পর

জিনিসটি মক্কেলের মালিকানা ও কব্জায় দেয়। অতঃপর, তার প্রয়োজন হলে সে সম্পূর্ণ নতুন লেনদেনের মাধ্যমে পৃথক ইজাব-কবুল করে নিজের জন্য তা ক্রয় করে। দ্বিতীয় লেনদেনে সে আর প্রতিনিধি থাকবে না; বরং ক্রেতা হয়ে যাবে। যদি এই দুটি পৃথক অবস্থানের প্রতি লক্ষ্য রেখে লেনদেন করা হয়, তাহলে তা সঠিক হবে, অন্যথায় দুই লেনদেন একটিতে সমবেত হয়ে গেলে তা ফাসেদ বা অশুদ্ধ হয়ে যাবে।"–(হযরত মুফতী হামিদুল্লাহ জান সাহেবের ফতোয়া, পৃ:৭)

এই কর্মপদ্ধতির বৈধতা মৌলিকভাবে মেনে নিয়ে হযরত মুফতী হামিদুল্লাহ জান সাহেব যে কারণে একে নাজায়েয বলেছেন, তা হল: "এই চুক্তিতে 'ربح مالم يضمن' এর বড় রকমের ত্রুটি পাওয়া যায়। এটা এভাবে যে, গ্রাহকের সাথে ব্যাংকের লেনদেন تعاطي অর্থাৎ, ইজাব-কবুল বিহীন আদান প্রদানের ভিত্তিতে হয়।"–(পৃ:১৩)

বাস্তবতা কিন্তু এ রকম নয়। মুরাবাহার লেনদেন কখনো ইজাব-কবুল বিহীন আদান প্রদানের মাধ্যমে হয় না। দুঃখের বিষয় হল, সুদবিহীন ব্যাংকসমূহে যে পদ্ধতিতে মুরাবাহা করা হয় তার সম্পর্কে তাঁরা সঠিকভাবে অবগত না হওয়ায় অনেক ভুলবোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে। তাই আমরা এখন এই আলোচনা করব যে, আসলেই কি এই কর্মপদ্ধতির বাস্তবায়নে এমন কোন ত্রুটি আছে কি, যা বলা হয়েছে এবং যার কারণে একে নাজায়েয বলা হয়েছে? অতএব, আমরা এসব কথার প্রকৃতি এক এক করে আলোচনা করছি।

মুরাবাহা কি تعاطي ইজাব-কবুল বিহীন আদান প্রদানের মাধ্যমে হয়?

সবার আগে স্পষ্ট হওয়া দরকার যে, সুদবিহীন ব্যাংকসমূহে আসলেই কি মুরাবাহা 'তাআতী' বা ইজাব-কবুল বিহীন আদান প্রদানের মাধ্যমে হয়, যেমনটি হযরত মুফতী হামিদুল্লাহ জান সাহেব লিখেছেন? বাস্তবতা হল, সুদবিহীন ব্যাংকসমূহে 'তাআতী'র মাধ্যমে কখনো মুরাবাহা হয় না। আমার জানামতে এমন কোন সুদবিহীন ব্যাংক নেই যারা 'তাআতী'র ভিত্তিতে মুরাবাহা করে। হযরত মুফতী হামিদুল্লাহ জান সাহেব সম্ভবত ঐ

লেখার উপর ভরসা করেই লিখেছেন, যা পরবর্তীতে 'মুরাওয়াজা ইসলামী ব্যাংকারী' নামে প্রকাশিত হয়েছে। কেননা, ওখানে বলা হয়েছে যে, ইসলামী ব্যাংকসমূহে মুরাবাহা 'তাআতী' বা ইজাব-কবুলহীন আদান প্রদানের মাধ্যমে হয়। প্রশ্ন হচ্ছে, তাঁদের এই ভুলধারণা কীভাবে সৃষ্টি হলো? চিন্তা ভাবনা করার পর বুঝতে পারলাম যে, তাঁরা আমার একটি প্রবন্ধের ভুল উর্দূ অনুবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে এই ধারণা সৃষ্টি করেছেন যে, এসব ব্যাংকে 'তাআতী'র ভিত্তিতে মুরাবাহা সম্পাদিত হয়।

আসলে কুয়েতে একটি ফিকহী আলোচনা হয়েছিল, যেখানে আমাকে বাইয়ে তাআতী (ইজাব-কবুলহীন আদান প্রদানের মাধ্যমে বেচাকেনা) ও বাইয়ে ইস্তেজরার (বিক্রেতার কাছ থেকে অল্প অল্প নিয়ে মূল্য পরে পরিশোধ করা) বিষয়ে প্রবন্ধ রচনার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। যখন আমি এ বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করলাম, তখন 'তাআতী' জায়েয দেখে সুদবিহীন ব্যাংকগুলো মুরাবাহা'র মধ্যেও এর উপর কাজ করা শুরু করে দেয় কি না- আমার এমন আশংকা হল। যদিও মুরাবাহাতে 'তাআতী' জায়েয, তবুও ব্যাংকসমূহে এর ব্যবহারে অনেক ত্রুটির আশংকা ছিল। তাই আমি প্রবন্ধটিতে লিখেছিলাম: যদিও 'তাআতী'র মাধ্যমে বেচাকেনা হয়ে যায়, তবুও সুদবিহীন ব্যাংকসমূহে যে মুরাবাহা প্রচলিত আছে, তাতে 'তাআতী'র উপর আমল করা বিভিন্ন কারণে উচিৎ হবে না। আলোচনায় উপস্থিত সকলে এর সাথে একমত পোষণ করলেন। কথাটা এরকম ছিল না যে, সুদবিহীন ব্যাংকগুলো 'তাআতী'র ভিত্তিতে কাজ করে-এবং আমি আমার প্রবন্ধে তাদের এ কাজের সমালোচনা করেছি। বরং বাস্তবতা হল, শুধু এই আশংকার উপর ভর করে কথাটি লেখা হয়েছে যে, সহজপ্রিয়তার কারণে তারা যেন আবার 'তাআতী'র উপর আমল শুরু করে না দেন। সুতরাং, আমি উক্ত প্রবন্ধে কোথাও বলিনি যে, ইসলামী ব্যাংকসমূহে 'তাআতী'র মাধ্যমেই মুরাবাহা হয়; বরং বলেছি, ব্যাংকসমূহে যে মুরাবাহা প্রচলিত আছে, তাকে 'তাআতী'র ভিত্তিতে সম্পাদিত করা উচিৎ হবে না। আমার প্রবন্ধটি আরবী ভাষায় ছিল এবং আমার রচিত কিতাব بحوث في قضايا فقهية معاصرة তে প্রথম খন্ডে স্থান পেয়েছে। ভাষাটি ছিল এরকম:

'ومن هنا يظهر أن العمل بالتعاطي في عقود المرابحة الـــتي تجـــري في المصارف الإسلامية مما لا ينبغي.' -(بحوث في قضايا فقهية معاصرة ج:١ ص: ٥٦)

যার সঠিক অনুবাদ হচ্ছে: "এখান থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, আজকাল ইসলামী ব্যাংকসমূহে মুরাবাহা'র যে লেনদেন প্রচলিত আছে তাতে 'তাআতী'র উপর আমল করা উচিৎ নয়।"

আমার এই আরবী প্রবন্ধের উর্দূ অনুবাদ করেছেন মাওলানা আব্দুল্লাহ মায়মান সাহেব, যা তাঁরই সম্পাদিত ফিক্বহী মাকালাত নামক কিতাবে ছাপানো হয়েছে। ছাপানোর আগে তাতে পূণঃরায় নজর দেয়ার সুযোগ আমার হয়নি। সেখানে আমার উপরোক্ত বাক্যের অনুবাদ করা হয়েছে এভাবে: "এখান থেকেই স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, আজকাল ইসলামী ব্যাংকসমূহে মুরাবাহার যেসব লেনদেন তাআতী'র মাধ্যমে সম্পাদিত হয় তা কোনভাবেই বৈধ নয়।"

এখানে দাগ দেয়া অংশে আমার উপরোক্ত আরবী বাক্যের অনুবাদ করতে গিয়ে মুহতারাম অনুবাদকের ত্রুটি হয়ে গেছে। উপরোক্ত বাক্যে 'التي تجـــري في المصــــارف الإســـلامية' অংশটি মুরাবাহা'র 'সিফত বা গুণবাচক বিশেষ্য; 'তাআতী'র নয়। তাআতী'র গুণবাচক বিশেষ্য হলে التي স্ত্রী লিঙ্গের পরিবর্তে الـــذي পুং লিঙ্গ ব্যবহার হত। ইসলামী ব্যাংকসমূহে মুরাবাহার লেনদেন তাআতী'র মাধ্যমে সম্পাদিত হয়- এমন কথা বলা হয়নি; বরং বলা হয়েছে, ইসলামী ব্যাংকসমূহে যে মুরাবাহা প্রচলিত আছে, তাতে তাআতী'র অনুমোদন দেয়া উচিৎ নয়। 'মুরাওয়াজা ইসলামী ব্যাংকারী' নামক কিতাবের সম্মানিত রচয়িতাগণ তাদের কিতাবের ২৩৮ পৃষ্ঠায় এই ভুল অনুবাদের উপর ভরসা করে বলে দিয়েছেন যে, ইসলামী ব্যাংকসমূহের রীতি হল, তারা তাআতী'র ভিত্তিতে মুরাবাহা'র লেনদেন করে।

এই ভুল বোঝাবুঝির দায় অসতর্ক অনুবাদের উপর তো অবশ্যই পড়ে, তবে আরবী কিতাবের উর্দূ অনুবাদের পরিবর্তে মূল আরবী কিতাব দেখে

নেয়া কি ফতোয়া প্রদানকারীদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না? ফিক্বহের অনেক কিতাবের অনুবাদ হয়েছে। কোন দায়িত্বশীল মুফতী কি শুধু অনুবাদ দেখে ফতোয়া দিতে পারে? বিশেষত: যখন ঐ অনুবাদকৃত অংশের উপর কোন লেনদেনের শরয়ী বিষয় নির্ভর করে? যদি আরবী বাক্যের মধ্যে কোন অস্পষ্টতা থেকে থাকে, যার কারণে অনুবাদকেরও ভ্রম হয়ে গেছে, তবে কি ঘটনার পরিপূর্ণ যাচাই প্রয়োজনীয় ছিল না?

যাই হোক! একটি সুস্পষ্ট বাস্তবতা হল, যদিও তাআতী'র ম্যাধমে বেচাকেনা জায়েয তবুও আমার জানামতে এমন কোন সুদবিহীন ব্যাংক নেই যেখানে মুরাবাহা'র লেনদেন তাআতী'র মাধ্যমে করা হয়। তাই এই আপত্তি সম্পূর্ণ ভুল এবং সম্পূর্ণ বাস্তবতাবিবর্জিত।

মুরাবাহা'র সময়, বিনিয়োগ ও মূল্য নির্ধারণ

সামঞ্জস্য বিধানের দিক থেকে দ্বিতীয় আপত্তি উত্থাপন করা হয় এভাবে যে,

"প্রচলিত ইসলামী ব্যাংকসমূহে চলমান 'মুরাবাহা' ও 'মুরাবাহায়ে ফিক্বহিয়া'র মধ্যে কোন সাদৃশ্য নেই। মুরাবাহায়ে ফিক্বহিয়াতে শুরুতেই দর ও মূল্য নির্ধারিত হয়ে যিম্মায় আসা, বিনিয়োগের নিশ্চিত ধারণা এবং অস্তিত্ব জরুরী। অথচ, ব্যাংকে প্রচলিত মুরাবাহা'য় ব্যাংক মূল্য আগে পরিশোধ করে না অথবা বিনিয়োগের অস্তিত্বই থাকে না। তাই ব্যাংকের মুরাবাহা পারিভাষিক মুরাবাহা হওয়া দুরের কথা, সাধারণ কোন বেচাকেনার আওতায়ও পড়ে না। বরং বাস্তবতা হল, এ ধরণের লেনদেনকে 'মুরাবাহা' নামে অভিহিত করা শরয়ীভাবে খিয়ানত এবং নাজায়েয বলে পরিগণিত হবে।"–(মাসিক বাইয়্যিনাত, রমজান-শাওয়াল সংখ্যা ১৪২৯ হিঃ পৃ:৮৮)

প্রথমবার যখন এই লেখায় আপত্তিটি আমার সামনে আসে তখন আমি হতবাক হয়ে পড়ি। কেননা, ভুল বোঝাবুঝিরও তো একটা ভিত্তি থাকে. কিন্তু এর কোন ভিত্তিই বুঝে আসছিল না। কেননা, সুদবিহীন ব্যাংকসমূহের যে মুরাবাহা'র কথা আমরা জানি, তাতে তো বেচাকেনার সময়ই বিনিয়োগ পুরোপুরিভাবে জানা থাকে, ব্যাংকের লাভসহ মোট মূল্য কত তারও উল্লেখ থাকে এবং এই মূল্য কবে আদায় করা হবে তা

উল্লেখিত থাকে। তারপরও কীভাবে বলা হল যে, মুরাবাহা'র লেনদেনের সময় বিনিয়োগ নির্ধারিত হয় না।

মূলত যেটা হয় তা হচ্ছে, ব্যাংকের গ্রাহকগণকে তাদের প্রার্থিত জিনিস শুধু একবার নয়; বরং বারবার ক্রয় করতে হয়। তাই তারা ব্যাংকের কাছে এসে তাদের এই ক্রয়ের মূলনীতি সম্পর্কে জানতে চায় যে, আমরা সময়ে সময়ে আপনাদের কাছ থেকে অমুক অমুক জিনিস কিনব। এটা কোন লেনদেন নয়; বরং আগামীতে সংঘটিতব্য লেনদেনসমূহের কর্মপদ্ধতি এবং শর্তাবলী ঠিক করার জন্য একটি সমঝোতা মাত্র। আগামীতে যেসব বেচাকেনা হবে, তা এই মূলনীতি ও শর্তাবলী অনুসারে হবে। এটাকে "মাস্টার মুরাবাহা এগ্রিমেন্ট" (মুরাবাহা'র জন্য মৌলিক চুক্তি) বলা হয়। এর উদ্দেশ্য হল, পুরো কর্মপদ্ধতি একবারে নির্ধারিত করা, অতঃপর যখনই কোন লেনদেন হবে তখন প্রত্যেকবার বিস্তারিত কর্মপদ্ধতি যাতে পুণরাবৃত্তি করতে না হয়; বরং যাতে ইজাব-কবুলের সময় শুধু এতটুকু বলে দেয়াই যথেষ্ট হয় যে, মুরাবাহা'র এই লেনদেন ঐসব মূলনীতি ও শর্তাবলী অনুসারেই হবে যা "মাস্টার মুরাবাহা এগ্রিমেন্ট"এ নির্ধারিত হয়েছে। এরপর কোন প্রকৃত লেনদেন হলে যথরীতি লিখিত ইজাব-কবুলের মাধ্যমে সম্পাদিত হবে। এই লেখাটিই মুরাবাহা'র লেনদেন, যেখানে বিনিয়োগ, মোট মূল্য এবং আদায়ের সময় ইত্যাদি সবকিছুরই উল্লেখ থাকে। তাই "মাস্টার মুরাবাহা এগ্রিমেন্ট"-এর সময় কোন লেনদেন হয় না এবং গ্রাহকও সেসময় মুরাবাহা'র ভিত্তিতে কোন জিনিস কিনতে বাধ্য হয়ে যায় না। অতএব "মাস্টার মুরাবাহা এগ্রিমেন্টে" স্বাক্ষর করার পর সে যদি কিছুই না কিনে তাহলে সে তা করতে পারে এটা এমন কোন আজগুবী বিষয় নয় যা শুধু ব্যাংকই গ্রহণ করে: বরং বাজারে ব্যবসায়ীদের মধ্যে এ রকম কত সমঝোতাচুক্তি হয়, যার মাধ্যমে পারস্পরিক লেনদেনের মূলনীতি নির্ধারণ করে, তার কোন হিসাব নেই। উদাহরণ স্বরূপঃ দুই জন ব্যবসায়ী– তাদের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বেচাকেনার লেনদেন হয়ে থাকে। যেহেতু এই ধরণের অনেক লেনদেন সবসময় হতে থাকে, তাই অনেক সময় তারা এই লেনদেনের মূলনীতি ও শর্তাবলী একটি চুক্তির মাধ্যমে চূড়ান্ত করে যে, আমাদের মাধ্যমে যে বেচাকেনা হবে, তাতে ক্রেতাকে কত কমিশন দেয়া হবে? মূল্য কখন

পরিশোধ করা হবে এবং কীভাবে পরিশোধ করা হবে? ক্রেতা পর্যন্ত মাল পৌঁছানোর পদ্ধতি কী হবে? যদি কেনা বাকীতে হয়, তাহলে ক্রেতা আদায়ের জন্য কী ধরণের গ্যারান্টি দিবে? ইত্যাদি ইত্যাদি। এই চুক্তির সময় কে কত মাল ক্রয় করবে এবং এর দাম কত হবে? তা নির্ধারিত হয় না। কিন্তু চুক্তিটির ভিত্তিতে যখন তাদের মাঝে নিয়মতান্ত্রিক বেচাকেনা হয় তখন এসব বিষয় জ্ঞাত ও নির্ধারিত হয়।

"মাস্টার মুরাবাহা এগ্রিমেন্ট" মূলত এ ধরনের একটি সমঝোতামূলক চুক্তি, যার ব্যাপারে অনেক আপত্তি উত্থাপনকারীর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে:

"আইনগত ও পারিভাষিকভাবে এই চুক্তিকে ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে সংঘটিত 'মুরাবাহা' বলা হবে। কেননা, এই চুক্তির আলোকেই লেনদেনের সকল স্তর সম্পন্ন করা হয় এবং প্রয়োজনে লেনদেনকে সংঘটিত বলে প্রমাণিত করার জন্য দলিল হিসেবে এই চুক্তিকেই পেশ করা হয়, অন্য কোন মৌখিক লেনদেনকে নয়। উদাহরণস্বরূপ: গ্রাহক যদি আগামীকাল উল্টে যায়, ব্যাংক থেকে ক্রয়কৃত মাল অথবা গাড়ী গায়েব করে ফেলে এবং ব্যাংকের ঋণ আদায়ের দায়িত্ব অস্বীকার করে, তাহলে ঐ ধোকাবাজ ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন্ প্রমাণটি উপস্থাপন করবে? স্বাক্ষী উপস্থিত করবে যে, সে এদের সামনে আমাদের মাধ্যমে গাড়ী কিনেছিল না কি ঐ চুক্তি এবং দস্তাবেজ পেশ করবে, যার ভিত্তিতে ব্যাংক ও গ্রাহকের মাঝে লেনদেন হয়েছিল? প্রকাশ থাকে যে, ব্যাংক দলিল হিসেবে চুক্তির দস্তাবেজসমূহ উপস্থাপন করবে। কেননা, যে ব্যাংকের কাছে শোরুমে পাঠানোর মত কোন দূত বা প্রতিনিধি থাকে না; বরং ক্রেতাকেই এজেন্ট বা প্রতিনিধি বানাতে হয়, সেই ব্যাংক স্বাক্ষী উপস্থিত করবে কোথা থেকে? অথবা তাকে পাকিস্তানী নিয়মানুসারে 'চ্যারিটি ফান্ড' থেকে ভাড়ায় স্বাক্ষী এনে চুক্তি পেশ করে নিজের অধিকার আদায় করতে হবে। বলা বাহুল্য যে, ইসলামী ব্যাংক ভাড়ায় স্বাক্ষী আনা পছন্দ করবে না। কেননা, এটা জায়েয নয়; বরং মিথ্যা স্বাক্ষী। আর অদ্যাবধি মিথ্যা স্বাক্ষীর কোন বিকল্প এখনো ভাবা হয়নি।" −(মুরাওয়াজা ইসলামী ব্যাংকারী পৃ:২৩৬−২৩৭)

উপহাস করার এই ধরণ কোন দারুল ইফতার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে কি না সে বিতর্কে না গিয়ে বলি, যা নিয়ে ঠাট্টা করা হচ্ছে তার কোন অস্তিত্বই

নেই। শুধু শোনা কথার উপর ভরসা করে একটি অসত্য কথার 'স্বাক্ষী' প্রদান করা হয়েছে যে, ব্যাংকের এজেন্ট ব্যাংকের জন্য কেনার পর শুধু মৌখিকভাবে ইজাব-কবুল করে। তাই এটাকে 'মৌখিক কথার লেনদেন' বলে অভিহিত করা হয়েছে, কখনো বলা হয়েছে এ কেনাবেচা টেলিফোনে করা হয়, আবার কখনো এটাকে তাআতী বা ইজাব-কবুলহীন আদান প্রদান বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কখনো বা আপত্তি করা হয়েছে যে, এই লেনদেনে মূল ব্যক্তি ও প্রতিনিধি একজনই। অথচ এ কথাগুলোর কোনটিই বাস্তবসম্মত নয়। প্রকৃত বিষয় হল, সুদবিহীন ব্যাংকিংয়ের কর্মপদ্ধতি হিসেবে এটা চূড়ান্ত হয়ে আছে যে, যখন গ্রাহক ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসেবে কেনাবেচা সম্পন্ন করে ফেলে তখন সে নিয়মানুসারে লিখিত বেচাকেনার মতো তা ব্যাংকের কাছ থেকে কেনার জন্য ইজাব বা প্রস্তাব করে। এই ইজাব বা প্রস্তাব ব্যাংকের কাছে পৌঁছার পর ব্যাংক তাতে কবুল বা গ্রহণসূচক বাক্য ইত্যাদি লিখে বেচাকেনা সম্পন্ন করে। এটা কোন ইজতেহাদ- ইস্তেম্বাতের বিষয় নয় যে, এখানে দ্বিমত হতে পারে। এটাতো একটা ঘটনা, যে যখন চায় এর সত্যায়ন করতে পারে। প্রতিনিধি বা এজেন্ট যখন ব্যাংকের জন্য কেনাবেচা করে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয় তখন সে নিম্নোক্ত লেখাটি পাঠায়:

DECLARATION FOR EACH MURABAHA TRANSACTION

Date:...............

We hereby declare and certify that acting as your agent we have used the sum of Rs -- (Rupees .... only) paid to us by you for the purchase of the Assets on your behalf details whereof are set out in the schedule of Assets appearing in the annexure to this Appendix 'C' and/ or contained in invoices hereto on your behalf: and we hereby certify that the assets procured on your behalf, as your agent, have not been consumed at the time of

signing of this declaration and will only be consumed/ resoled after the purchase from the bank.

Now, we offer to purchase the above Assets from you for a price of Rs ------------------ (Rupees ---------------------- only). We undertake to pay the Contract Price referred to above as per the Master Murabaha Facility Agreement dated ------------ between us on the payment Dates specified in the Payment Schedule appearing in Appendix 'E'.

অর্থাৎ, "আমরা এই দস্তাবেজের মাধ্যমে এই ঘোষণা ও প্রত্যায়ন করছি যে, আপনি আমাদেরকে .... টাকার যে অর্থ দিয়েছেন, তা আমরা আপনার প্রতিনিধি হিসেবে ঐসব সম্পদ ক্রয় করতে ব্যয় করেছি, যার বিস্তারিত বিবরণ, তফসীল সূচী ও ঐসব বিলে উল্লেখিত আছে, যা এই দস্তাবেজের সাথে সংযুক্ত। আমরা এই মর্মে প্রত্যায়ন করছি, যে সম্পদ আপনার পক্ষে আপনার প্রতিনিধি হিসেবে নিয়ন্ত্রণে নিয়েছি তা এই ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করাকালীন সময় পর্যন্ত ব্যয় করা হয়নি এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা তা ব্যাংক থেকে ক্রয় করব না ততক্ষণ পর্যন্ত তা খরচ কিংবা বিক্রয় কোনটিই করা হবে না।

এখন আমরা এই সম্পদ আপনার কাছ থেকে .... টাকা মূল্যের বিনিময়ে ক্রয় করার প্রস্তাব করছি। আমরা দায়িত্ব নিচ্ছি যে, এই নির্ধারিত মূল্য ....তারিখে স্বাক্ষর কৃত 'মাষ্টার মুরাবাহা ফ্যাসিলিটি এগ্রিমেন্ট'এ বর্ণিত শর্ত মোতাবেক আদায় করব এবং এই আদায় ঐসব তারিখেই সম্পাদিত হবে যা এই দস্তাবেজের সাথে সংযুক্ত সূচীতে উল্লেখিত আছে।"

এই ঘোষণাপত্রটি ব্যাংকের কাছে পৌছলে ব্যাংক তার উপর নিম্নলিখিত বক্তব্য লিখে স্বাক্ষর করে:

Date:...............

We accept your offer and we sell the above-mentioned Assets to you for Rs --------------------------- (Rupees--------------- only) which shall be payable as

per the terms of the Master Murabaha Facility Agreement between us dated........................... in accordance with Payment Schedule appearing in Appendix 'E' hereto, and we have confirmed that the said assets available with the client and have not been consumed/ resoled at the time of signing of this acceptance.

"আমরা আপনার প্রস্তাব গ্রহণ করে উপরোক্ত সম্পদ আপনার কাছে .... টাকা মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয় করছি, যা .... তারিখে সম্পাদিত মাস্টার মুরাবাহা ফ্যাসিলিটি এগ্রিমেন্টে বর্ণিত শর্তাবলী ও এই দস্তাবেজের সাথে সংযুক্ত সূচীতে বর্ণিত আদায়যোগ্য তারিখসমূহে আদায় করা হবে। আমরা নিশ্চিত যে, উল্লেখিত সম্পদ গ্রাহকের কাছে বিদ্যমান, যা এই গ্রহণ/সম্মতি পত্রে স্বাক্ষর করার সময় পর্যন্ত ব্যয় কিংবা পূণঃবিক্রয় করা হয়নি।"

সুদবিহীন ব্যাংকসমূহে এই কর্মপদ্ধতিই প্রচলিত। বিভিন্ন ব্যাংকে ভাষাগত কিছু পার্থক্য থাকতে পারে। কিন্তু এ ধরণের ইজাব-কবুল সম্বলিত লিখিত দস্তাবেজ, যেখানে বিনিয়োগ, মূল্য এবং আদায়ের তারিখসমূহ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়, তার ভিত্তিতেই বেচাকেনা অস্তিত্ব লাভ করে। তবে এই ইজাব-কবুলে 'মাস্টার মুরাবাহা এগ্রিমেন্টে'র উদ্ধৃতি এতটুকুই দেয়া হয় যে, 'মাস্টার মুরাবাহা এগ্রিমেন্টে' বর্ণিত শর্তবালী এই বেচাকেনার শর্ত হিসেবে গণ্য হবে। যেহেতু সুদবিহীন ব্যাংকের শরীয়া বোর্ড লেনদেনসমূহের তদন্ত করে, তাই তারা ব্যাংকের উপর এই শর্ত আরোপ করেছে, যেন ব্যাংক মৌখিক লেনদেন না করে। খুবই কম ক্ষেত্রে টেলিফোন ব্যবহার করা হয়। তবে কথোপকথনগুলো সুনির্দিষ্টভাবে রেকর্ড করে রাখা হয় এবং পরে তাকে লিখিত আকারে সম্পাদন করা হয়। তাই এটা 'মৌখিক কথার লেনদেন' নয়, তাআতী বা ইজাব কবুল বিহীন আদান প্রদানও নয় এবং একই ব্যক্তি মূল ও প্রতিনিধি উভয়টি হওয়ার প্রশ্নও এখানে উথাপনের সুযোগ নেই।

কুরআনে কারীমে (سورة الزخـــرف :٨٦)– شهد بالحق وهم يعلمون বলে এটা আবশ্যকীয় করা হয়েছে যে, স্বাক্ষ্য দিতে হলে পরিপূর্ণ জ্ঞানার্জন

করেই দিতে হবে। পুরো বিষয়ের জ্ঞান লাভ করা ছাড়া শুধু ধারণা করা এবং এর ভিত্তিতে অসত্য কথা প্রচার করা কিসের বিকল্প জানি না? ॥আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন॥

পণ্যদ্রব্য ব্যাংকের জামানতে আসা

কার্যক্ষেত্রে মুরাবাহা'র সামঞ্জস্য বিধানের উপর তৃতীয় আপত্তি উত্থাপন করা হয় যে, ব্যাংক প্রতিনিধির মাধ্যমে যে জিনিস খরিদ করে তা ব্যাংকের জামানতে আসে না। আপত্তিটা সত্যি হলে লেনদেন নাজায়েয হয়ে যাবে। কিন্তু এখানেও দুঃখজনকভাবে বাস্তবতা যাচাই করা হয়নি। বরং এখানে অবস্থা আরো শোচনীয় যে, মুরাবাহা'র দস্তাবেজের যে বাক্যের ভিত্তিতে এই অভিযোগ করা হয়েছে যে, পণ্যদ্রব্য ব্যাংকের জামানতে আসে না– তার শেষাংশ উহ্য রেখে উদ্ধৃত করা হয়েছে, ফলে কথার উদ্দেশ্যই পাল্টে গেছে। এই বক্তব্যটি 'মুরাওয়াজা ইসলামী ব্যাংকারী' নামক কিতাবের ২৩৯ ও ২৪০ নং পৃষ্ঠায় এভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে, যেখানে ক্রেতা ব্যাংককে বলে, আপনি অমুক জিনিস ক্রয় করার জন্য আমাকে প্রতিনিধি বানিয়ে দিন, অতঃপর জিনিসটি আমি আপনার কাছ থেকে কিনব।

I/We shall immediately acquire the assets from you .... failing which we undertake to compensate you for any actual loss suffered..... [etc].

যার অনুবাদ করা হয়েছে এভাবে:

"আমরা আপনার কাছ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে মাল কিনব..... দেরী হওয়ার ক্ষেত্রে আমরা অঙ্গিকার করছি যে, আমরা মূল ক্ষতি পুষিয়ে দিব..... [ইত্যাদি]"

অথচ বক্তব্যটি আসলে এরকম:

i. We shall immediately acquire the assets from you on the basis of Murabaha failing which we undertake to compensate you for any actual loss suffered <u>(not being opportunity costs) by selling the assets to a third party.</u>

"আমরা আপনার কাছ থেকে মালগুলো তাৎক্ষণিকভাবে মুরাবাহা'র ভিত্তিতে কিনে নিব। যদি আমরা এরূপ না করি তাহলে আমরা দায়িত্ব নিচ্ছি যে, এমন কোন বাস্তব ক্ষতি আমরা পুষিয়ে দিব, যা ঐ মালগুলো তৃতীয় কোন পক্ষকে বিক্রয় করার কারণে আপনার হবে, তবে শর্ত হচ্ছে, তা সম্ভাব্য লাভের ক্ষতি হতে পারবে না।"

এখানে দাগ টানানো অংশ বাদ দিয়ে কিছু ডট চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে এবং পরের বাক্যগুলো ফোটা ফোটা দিয়েও ইত্যাদি বলে বাদ দেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, সব ক্ষতির দায়িত্ব গ্রাহকের উপর দেয়া হয়েছে। অথচ বাদ দেয়া বাক্যগুলো বলে ভিন্ন কথা। তাছাড়া 'বাস্তব ক্ষতি' র অনুবাদ করা হয়েছে 'মূল ক্ষতি' দ্বারা; যার কারণে বুঝা যায় যে, মাল নষ্ট হয়ে গেলে সে ক্ষতি গ্রাহক পূরণ করবে। অথচ এর সঠিক অনুবাদ হচ্ছে 'বাস্তব ক্ষতি'। তাদের এ কান্ডের কারণ বিরূপ ধারণা হতে পারে যে, তারা জেনে শুনেই বাদ দেয়ার এ কাজ করেছেন। কিন্তু আমার নেক ধারণা হল, লেখকগণ জেনে শুনে বাদ দেননি; বরং অধিকাংশ পর্যালোচনা যেহেতু يحدث بكل ما سمع এর ভিত্তিতে শোনা কথার উপর করা হয়েছে, তাই এটাও সেরকম। তাঁরা মূল কাগজপত্র দেখার কষ্টটা পর্যন্ত করেননি, কেউ তাঁদের কাছে যে উদ্ধৃতি এনে দিয়েছেন, তার উপর ভর করেই তারা হুকুম লাগিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা এটাও জিজ্ঞাসা করেননি যে, উদ্ধৃতির শেষে যে ডট ডট লাগানো হয়েছে তাতে বুঝা যায় যে, এখানে কোন অংশ বাদ দেয়া হয়েছে, সেটা কি? আর এটা বাদ দেয়াতে উদ্দেশ্য পাল্টে যায়নি তো? যাই হোক! এটা ইচ্ছাকৃত কাটাছেড়া নয়; বরং অবস্থা হল সেটাই যে, প্রথানুযায়ী সঠিক যাচাই বাচাই না করে শোনা কথার উপর ভরসা করে সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে।

এখন শুনুন, আসল বাস্তবতা কী ? পণ্যদ্রব্য ব্যাংকের জামানতে থাকার অর্থ হল, যতক্ষণ তা ব্যাংকের মালিকানায় থাকবে, গ্রাহককে বিক্রয় করা হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত যদি প্রতিনিধির বাড়াবাড়ি ছাড়া অন্য কারণে তা নষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে তাহলে ক্ষতির দায়ভার ব্যাংকের হবে। কেননা, পণ্যটি যতক্ষণ প্রতিনিধির নিয়ন্ত্রণে থাকবে ততক্ষণ তা তার কাছে ব্যাংকের আমানত হিসেবে থাকবে। কথাটি উপরে উদ্ধৃত ইজাব বা প্রস্তাবের ভাষা থেকে শরয়ীভাবে, প্রচলনগতভাবে এবং আইনগতভাবে

প্রমাণিত হয়। কেননা, প্রতিনিধি সেখানে বলে: "যে সম্পদ আপনার পক্ষে আপনার প্রতিনিধি হিসেবে নিয়ন্ত্রণে নিয়েছি তা এই ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করার সময় পর্যন্ত ব্যয় করা হয়নি এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা তা ব্যাংক থেকে ক্রয় করব না ততক্ষণ পর্যন্ত তা খরচ কিংবা বিক্রয় কোনটিই করা হবে না।" যেখানে বক্তব্যটিতে স্পষ্টভাবে বলা হচ্ছে যে, 'আপনার পক্ষে' আমাদের নিয়ন্ত্রণে আছে, সেখানে তার উদ্দেশ্য পরিস্কার যে, মালিকানা এবং জামানতসহ সকল অধিকার ও দায়িত্ব মক্কেল বা ব্যাংকের। অর্ডার ফরমের উক্ত বক্তব্য থেকে একে নাকচ করা হয় না। বরং গ্রাহকের কাছে বিক্রয়ের পূর্বে যদি গ্রাহকের কোন বাড়াবাড়ি ছাড়া অন্য কারণে মাল নষ্ট হয়ে থাকে তাহলে গ্রাহকের উপর এর ক্ষতিপূরণ বর্তায় না। কেননা, অর্ডার ফরমে পরিস্কার ভাষায় উল্লেখ আছে যে, গ্রাহক শুধু বাস্তব ক্ষতি বহন করবে তখনই যখন সে মালটি ক্রয় করার অঙ্গীকার পূরণ করে না এবং ব্যাংক মালিক হিসেবে মালটি তৃতীয় কোন ব্যক্তির কাছে সম্পূর্ণ ভাল অবস্থায় বিক্রয় করেও পুরো বিনিয়োগ উসুল করতে পারে না। এ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ও উসুলকৃত মূল্যের মাঝে যে পার্থক্য থাকবে তা গ্রাহক ব্যাংককে আদায় করবে। বাদ দেয়া বাক্যে এটাও পরিস্কার করা হয়েছে যে, বিনিয়োগে সম্ভাব্য লাভ (opportunity costs) অন্তর্ভুক্ত হবে না। অর্থাৎ, সুদী ব্যাংকের সাথে কেউ যদি অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তাহলে ব্যাংক তার কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ উসুল করে, তাতে এটাও গণ্য করা হয় যে, ব্যাংক এই অর্থ এত দিন সুদী কারবারে খাটালে কত লাভ আসত? এটাকেই হাতছাড়া হওয়া সম্ভাব্য লাভ (opportunity costs) বলা হয়, যাকে আরবীতে 'الفرصة الضائعة' বলা হয়। উপরোক্ত বক্তব্যে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, এই সম্ভাব্য লাভ উসুল করা হবে না, শুধু বিনিয়োগ উসুলে যেটুকু কম থাকবে তা উসুল করা হবে। এই উসুল করার ভিত্তি হল সেসব মূলনীতি, যা ইতোপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, যে ওয়াদা আইনগতভাবে আবশ্যকীয় হবে তার ভঙ্গকারীকে বাস্তব ক্ষতিপূরণ দানে বাধ্য করা যাবে, যা ওয়াদা ভঙ্গের কারণে হয়েছে। এর সাথে পণ্য জামানত হওয়ার কোন সম্পর্ক নেই।

অনেকে 'তাৎক্ষণিকভাবে' শব্দটির উপর আপত্তি করেছেন যে, এর উদ্দেশ্য হল, প্রতিনিধি হিসেবে কেনা আর মূলব্যক্তি হিসেবে কেনার মধ্যে

এমন কোন বিরতি নেই, যাতে জিনিসটি ব্যাংকের জামানতে আসে। এ ব্যাপারে কথা হল, প্রকৃত পক্ষে এই শব্দ থেকে এরকম সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। শব্দটি ভুল বোঝাবুঝিও সৃষ্টি করতে পারে। অনেক ব্যাংকে আমাদের আপত্তির কারণে শব্দটি পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছে। তবে আপনারা প্রত্যক্ষ করেছেন যে, প্রতিনিধি কেনাবেচার পর লিখিতভাবে ব্যাংকের কাছে মুরাবাহা করার প্রস্তাব পাঠায়। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রস্তাবটি গৃহিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত পণ্যদ্রব্যটি প্রতিনিধির কাছে ব্যাংকের আমানত হিসেবেই থাকে। তাই দ্বিতীয় বেচাকেনা এত দ্রুত সম্পাদিত হয় না যে, এর মাঝে কোন বিরতিই নেই। আইনগতভাবেও 'তাৎক্ষণিক' শব্দটির এ উদ্দেশ্য নেয়া যায় যে, লেনদেনের ধরণ পরিবর্তন হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সময় অতিবাহিত হতে পারে।

এখানে এটিও পরিস্কার করা দরকার যে, এ আলোচনা অর্ডার ফরমের ঐ অংশের উপর ছিল, যা আপত্তিতে উল্লেখিত হয়েছে। কোন কোন ব্যাংকে এটাকে আরো সবিস্তারে স্পষ্ট করা হয়েছে। যেখানে 'তাৎক্ষণিক' শব্দের পরিবর্তে 'যুক্তিসঙ্গত সময়ে' শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে এবং 'বাস্তব ক্ষতি'র উদ্দেশ্য হিসেবে সম্ভাব্য লাভ ছাড়া শুধু বিনিয়োগ ও বিক্রয়মূল্যের পার্থক্যকে স্পষ্ট করা হয়েছে।

আমানতের নিয়ন্ত্রণ ও জামানতের নিয়ন্ত্রণ

এখানে আরেকটি আলোচার সূচনা করা হয়েছে যে, ফুক্বাহায়ে কেরামের বক্তব্য অনুযায়ী আমানাতের নিয়ন্ত্রণ/দখল জামানতের নিয়ন্ত্রণ/দখলের জন্য যথেষ্ঠ নয়; বরং এর জন্য নতুন নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। এখানে ব্যাংকের গ্রাহক প্রতিনিধি হিসেবে যখন পণ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ নেয় তখন তা আমানতের নিয়ন্ত্রণ হয়। আবার যখন তা ব্যাংক থেকে কিনে নেয় তখন নিয়ন্ত্রণটি জামানতের হয়ে যায়। তাই পূর্ব থেকে থাকা নিয়ন্ত্রণ যথেষ্ঠ নয়। এর জন্য নতুন নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা জরুরী। এ ব্যাপারে আরজ হল, ব্যাংকসমূহে মুরাবাহা'র পদ্ধতিকে জায়েয ঘোষণার সময় এ বিষয়টিও উলামায়ে কেরামের দৃষ্টি এড়ায়নি; বরং এ বিষয়েও বিস্তারিত গবেষণা হয়েছে। এ বিষয়ে হিন্দুস্তানের এক সুপরিচিত আলেম মাওলানা মুফতী যায়েদ বান্দভী সাহেব, যিনি হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সিদ্দিক বান্দভী

রহ.-এর খলিফা, তিনি একটি প্রবন্ধে সুদবিহীন ব্যাংকের মুরাবাহা'র উপর আলোচনা করতে গিয়ে যে আলোকপাত করেছেন আমার কাছে তা খুবই যথেষ্ঠ মনে হয়েছে। তাই আমি তাঁর শুকরিয়া আদায় করে তাঁর ভাষাতেই পুরো আলোচনাটি উদ্ধৃত করছি। তিনি ব্যাংকের মুরাবাহা'র উপর আলোচনা করতে গিয়ে বলেন:

নিয়ন্ত্রণ নবায়ণ সম্পর্কে আলোচনা

উপরোল্লিখিত পদ্ধতিতে একটি আলোচনা বাকী রয়ে গেছে তা হল, ক্রয়প্রতিনিধি যখন মাল ক্রয় করে এবং মক্কেল (প্রতিষ্ঠান) এর পক্ষে নিয়ন্ত্রণ নেয় তখন তার নিয়ন্ত্রণটি প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে মক্কেলের পক্ষ থেকে হওয়াটাই স্পষ্ট।..... এই প্রতিনিধিই আবার যখন মালটি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে কিনবে তখন সে ক্রেতা এবং প্রতিষ্ঠান বিক্রেতা হবে।

এখন প্রশ্ন সৃষ্টি হয় যে, ক্রয়প্রতিনিধির পণ্যের উপর সাবেক নিয়ন্ত্রণ (যা প্রতিনিধি হিসেবে ছিল) নতুন নিয়ন্ত্রণের জন্য (যা এখন ক্রেতা হিসেবে করা হয়েছে) যথেষ্ঠ হবে কি?

নিয়ন্ত্রণের প্রকারভেদ

এ ব্যাপারে ফুক্বাহায়ে কেরামগণ যে আইন রচনা করেছেন তার সারাংশ হল,কব্জা/ নিয়ন্ত্রণ/দখল দুই প্রকার। কব্জায়ে আমানত বা আমানতের নিয়ন্ত্রণ এবং কব্জায়ে জামানত বা জামানতের নিয়ন্ত্রণ। আবার জামানতের নিয়ন্ত্রণ দুই প্রকার; কব্জায়ে জামানত বিনফসিহী বা জামানতের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ এবং কব্জায়ে জামানাত লি গায়রিহী বা জামানতের অপ্রকৃত নিয়ন্ত্রণ। প্রত্যেকের হুকুম আলাদা।

১. পণ্যের উপর যদি পূর্ব থেকেই ক্রেতার নিয়ন্ত্রণ থাকে তাহলে তা কব্জায়ে জামানত বিনফসিহী বা জামানাতের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ। উদাহরণ স্বরূপ: ছিনতাইকৃত জিনিসের উপর ছিনতাইকারীর কব্জা বা নিয়ন্ত্রণ। এর হুকুম হল, পণ্য উপস্থিত থাকুক বা না থাকুক সর্বাবস্থায় পূর্বের নিয়ন্ত্রণ নতুন নিয়ন্ত্রণের জন্য যথেষ্ঠ হবে। নিয়ন্ত্রণ নবায়নের প্রয়োজন নেই কেননা, ছিনতাইকারীর নিয়ন্ত্রণ প্রকৃত জামানতের নিয়ন্ত্রণ। আর ছিনতাইকৃত জিনিস সবসময়ই প্রকৃত ক্ষতিপূরণ যোগ্য।

২. পণ্যের উপর যদি ক্রেতার কব্জায়ে জামানত লি গায়রিহী বা অপ্রকৃত জামানতের নিয়ন্ত্রণ হয়, উদাহরণস্বরূপ: বন্ধকী জিনিসের উপর বন্ধকদাতার নিয়ন্ত্রণ। কেননা, প্রকৃত পক্ষে বন্ধক আমানত হয়ে থাকে, তবে অপ্রকৃত ক্ষতিপূরণ যোগ্য (অর্থাৎ, ঋণের কারণে) হয়। এই ক্ষতিপূরণ যেন নিজের কারণে নয়;বরং অন্যের কারণে।

এর হুকুম হল, বন্ধকী জিনিস উপস্থিত থাকলে তখন তা নতুন নিয়ন্ত্রণ হিসেবে যথেষ্ঠ হবে অন্যথায় নয়।

৩. পণ্যের উপর ক্রেতার নিয়ন্ত্রণ যদি আমানতের হয় যেমন- ধার, জমা, প্রতিনিধিত্ব, ইজারা ইত্যাদির নিয়ন্ত্রণ– এসব নিয়ন্ত্রণকে কব্জায়ে আমানত বা আমানতের নিয়ন্ত্রণ বলা হয়।

এর হুকুম হল, এই আমানতের নিয়ন্ত্রণ জামানতের নিয়ন্ত্রণ (অর্থাৎ, বেচাকেনা) এর জন্য যথেষ্ঠ হবে না; বরং নিয়ন্ত্রণ নবায়ন জরুরী হবে। এই আলোচনা বিস্তারিতভাবে বাদায়েউস সানায়ে' কিতাবে আছে।

وجملة الكلام فيها أن يد المشتري قبل الشراء إما أن كانت يد ضـــمان وإما أن كانت يد أمانة، فأما إن كانت يد ضمان بنفسه وأما إن كانت يد ضما ن لغيره..... إلى أن قال .... وإن كانت يـــد المشـــتري يدأمانـــة كيدالوديعة والعاريةلايصير قابضا إلخ- -(بدائع الصنائع ج:٥ ص:٢٤٨)

উপরোক্ত বিস্তারিত আলোচনার আলোকে যেহেতু ক্রয়প্রতিনিধির নিয়ন্ত্রণ আমানতের; জামানতরে নয়, তাই এই নিয়ন্ত্রণ (যা প্রতিনিধি হিসেবে ছিল) নতুন নিয়ন্ত্রণের জন্য যথেষ্ঠ নয়, যা এখন ক্রেতা হিসেবে হবে। বরং নতুন নিয়ন্ত্রন গ্রহণ করা শর্ত। ॥আল্লাহই ভাল জানেন॥

অতএব, উত্তম পদ্ধতি হল, প্রতিষ্ঠানের মানুষ নিজেই পণ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ নিবে এবং দ্বিতীয়বার এই ক্রেতা নতুন লেনদেনের মাধ্যমে ক্রেতা হিসেবে নিয়ন্ত্রণ নিবে। ॥আল্লাহই ভাল জানেন॥

যদি এ রকম করা না হয়; বরং ক্রেতা পূর্বের নিয়ন্ত্রণেই ক্ষান্ত হয়, তাহলে এই লেনদেন সঠিক হবে কি না তা কিছুটা বিস্তারিত আলোচনার দাবী রাখে।

নিয়ন্ত্রণ ও হস্তান্তরের প্রকৃতি

শরয়ী নিয়ন্ত্রণের অর্থ এটা নয় যা সাধারনভাবে মনে করা হয় যে, হাতে ধরতে হবে অথবা পণ্যকে স্থানান্তরিত করে নিজের জায়গায় নিয়ে আসতে হবে।

কব্জা বা নিয়ন্ত্রণের এই ব্যাখ্যা শাফেয়ী মাযহাব অনুসারী কিছু ইমামের মতে ঠিক আছে:

وقال الشافعي رحمه الله تعالى القبض في الدار والعقاروالشجر بالتخلية وأما في الدراهم والدنانيرفتناولهما بالبراجم وفي الثياب بالنقل ـــ -(بدائع ج:٥ ص:٢٤٤)

তবে হানাফী ফিক্বহবিদগণের কাছে শরয়ী কব্জা বা নিয়ন্ত্রণ অনেক ব্যাপক অর্থবোধক। তাদের দৃষ্টিতে নিয়ন্ত্রণের সারাংশ হল 'তাখলিয়া' খালি করে দেয়া। খালি করার সারাংশ হল, ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝখানে বাস্তবিক পক্ষে বা প্রচলন অনুযায়ী এমন কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকা যা প্রচলিত নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপ করায় বাধা সৃষ্টি করবে। বরং পণ্য এমন অবস্থায় থাকবে যে, ক্রেতা যদি হস্তক্ষেপ করতে চায় তাহলে স্বাধীনভাবে তা করতে পারে, যদিও পণ্যটি এখনো বিক্রেতার কাছে থাকে।

وأما تفسير التسليم والقبض فالتسليم والقبض عنـــدنا هـــو التخليـــة والتخلي هو أن يخلي البائع بين المبيع وبين المشتري برفع الحائل بينهماعلى وجه يتمكن المشتري من التصرف فيه، فيجعل البـــائع مســـلما للمبيـــع والمشتري قابضا (بدائع ج:٥ ص:٢٤٤)

لأن معنى القبض هو التمكين والتخلي وارتفاع الموانع عرفـــا وعـــادة وحقيقة (بدائع ج:٥ ص:٢٤٤)

ولهذا كانت التخلية تسليما وقبضا فيما لامثل له

(بدائع ج:٥ ص:٢٤٤)

নিয়ন্ত্রণের উপরোক্ত ব্যাখ্যাকে যদি সামনে রাখা হয়, যার সারাংশ হল, বিক্রেতার পক্ষ থেকে হস্তান্তর আর ক্রেতার পক্ষ থেকে ক্ষমতা, তাহলে এই ধরণের নিয়ন্ত্রণ উপরোল্লিখিত ক্ষেত্রেও পাওয়া যায়। কেননা, যে ক্রয়প্রতিনিধির (যিনি পরে ক্রেতা হচ্ছেন) নিয়ন্ত্রণে পণ্য রয়েছে (প্রশ্নে উল্লেখিত ক্ষেত্রে) তার পক্ষ থেকে তো হস্তান্তর পাওয়া যায় এবং প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতাও অর্জিত হয়। প্রতিষ্ঠান চাইলে পণ্যে হস্তক্ষেপ করতে পারবে, ক্রয়প্রতিনিধি কিছুই করতে পারবে না। তাই এক্ষেত্রে হুকুম মতে প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ তো হয়েই গেছে। কেননা, 'তাখলিয়া' বা খালি করে দেয়া পাওয়া গেছে (যদিও পণ্যটি বাস্তবে ক্রয়প্রতিনিধি নিয়ন্ত্রণে আছে)। এরপর আবার তার নিয়ন্ত্রণ নেয়াটা দ্বিতীয় নিয়ন্ত্রণ হবে যা ক্রেতা হিসেবে হবে। ॥আল্লাহই ভাল জানেন॥

পণ্য প্রতিনিধির কাছে থাকাটা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণের বিপরীত কিছু নয়। এরকম অনেক ক্ষেত্র আছে যে, কোন জিনিস বিক্রেতার কাছে থাকলেও লেনদেন হয়ে যাওয়ার পর ক্রেতাকে নিয়ন্ত্রণ গ্রহণকারী বলা হয়। যেমন- নিম্নবর্ণিত মাসআলাতে:

ولو اشترى من انسان كرابعينه ودفع غرائره وأمره بأن يكيل فيها ففعل صار قابضا، سواء كان المشتري حاضرا او غائبا، لأن المعقود عليه معين وقد ملكه المشتري بنفس العقد، فصح أمر المشتري لأنه تناول عينا هو ملكه فصح أمره، وصار البائع وكيلا له وصارت يدُه يد المشتري — وكذلك الطحن إذا طحنه البائع بأمر المشتري صار قابضا إلخ

(بدائع ج:٥ ص:٢٤٧)

তাই উপরোক্ত উদ্ধৃতির আলোকে একথা বলার সুযোগ আছে বলে মনে করি যে, পণ্য ক্রয়প্রতিনিধির কাছে থাকলেও হস্তান্তর ও ক্ষমতায়নের কারণে হুকুম মতে (নতুন) নিয়ন্ত্রণ পাওয়া গেছে। তাই এই পদ্ধতিও জায়েয হওয়া উচিৎ।

এখান থেকে এর প্রত্যায়ন হয় যে, ফুক্বাহায়ে কেরাম আমানতের নিয়ন্ত্রণকে যদিও জামানতের নিয়ন্ত্রণের জন্য যথেষ্ঠ নয় বলে বলেছেন,

তবুও এর পর ঐসব ক্ষেত্র বাদ দিয়েছেন যেখানে হুকুম মতে নিয়ন্ত্রণ (হস্তক্ষেপের ক্ষমতা) পাওয়া যায়।

لايكون قابضاإلا إذا ذهب المودع والمستعيرإلى العين، وانتهى إلى مكان

يتمكن من قبضها فيصيرالآن قابضابالتخلية

(البحر الرائق ج:٦ ص:٨٧، شامي ج:٤ ص:١١٢)

لايصير الآن قابضا إلا أن يكون بحضرته أويذهب إلى حيث يتمكن من

قبضه بالتخلي (بدائع الصنائع ج:٥ ص:٢٤٨)

সম্ভবত এ কারণেই হযরত থানভী রহ. নিয়ন্ত্রণের নবায়ন ছাড়া বাকীতে সংঘটিত মুরাবাহা'র বৈধতার কথা ঐ ক্ষেত্রে বলেছেন, যেখানে মাল আনয়নকারী মজুর হিসেবে থাকে। প্রকাশ থাকে যে, এটাও আমানতের নিয়ন্ত্রণ হবে। লক্ষ্য করুন:

"আমর যায়েদকে মাল আনার জন্য ৯৭ টাকা দিল এবং ৩ টাকা দিল ক্রয়ের মজুরী হিসেবে। যায়েদ মাল কিনে আমরের ঘরে বা দোকানে না রেখে নিজের ঘরে বা দোকানে রাখল। মাল তলব করার আগেই আমর শর্ত করে নেয় যে, যখন তুমি আমার মাল যোগড় করে দেবে তখন আমার অধিকার থাকবে যে, আমি চাইলে তোমাকে দেব অথবা তোমাকে না দিয়ে নিজের ঘরে নিয়ে যাব। যোগানের পর আমর যায়েদকে জিজ্ঞাসা করল, এই মাল তুমি কীভাবে ক্রয় কর? যায়েদ বলল, পাঁচ মাসের জন্য ক্রয় করি এবং আঠারো টাকা লাভের বিনিময়ে দিব।

উত্তর: এটা بيع مرابحه بتأجيل الثمن 'বাইয়ে মুরাবাহা বি তা'জিলিস সামান' (বাকীতে মূল্য পরিশোধের শর্তে মুরাবাহা), এবং প্রশ্নে উল্লেখিত শর্তসাপেক্ষে সঠিক।" –(ইমদাদুল ফাতাওয়া খন্ড: ৩ পৃ:৪২ প্রশ্ন:৩৯)

উপসংহার

প্রশ্নে উল্লেখিত ক্ষেত্রে ক্রয়প্রতিনিধি পণ্যটি মক্কেলের কাছ থেকে কিনে নিতে কোন অসুবিধা নেই। প্রারম্ভিকভাবে তার নিয়ন্ত্রণটি মক্কেলের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্বের নিয়ন্ত্রণ ছিল এবং দ্বিতীয় নিয়ন্ত্রণ ক্রেতা হিসেবে ছিল। নিয়ন্ত্রণ নবায়ন অবশ্যই জরুরী, তবে অর্থগতভাবে দ্বিতীয় য়িনয়ন্ত্রণ পাওয়া গেছে।

যেভাবে বিক্রেতা ক্রেতার প্রতিনিধি হতে পারে সেভাবে ক্রয়প্রতিনিধি ক্রেতা হওয়া এবং মক্কেল বিক্রেতা হওয়া সঠিক হবে। প্রতিনিধি বানানোটাই নিয়ন্ত্রণের স্থলাভিষিক্ত, যেমনটি ইতোপূর্বে বাদায়ে সানায়ে'র উদ্ধৃতিতে উল্লেখিত হয়েছে। অর্থাৎ, প্রতিনিধিত্ব ও বেচাকেনা কোন বিরতি ও নিয়ন্ত্রণের বাস্তব নবায়ন ছাড়া পর পর যেমন একত্রিত হতে পারে তেমনিভাবে এখানেও প্রতিনিধিত্ব এবং বেচা কেনা কোন বিরতি ও নিয়ন্ত্রণের বাস্তব নবায়ন ছাড়া একত্রিত হয়ে যাবে। ॥আল্লাহই ভাল জানেন॥

–(জাদীদ ফিকহী মাবাহিস, বাহসুল মুরাবাহা, মুফতী মুহাম্মদ যায়েদ বান্দভীর প্রবন্ধ খন্ড:৩ পৃ:৪৮৩-৪৮৮ প্র: ইদারাতুল কুরআন)

উল্লেখ্য যে, হযরত মাওলানা মুফতী মুজাহিদুল ইসলাম ক্বাসেমী রহ. হিন্দুস্তানের 'মাজমাউল ফিক্বহিল ইসলামী'র পক্ষ থেকে ১৯৯০ ইং সনে সুদবিহীন ব্যাংকিংয়ের উপর বিশেষত মুরাবাহা'র উপর আলোচনার জন্য একটি ব্যাপক আলোচনা সভা আয়োজন করেছিলেন। যেখানে হিন্দুস্তানের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহু মুফতী ও আলেম অংশগ্রহণ করেছিলেন। অনেকে মুরাবাহা'র উপর প্রবন্ধও রচনা করেছিলেন। সেখানে প্রায় বারো জন আলেম মুরাবাহা মুয়াজ্জালাকে জায়েয সাব্যস্ত করে সুদবিহীন ব্যাংকসমূহে ব্যবহারের পক্ষে দলিল পেশ করেছেন। এই প্রবন্ধগুলোতে কিছু আংশিক মাসআলার ব্যাখ্যায় মতবিরোধ পরিলক্ষিত হলেও সামগ্রিকভাবে অধিকাংশের ঝোঁক জায়েয হওয়ার দিকে ছিল। পরিশেষে মুরাবাহাকে সুদবিহীন ব্যাংকে ব্যবহারের বৈধতার পক্ষে এই সম্মেলন প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। হযরত মাওলনা মুফতী যায়েদ বান্দভী সাহেবের এই প্রবন্ধটিও সেখানে উপস্থাপিত হয়েছিল।

মুরাবাহা ও সুদী ঋণের মধ্যে পার্থক্য

সাধারণভাবে বলে দেয়া হয় যে, মুরাবাহা মুয়াজ্জালা ও সুদীঋণের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু কথাটি إنما البيع مثل الربا এই আয়াতের মতো। ইতোপূর্বে আয়াতটির শানে নুযূলের আলোচনায় বলা হয়েছিল যে, এখানে বেচাকেনা বলতে বাকীর কারণে মূল্য বৃদ্ধি করা হয় এমন বেচাকেনাই উদ্দেশ্য। তাই এর উত্তরে এতটুকু বলাই যথেষ্ঠ ছিল, যা

কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে أحل الله البيع وحرم الربوا । বাস্তবতা হল, সুদবিহীন ব্যাংকে প্রচলিত মুরাবাহা মুয়াজ্জালা এবং সুদী ঋণের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে, যা নিম্নে আলোচিত হচ্ছে:

১. সুদীঋণের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা তা কোথায় ব্যবহার করবে তার সম্পর্কে ব্যাংকের কোন আগ্রহ থাকে না। এই ঋণ যে কোন উদ্দেশ্যে নেয়া যেতে পারে। সুতরাং, কখনো এই ঋণ নিজের অনাদায়ী বিল আদায় করার জন্য, কখনো নিজের কর্মচারীদের বেতন দেয়ার জন্য, আবার কখনো নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে গ্রহণ করা হয়। পক্ষান্তরে, মুরাবাহা শুধু ঐ ক্ষেত্রেই সম্ভব, যখন ব্যাংকের গ্রাহককে বাস্তবেই কোন জিনিস ক্রয় করতে হয়। তাই মুরাবাহা বিল আদায়, বেতন দেয়া বা ওভার ড্রাফট কোনটির জন্যই ব্যবহৃত হতে পারে না। এটা তখনই ব্যবহার করা যাবে যখন বাস্তবেই কোন কেনা উদ্দেশ্য হয়।

২. মুরাবাহাতে যেহেতু শর্ত থাকে যে, যে জিনিসের উপর মুরাবাহা হবে তা ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে থাকতে হবে, তাই এটা তখনই সম্ভব যখন ক্রয়কৃত জিনিসটি এমন হবে, যার উপর ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে ধারণা লাভ করা যায় এবং প্রতিনিধির নিয়ন্ত্রণ থেকে ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ভিন্ন হবে। যেসব জিনিসে এটা সম্ভব হয় না সেসবে মুরাবাহাও সম্ভবপর নয়। সুতরাং, আমাদের সামনে এমন বেশ কিছু জিনিস এসেছে যেগুলোর নিয়ন্ত্রণ সুস্পষ্ট হওয়া সম্ভবপর ছিল না বিধায় সেখানে মুরাবাহা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ: কিছু ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে গ্যাস কেনার জন্য অর্থায়নের প্রয়োজন ছিল। তারা গ্যাসের উপর মুরাবাহা করার প্রস্তাব দিলেও যেহেতু নিয়ন্ত্রণ ও জামানতের শর্তাবলী পূরণ করা সম্ভব নয়, তাই এই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। একই অবস্থা হয়েছে বিদ্যুৎ ক্রয়ের ক্ষেত্রেও। অনুরূপভাবে সুদবিহীন ব্যাংকসমূহে সোনা রূপার উপরও মুরাবাহা নিষিদ্ধ।

৩. মুরাবাহাতে যেহেতু ব্যাংক কোন জিনিস কিনে বিক্রি করে, তাই জিনিসটি প্রথমে জামানতে আসা জরুরী। পরবর্তীতে বিক্রি করার আগেই যদি জিনিসটি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে ক্ষতির দায়ভার ব্যাংককেই বহন করতে হয়। পক্ষান্তরে সুদী ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংকের এ ধরণের কোন ঝুঁকি থাকে না। যদিও সাধরণত জিনিসটি ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে থাকে

সময়টি খুব সংক্ষিপ্ত হয়, তবুও কোন কোন সময় এই বিরতি অনেক দীর্ঘও হয়। কার্যক্ষেত্রে এরকম অনেক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে ব্যাংককে জিনিস নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ক্ষতি বহন করতে হয়েছে।

৪. সুদী ঋণের ক্ষেত্রে গ্রহীতা সময়মত পরিশোধ না করলে সুদ বাড়তে থাকে বিধায় ব্যাংকের আয় ধারাবাহিকভাবে বাড়তে থাকে। পক্ষান্তরে সুদবিহীন ব্যাংকে ঋণগ্রহীতা দরিদ্রতার কারণে সময়মত আদায় করতে না পারলে তাকে কোন বর্ধিত অংশ দিতে হয় না। তবে স্বচ্ছলতা সত্ত্বেও সময়মত আদায় না করলে বিলম্ব অনুযায়ী অর্থ সদকা করতে হয়, এর মাধ্যমে ব্যাংকের আয় বাড়ে না।

৫. সুদী ব্যাংকে কোন ব্যক্তি সুদী ঋণ নিয়ে কোন নাজায়েয এবং হারাম কাজ করতে চাইলে করতে পারবে। এতে সুদী ব্যাংক কোন ভ্রূক্ষেপই করে না। পক্ষান্তরে সুদবিহীন ব্যাংকে মুরাবাহা তখনই করা হয় যখন ক্রয়কৃত জিনিসটি হালাল হয়। তাই এমন কোন জিনিসে মুরাবাহা করা জায়েয নয়, যা মালিকানায় আনা শরীয়ত মতে হারাম এবং নাজায়েয। যেমন- সিনেমা, লটারীর টিকেট, সুদী প্রতিষ্ঠানসমূহের শেয়ার অথবা সুদী বন্ড ইত্যাদি।

৬. সুদী ব্যাংকে যেসব ঋণ দেয়া হয় যেহেতু বাস্তব আসবাবপত্রের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই, তাই তারা কৃত্রিম মুদ্রা সৃষ্টির বড় কারণ হয়, যার কোন বাস্তব মূল্যমান নেই এবং যার কারণে গোটা দুনিয়ার অর্থনীতি এক ধূসর আকৃতি ধারণ করেছে। পক্ষান্তরে মুরাবাহাতে এটা সম্ভবই নয়।

৭. সুদী ঋণে সর্বাবস্থায় ব্যাংক তার উসুলযোগ্য ঋণ অন্যের কাছে বিক্রয় করে দিতে পারে। সুদী প্রতিষ্ঠানসমূহে ঋণ ক্রয়ের সাধারণ রীতি প্রচলিত আছে। পক্ষান্তরে মুরাবাহাতে যে অর্থ অবশ্য আদায়ী তা শরীয়ত মতে আর কারো কাছে বিক্রয় করা যায় না। অনুরূপভাবে ঋণের ক্রয়-বিক্রয়ে যেসব কঠিন পরিণতি সৃষ্টি হয় এবং যা বর্তমান অর্থনৈতিক মন্দার বিরাট কারণ, তা থেকে মুরাবাহা পরিপূর্ণভাবে সুরক্ষিত।

৮. সুদী ব্যাংকে ঋণগ্রহীতা পুঁজিপতি নিজের সুবিধার্থে রাত দিন ব্যাংকের কাছে এই আবদার করতে থাকে যে, ঋণের মেয়াদ ও কিস্তি পরিবর্তন করে আমার সুদ কিছু কমিয়ে দিন, যাকে Rescheduling

বলা হয়। পক্ষান্তরে মুরাবাহায় যে মূল্য একবার নির্ধারিত হয়, তা সব সময়ের জন্যই হয়, এতে কম বেশী করা যায় না।

৯. সুদী ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহীতা সময়মত ঋণ আদায় করা থেকে বাঁচার জন্য ব্যাংকের সাথে এই লেনদেন করে যে, যত অর্থ আমার অবশ্য আদায়ী আছে তা নতুন ঋণ হিসেবে নিয়ে আরো সুদ নির্ধারণ করা হোক, যাকে Rollover বলা হয়। পক্ষান্তরে সুদবিহীন ব্যাংকে মুরাবাহার জন্য এরকম করা নিষেধ বিধায় তারা এটা করতে পারে না।

১০. সুদী ব্যাংকসমূহে এই পদ্ধতির প্রচলন আছে যে, এক ব্যাংকের কাছে দীর্ঘমেয়াদী অবশ্য আদায়ী ঋণ আছে, আর অন্য ব্যাংকের কাছে স্বল্প মেয়াদী ঋণ আছে, তারা উভয়ে তাদের ঋণের বিনিময় করে থাকে, যাকে Swap বলা হয়। এতে ঋণের পরিমাণে কম বেশী হয়। পক্ষান্তরে মুরাবাহাতে এ ধরণের বিনিময় সম্ভব নয়।

মোট কথা, এ ধরণের অনেক পার্থক্য বিদ্যমান, যা মুরাবাহা এবং সুদী ঋণ পরস্পরকে আলাদা করে দেয়। একটি বাস্তব কথা হল, পৃথিবীর সকল ব্যাংক যদি মুরাবাহাকেই সঠিকভাবে গ্রহণ করত, তাহলে ব্যাংকিং খাতে পৃথিবীব্যাপী একটা বিপ্লব আসতে পারত।

ইজারা

সুদবিহীন ব্যাংকসমূহে ব্যবহৃত আরেকটি পদ্ধতি হল, ইজারা। সাধারণত এটাকে দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা হয়। গাড়িতে এর প্রচুর ব্যবহার হচ্ছে। সুদী ব্যবস্থার অধীনে কেউ যদি কোন গাড়ি কিনতে চায় আর তার কাছে পুরো টাকা না থাকে তাহলে সে ব্যাংক থেকে সুদভিত্তিক ঋণ নিয়ে গাড়ি ক্রয় করতে পারে এবং কিস্তি অনুযায়ী সুদসহ ব্যাংককে টাকা পরিশোধ করে। অথবা, লিজিংয়ের ঐ পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে, যেখানে ব্যাংক গাড়ীর মালিক হওয়া সত্ত্বেও মালিকানার কোন দায় দায়িত্ব গ্রহণ করে না। এমনকি গাড়িটি ধ্বংস হয়ে গেলেও গ্রাহকের কাছ থেকে ভাড়ার নামে টাকা উসুল করতে থাকে।

এর বিপরীতে সুদবিহীন ব্যাংক গাড়ি নিজেই কিনে গ্রাহককে একটি দীর্ঘ মেয়াদে যেমন, তিন থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত ভাড়ার উপর দেয়। ভাড়া নির্ধারণ করার সময় তারা খেয়াল রাখেন, যেন তিন বছরে লাভসহ বিনিয়োগ উঠে আসে। এর পর গাড়িটি গ্রাহকের কাছে সামান্য মূল্যে বিক্রয় করে দেয়া হয় অথবা মূল্য ছাড়া দিয়ে দেয়া হয়।

নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে এই পদ্ধতির অনুমতি দেয়া হয়েছে:

১. আর্থিক প্রতিষ্ঠান ভাড়ার উপর যে গাড়ি দিচ্ছে তা ভাড়া কালীন সময়ে মালিক হিসেবে মালিকানার দায় দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে বহন করবে। অর্থাৎ, গাড়িটি গ্রাহকের কোন অসতর্কতা বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে ব্যাংককে ক্ষতি বহন করতে হবে।

২. মৌলিকভাবে গাড়িটি সচল হওয়ার জন্য যত মেরামতের প্রয়োজন হয়, তার সকল খরচ ব্যাংককে বহন করতে হবে।

৩. ইজারার চুক্তিতে এই শর্ত থাকতে পারবে না যে, ইজারার নির্ধারিত মেয়াদ শেষে গাড়িটি ইজারা গ্রহীতার কাছে বিক্রয় করে দেয়া হবে বা দান করা হবে।

৪. ইজারা আরম্ভ করার সময়ই ভাড়া জানা থাকতে হবে এবং ভবিষ্যতে তা কমানো বা বাড়ানোর এমন একটি মাপকাঠি নির্ধারণ করতে হবে যা বিবাদ সৃষ্টি করবে না।

এসব শর্তসাপেক্ষে ইজারা হলে তার জায়েয হওয়ার ব্যাপারে মুফতীগণ দ্বিমত পোষণ করবেন না বলে আশা করা যায়। কিন্তু সুদবিহীন

ব্যাংকসমূহে এটাকে কর্মপদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করায় যেসব আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে তার সারাংশ নিম্নরূপ:

১. এটি একটি কৌশল, তাই একে পৃথক রীতি বানিয়ে নেয়া জায়েয হবে না।

২. এ পদ্ধতি পুঁজিপতিদেরকে গাড়ি ও বাড়ির মালিক বানানোর জন্য আবিস্কার করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ধনিক শ্রেণীর স্বার্থ হাসিল করাই উদ্দেশ্য।

৩. এখানে যেহেতু ইজারার পরে গাড়িটি ইজারা গ্রহীতার কাছে বিক্রয় কিংবা দান করে দেয়া হয়, তাই এটা صفقة في صفقة অর্থাৎ, একের ভিতর আরেক লেনদেন বিধায় নাজায়েয।

৪. এই ইজারায় যেহেতু ছোট ছোট মেরামতের কাজগুলো ইজারা গ্রহীতাকে করতে হয়, তাই এটা ফাসেদ শর্ত হওয়ায় লেনদেনটি নাজায়েয।

৫. এই ইজারায় ভবিষ্যতে ভাড়ায় কী পরিমাণে কম বেশী করা হবে তা অজানা। তাই ভাড়া অজানা হবার কারণে এটা নাজায়েয হবে।

৬. ইজারার সময় ইজারা গ্রহীতাকে সিকিউরিটি ডিপোজিট হিসেবে কিছু টাকা জমা রাখার শর্ত দেয়া হয়। এটিও একটি ফাসেদ শর্ত। তাই ইজারা জায়েয নয়।

আসুন! এখন দেখা যাক এসব আপত্তি কতটুকু সঠিক।

এই কর্মপদ্ধতির সাথে যতদুর কৌশলের সম্পর্ক রয়েছে, সে সম্পর্কে বলতে হয়: বাস্তবে এখানে এতটুকু কৌশল হওয়ার সম্ভাবনা আছে যে, ইজারার ভাড়া নির্ধারণ করার সময় এটা লক্ষ্য রাখা হয় যে, যাতে ইজারার মেয়াদের মধ্যেই ভাড়ার মাধ্যমে ইজারাদাতার ঐপরিমাণ টাকা উসুল হয়ে যায় যাতে লাভসহ বিনিয়োগ উঠে আসে। এটা হয়ে যাওয়ার পর গাড়িটি ইজারা গ্রহীতার কাছে বিক্রয় বা দান করে দেয়া হবে। কিন্তু ইতোপূর্বে কৌশলের আলোচনায় বলা হয়েছে যে, সকল কৌশলই নাজায়েয নয়। কৌশলের জন্য যে চুক্তি করা হয়, যদি তা সকল শর্তাবলী পূর্ণ করে, তাহলে এ ধরণের কৌশল ঐ তৃতীয় প্রকারের অন্তর্ভূক্ত যাকে ফুক্বাহায়ে কেরাম জায়েয বলেছেন। বাস্তবতা হল, উপরোক্ত শর্ত অনুযায়ী কৃত ইজারায় সুদী ঋণের বিপরীতে ব্যাংককে বড় ধরণের ঝুঁকি নিতে হয়, যার

কারণে তা সুদ থেকে সুস্পষ্টভাবে আলাদা হয়ে যায়। কেননা, যারা সুদের উপর সুদী ব্যাংক থেকে ঋণ নেয় তারা যে কোন অবস্থাতেই তা সুদসহ ফেরত দিতে হয়। এমনকি গাড়িটি কেনার পর পর ধ্বংস হয়ে গেলেও। কিন্তু ইজারাতে গাড়িটি তিন চার বছর পর্যন্ত ব্যাংকের জামানতে থাকে। অর্থাৎ, তিন চার বছরের মধ্যে কোন এক সময়ে গাড়িটি যদি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে ব্যাংককে তার ক্ষতি বহন করতে হয়। এটা ঠিক যে, সুদবিহীন ব্যাংক তাকাফুলের বা ইন্স্যুরেন্সের মাধ্যমে এ ক্ষতি যথাসম্ভব পুষিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। তবে এ ধরনের নিরাপত্তা যেকোন মালিকই হাসিল করতে পারে। এতে তার জামানত নাকচ হয়ে যায় না। অনেক সময় ইন্স্যুরেন্সের প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যর্থ হয়ে যায়। এসকল ক্ষেত্রে ক্ষতি ব্যাংককেই বহন করতে হয়।

صفقة في صــــفقة বা এক লেনদেনের মধ্যে অন্য লেনদেনের শরয়ী অবস্থান

তৃতীয় আপত্তি ছিল, যেহেতু এটা চূড়ান্ত করা হয় যে, ভাড়ার মেয়াদ শেষ হবার পর গাড়ি ইজারা গ্রহীতাকে বিক্রয় অথবা দানের মাধ্যমে দিয়ে দেয়া হবে, তাই এটা صفقة في صــــفقة হবার কারণে নাজায়েয। একই আপত্তি شــــركة متناقصــــة শিরকাতে মুতানাক্বাসা'র (অর্থাৎ, দ্বিপাক্ষিক অংশীদারী কারবারে এক পক্ষ ধীরে ধীরে ক্রমান্বয়ে অন্য পক্ষের অংশ কিনে নেয়ার শর্তে যে শিরকাহ হয় তার) উপরও করা হয়েছিল তাই এই মাসআলার উপর কিছু মৌলিক আলোচনা করে নেয়া দরকার।

আপত্তিটি এমনভাবে করা হয়েছে, যেন ইজারা ও শিরকাতে মুতানাক্বাসার উপর আলোচনাকারীরা এ বিষয়ে কোন গবেষণাই করেননি। অথচ, আমার কিতাব بحوث في قضــــايا فقهيــــة معاصــــرة তে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। প্রকৃত অবস্থা হল, ফিক্বহবিদগণ দু'টি বিষয়ের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য করে দিয়েছেন। এক: কোন লেনদেন করার সময় মূল লেনদেনেই কোন শর্তারোপ করা, দুই: মূল লেনদেনে কোন

শর্তারোপ না করে লেনদেনের বাইরে ওয়াদা করা। নিম্নে দুই পদ্ধতির ব্যাপারে স্বল্প বিস্তর আলোচনা করা হয়েছে:

যতদুর প্রথম প্রকারের সম্পর্ক, অর্থাৎ মূল লেনদেনের মধ্যে কোন শর্তারোপ করা– এ ব্যাপারে ফুক্বাহায়ে কেরামের মাযহাবসমূহ আমি 'তাকমিলায়ে ফাতহুল মুলহিমের (পৃ:৩৯৪, খন্ড:১ باب بيع البعير وإستثناء ركوبه)তে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি। এখানে আমি শুধু হানাফীদের মাযহাবটি উল্লেখ করছি।

হানাফীদের মাযহাব হল, সাধারণ অবস্থায় লেনদেনের সাথে কোন শর্ত জুড়ে দেয়া হলে লেনদেনটি ফাসেদ বা নষ্ট হয়ে যায়। তবে তিন প্রকারের শর্ত জায়েয আছে এবং তা লেনদেন ফাসেদ করে না। এক: যে শর্ত লেনদেনের চাহিদানুসারে হয়, দুই: যা লেনদেনের উপযোগী হয়, তৃতীয়: যা সমাজে ও কাজেকর্মে প্রচলিত হয়।

বাই' বিল ওয়াফা'

অনেক হানাফী ফিক্বহবিদ কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে শর্তারোপকে জায়েয বলেছেন। যেমন– বাই' বিল ওয়াফা' (বিক্রেতা মূল্য ফিরিয়ে দিলে পুনরায় পণ্য ফেরত দেয়ার শর্তে বিক্রয়) এর মধ্যে ওয়াফা'র শর্ত যদি মূল লেনদেনের মধ্যে করা হয়, তাহলেও একে অনেক হানাফী ফিক্বহবিদ জায়েয বলেছেন। নেহায়া'র রচয়িতা এ মতের উপরই ফতোয়া দিয়েছেন। আল্লামা শামী রহ. আল্লামা যীলয়ী রহ. থেকে এর উদ্দেশ্য এটাই বর্ণনা করেছেন যে, এই বিক্রয় সঠিক হবে এবং ক্রেতা কর্তৃক তা থেকে লাভবান হওয়া হালাল হবে। তবে যেহেতু বেচাকেনার সময় এই শর্তারোপ করা হয় যে, যখনই বিক্রেতা মূল্য ফেরত দিবে তখনই ক্রেতাকে জিনিসটি দ্বিতীয়বার বিক্রয় করতে হবে, তাই জিনিসটি বিক্রেতার কাছ থেকে ক্রয়ের পর অন্যের কাছে বিক্রয় করা ক্রেতার জন্য জায়েয হবে না। আল্লামা যীলয়ী রহ. এই মতকেই ফতোয়া প্রদানযোগ্য বলে ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লামা শামী রহ. 'নাহর' এর উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেন যে, আল্লামা যীলয়ী রহ. যে মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন আমাদের এলাকায় তার উপরই আমল হয়। আল্লামা হিসকাফী রহ. বলেন:

'وقيل : بيع يفيد الإنتفاع به. وفي إقالة شرح المجمع عن النهاية : وعليه الفتوى —'

এর নীচে আল্লামা শামী রহ. লেখেন:

"قوله : 'وقيل : بيع يفيد الإنتفاع به' هذا محتمل لأحد قولين : الأول : أنه بيع صحيح مفيد لبعض أحكامه من حل الإنتفاع به إلا أنه لايملك بيعه. قال الزيلعي في الإكراه : وعليه الفتوى. الثاني : القول الجامع لبعض المحققين أنه فاسد في حق بعض الأحكام حتى ملك كل منهما الفسخ، صحيح في حق بعض الأحكام، كَحِلّ الأنزال ومنافع المبيع، ورهن في حق البعض حتى لم يملك المشتري بيعه من آخر،ولارهنه، وسقط الدين بهلاكه، فهو مركب من العقود الثلاثة كالزرافة فيها صفة البعير والبقر والنمر، جوز لحاجة الناس إليه بشرط سلامة البدلين لصاحبهما. قال في البحر: وينبغي أن لايعدل في الإفتاء عن القول الجامع. وفي النهر: والعمل في ديارنا على ما رجحه الزيلعي." —(رد المحتار ج:٥ ص:٢٧٧)

শর্তটি প্রচলিত হয়ে যাওয়ার কারণেই সম্ভবত জায়েয হওয়ার এই মতামত প্রদান করা হয়েছে। ওয়াফা' বা ফিরতি বিক্রয়ের শর্ত মূল লেনদেনে করাটাকে অবশ্য অধিকাংশ হানাফী ফিক্বহবিদ জায়েয বলেননি। এ ধরনের ক্ষেত্রে এটাকে সকল বিবেচনায় বন্ধক সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমনটি আল্লামা শামী রহ. ইমাম আবুল হাসান মাতুরিদী রহ. থেকে উদ্ধৃত করেছেন। তবে মূল লেনদেন শর্তহীন হয়ে ওয়াফা'র শর্ত লেনদেন থেকে আলাদা করে একটি ওয়াদা হিসাবে যদি করা হয় তাহলে তাকে সঠিক বলা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ওয়াদাকেও আবশ্যকীয় বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমনটি ইতোপূর্বে ওয়াদার আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে 'মুহীত' কিতাবে বলা হয়েছে:

”وبعض مشائخ سمرقند قالوا: إذا لم يكن الوفاء مشـــروطا في البيـــع يُجعل هذا بيعا صحيحا في حق المشتري حتى يحل له الإنتفاع بالمشـــترى كما يحل له الإنتفاع بسائر أملاكه، ويُجعل رهنا في حق البائع حـــتى لا يتمكن المشتري من بيعه، وإذا مات لايورث عنه، وإذا جاء البائع بالمـــا ل يؤمر المشتري بأخذ المال ورد المبيع عليه، ويجوز أن يكون للعقد الواحـــد حكمان وقد مر نظير هذا في السلم، وإنما فعلنا هكذا لحاجة الناس بعضهم إلى اموال البعض مع صيانتهم عن الوقوع في الربا. “ —(المحيط البرهـــاني كتاب البيوع، الفصل:٢٥ ج:١٠ ص:٣٦٩ ط: إدارة القرآن)

ফতোয়ায়ে ক্বাজী খানে আছে :

”واختلفوا في البيع الذي يسميه الناس بيع الوفاء أو بيع الجائز. قـــال أكثر المشائخ منهم السيد الإمام أبو شجاع والقاضي الإمام أبوالحسن علي السغدي: حكمه حكم الرهن .... والصحيح أن العقد الذي جرى بينهما إن كان بلفظ البيع لايكون رهنا، ثم ينظر إن ذكرا شرط الفسخ في البيـــع فسد البيع، وإن لم يذكرا ذلك في البيع وتلفظا بلفظة البيع بشرط الوفـــاء، أو تلفظا بالبيع الجائز، وعندهما هذا البيع عبارة عن عقد غير لازم فكذلك. وان ذكرالبيع من غير شرط ثم ذكرالشرط على وجه المواعدة قد تكـــون لازمة، فتُجعل لازمة لحاجة الناس. “ —(الفتاوى الخانية علـــى هـــامش الهندية ج:٢ ص:١٦٤—١٦٥)

জামেউল ফুসূলাইনে আছে:

”شرطا شرطا فاسدا قبل العقد، ثم عقدا لم يبطل العقد، ويبطـــل لـــو تقارنا. (فنقز)

بعض مشائخ زماننا قالوا: الشرط لو لم يكن في العقد جعلناه بيعا صحيحا في حق المشتري حتى ينتفع بالمبيع كسائر أملاكه، وجعلناه رهنا في حق البائع حتى لم يجزبيع المبيع، ويجبرالمشتري على قبول الثمن ورد المبيع على بائعه، لأن هذا البيع مركب منهما كهبة بشرط عوض وهبة في المرض وكثير من الأحكام، يكون له حكمان وإنما جعلناه كذلك لحاجة الناس إليه حذرا عن الربى خصوصا في ديارنا فإنهم ببلخ اعتادوا في هذا الباب الدين والإجارة الطويلة و لم يمكنهم في الكرم، والإجارة في الكرم لاتصح لما عرف، وببخارى اعتادوا الإجارة الطويلة و لم يمكنهم ذلك إلا بعد شراء الأشجار وهذا الشراء عقد وفاء فاضطُرّوا إلى ما قلنا، وما ضاق الناس اتسع حكمه. "

অনেক ফিক্বহবিদ একথাও বলেছেন যে, ওয়াফা' বা ফিরতি বিক্রয়ের ওয়াদা বেচার আগে বা পরে যখনই করা হোক তা মূল লেনদেনে শর্ত বলে ধরা হবে না এবং এর কারণে বেচাকেনা ফাসেদও হবে না। তাই জামেউল ফুসূলাইনে আরো বলা হয়েছে:

"ولو تواضعا قبل البيع ثم تبايعا بلا ذكر شرط جاز البيع عند ح رحمه الله إلا إذا تصادقا أنهما تبايعا على ذلك المواضعة، وكذا لو تواضعا الوفاء قبل البيع ثم عقدا بلا شرط الوفاء فالعقد جائز، ولا عبرة للمواضعة السابقة. " —(جامع الفصولين، الفصل ١٨ في بيع الوفاء ج:١ ص:٢٣٧ اسلامي كتب خانه، بنوري تاون)

জামেউল ফুসূলাইনে এই মাসআলাকে শুধু বাই' বিল ওয়াফা'র লেনদেনে সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি; বরং তাকে একটি সাধারণ হুকুম হিসেবে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে:

”شرطا شرطا فاسدا قبل العقد، ثم عقدا لم يبطل العقد، ويبطل لو تقارنا. “ —(أيضا ص:٢٣٧)

আল্লামা শামী রহ.ও জামেউল ফুসূলাইনের উদ্ধৃতিটি উল্লেখ করে আপত্তি করেছেন যে, প্রথমে ওয়াদা করলে বেচাকেনা ফাসেদ হওয়া উচিৎ। কেননা, তারা এরই ভিত্তিতে বেচাকেনা করেছে। কিন্তু আল্লামা খালেদ আতাসী রহ. এই আপত্তিকে এভাবে নাকচ করেছেন :

”بقي ما إذا ذكر الشرط قبل العقد ثم عقد خاليا عن الشرط، وقد ذكره في الثامن عشر من جامع الفصولين حيث قال : شرطا شرطا فاسدا قبل العقد، ثم عقدا لم يبطل العقد، ويبطل لو تقارنا اهـ لكن قال الفاضل ابن عابدين في ردالمحتار: قلت : وينبغي الفساد لو اتفقا على بناء العقد عليه كما صرحوا به في بيع الهزل كما سيأتي آخر البيوع ــ اهـ أقول: هذا بحث مصادم للمنقول كما علمت، وقياسه على بيع الهزل قياس مع الفارق، فإن الهزل كما في المنار هو أن يراد بالشيئ ما لم يوضع له، ولامايصلح له اللفظ استعارةً، ونظيره بيع التلجئة، وهو كما في الدر المختارأن يظهرا عقدا وهما لايريدانه، وهو ليس ببيع في الحقيقة، فإذا اتفقا على بناء العقد عليه فقد اعترفا بأنهما لم يريدا إنشاء بيع أصلا، وأين هذا من مسئلتنا؟ ومن راجع كلام هذا الفاضل قبيل كتاب الكفالة عند الكلام على بيع التلجئة من الدر المختار يظهرله الفرق بأجلى مما ذكرناه، وعلى كل حال فاتباع المنقول أسلم ــ والله أعلم ــ“ —(شرح المجلة للاتاسي ج:٢ص:٦١)

প্রকৃত পক্ষে মনে হচ্ছে যে, জামেউল ফুসূলাইনেও পিছনের ওয়াদাকে ফাসেদ নয় বলা হয়েছে তখনই যখন বিক্রয়কালীন সময়ে এ ধরণের কোন সমঝোতা হয় না যে, আমাদের বেচাকেনা পূর্বের ওয়াদার উপর

ভিত্তি করেই হচ্ছে। আর যদি বিক্রয়কালীন সময়েই এ ধরণের কোন কথা বলা হয় যে, আমাদের বেচাকেনা পূর্বের ওয়াদার ভিত্তিতেই হচ্ছে, তাহলে জামেউল ফুসূলাইনের রচয়িতাও এটাকে জায়েয বলেননি। যেমনটি তাঁর

ولو تواضعا قبل البيع ثم تبايعا بلا ذكر شرط جاز البيع عند ح رحمه

الله إلا إذا تصادقا أنهما تبايعا على ذلك المواضعة

বাক্য থেকে স্পষ্ট। আল্লামা ইবনে আবেদীন রহ.-এর আপত্তি ছিল ঐক্ষেত্রে, যখন বেচাকেনার ভিত্তি পূর্ববর্তী ওয়াদার উপর হয়, তিনি এটা ফাসেদ হওয়াকে প্রাধান্য দিতেন। জামেউল ফুসূলাইনে এই পদ্ধতিটাকে বৈধতার পদ্ধতি থেকে পৃথক করে ফাসেদ বলা হয়েছে। তাই দুই মতের মধ্যে কোন বৈপরিত্য নেই। তবে এটা শুধু ঐ সময়ই হবে যখন বেচাকেনার সময় এ কথা উল্লেখ করা হবে যে, বেচাকেনাটি ঐ ওয়াদার ভিত্তিতেই হচ্ছে। কেননা, এ ক্ষেত্রে এটা বাই' বিশশর্ত বা শর্তযুক্ত বেচাকেনা হয়ে যায়, যা নাজায়েয।

এ থেকে বুঝা যায় যে, বেচাকেনা যদি শর্তমুক্ত হয় এবং বেচাকেনার আগেই ওয়াফা' বা ফিরতি বিক্রয়ের ওয়াদা করে নেয়া হয়, তাহলে তা বেচাকেনাকে ফাসেদ করবে না। হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. এ ব্যাপারে দলিল পেশ করতে গিয়ে বলেন, এই ওয়াদাকে প্রয়োজনের কারণে জায়েয বলা হয়েছে এবং পূর্বের ওয়াদাকে ফাসেদ নয় ঘোষণা করা ছাড়া প্রয়োজন পূর্ণ হবে না। নিম্নে হযরতের ফতোয়া উল্লেখিত হল:

"**প্রশ্ন :** ফতোয়া ক্বাজী খানের ২য় খন্ডের ৩৪৮ নং পৃষ্ঠায় আছে:

واختلفوا في بيع الوفاء أوالبيع الجائز—إلى أن قال – وإن ذكرالبيع من

غيرشرط ثم ذكرالشرط على وجه المواعدة جاز البيع ويلزمه الوفاءبالوعد

لأن المواعيد قدتكون لازمة لحاجة الناس — اهـ

এই উদ্ধৃতির উদ্দেশ্য কী? এটা কি জায়েয যে, বিক্রেতা ক্রেতাকে বলবে- তুমি তো আমার সাথে বেচাকেনা শর্তহীনভাবেই করবে, তবে আমি তোমার সাথে ওয়াদা করছি যে, তুমি যদি চাও তাহলে এতদিনের মধ্যে আমি তোমার জিনিস এই দামে ফেরত দিয়ে দিব অথবা এত লাভ

নিয়ে তোমার কাছে বিক্রয় করব। এর উপর বিক্রেতা রাজী হয়ে যায় এবং বলে যে, আমি শর্তহীনভাবে তোমার কাছে অমুক জিনিস এত দামে বিক্রয় করলাম, ক্রেতাও তা গ্রহণ করে এবং এই ওয়াদাকে মজবুত করার জন্য কোন দস্তাবেজ লিপিবদ্ধ করে। না কি শুধু এটা জায়েয যে, কোন প্রস্তাব ছাড়াই শর্তহীন বেচাকেনা হবে এবং বেচাকেনার পর ক্রেতা বিক্রেতার প্রস্তাবে বা প্রস্তাব ছাড়াই ফেরত দেয়ার ওয়াদা করে। এখানে শুধু দ্বিতীয় পদ্ধতিকে জায়েয বলা হলে মানুষের প্রয়োজন পূরণ হবে না। কেননা, প্রথমত ফেরত নেয়ার আশা ব্যতিরেকে বেচাকেনা করার পর বিক্রেতার পক্ষ থেকে ফেরত নেয়ার প্রস্তাব করার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীন। দ্বিতীয়ত ক্রেতা প্রস্তাব মেনে নেয়া বা নিজ থেকে স্বপ্রণোদিত হয়ে এ ধরণের প্রস্তাব করার সম্ভাবনা আরো বেশী ক্ষীন। তাই এতে মানুষের প্রয়োজন মেটে না।

উত্তর : আপনার সন্দেহ সঠিক। বেচাকেনার আগে বা সাথে ওয়াফা' বা ফিরতি বিক্রয়ের শর্ত উল্লেখ করা ছাড়া বাস্তবেই প্রয়োজন পূরণ হয় না। অথচ এই দুই পদ্ধতির ব্যাপারে মূল মত হল, বেচাকেনা ফাসেদ হওয়া। যেমন দুররে মুখতারে বলা হয়েছে:

أن ذكرالفسخ فيه أو قبله أو زعماه غيرلازم كان بيعا فاسدا، ولوبعده على وجه الميعادجائزولزم الوفاء به إلخ

কারো কারো মতে বেচাকেনার আগে উল্লেখকৃত শর্তের কোন গ্রহণযোগ্যতাই নেই, তাই বেচাকেনা ফাসেদ হবে না। তবে তা বাই' বি শর্তিল ওয়াফা' হবে না। যেমন- দুররে মুখতারের চতুর্থ খন্ডের ৩৮১ নং পৃষ্ঠায় আছে:

لوتواضعا على الوفاء قبل العقد ثم عقدا خاليا عن شرط الوفاء فالعقد جائز ولا عبرة للمواضعة

তবে মুতাআখখিরীন ফুক্বাহাদের অধিকাংশের ফতোয়া হল, বেচাকেনার পূর্বে দেয়া শর্ত গ্রহণযোগ্য এবং মানুষের প্রয়োজনের কারণে বেচাকেনা জায়েয لضرورة الناس। দুররে মুখতারের চতুর্থ খন্ডের ১৮৭ নং পৃষ্ঠায় আছে:

وقد سئل الخيرالرملي عن رجلين تواضعاعلى بيع الوفاء قبـــل عقـــده وعقدا البيع خالياعن الشرط، فأجاب بأنه صرح في الخلاصـــة والفـــيض والتتارخانية وغيرها بأنه يكون على ما تواضعا.

১৭ই রমজান, ১৩৩৩ হিজরী।

প্রশ্ন ঃ প্রথম প্রশ্নের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, "তবে মুতাআখখিরীন ফুক্বাহাদের অধিকাংশের ফতোয়া হল, বেচাকেনার পূর্বে দেয়া শর্ত গ্রহণযোগ্য এবং মানুষের প্রয়োজনের কারণে বেচাকেনা জায়েয لضـــرورة الناس। দুররে মুখতারের চতুর্থ খন্ডের ১৮৭ নং পৃষ্ঠায় আছে:

وقد سئل الخيرالرملي عن رجلين تواضعاعلى بيع الوفاء قبـــل عقـــده وعقدا البيع خالياعن الشرط، فأجاب بأنه صرح في الخلاصـــة والفـــيض والتتارخانية وغيرها بأنه يكون على ما تواضعا،انتهى.

এখানে জিজ্ঞাসিত বিষয় হল- আমি যতদুর বুঝি, খায়রে রামালীর উত্তর থেকে এই বেচাকেনার বৈধতা ও অবৈধতা কোনটিই জানা যায় না। কেননা على ما تواضـــعا থেকে শুধু এটুকুই স্পষ্ট হয় যে, পূর্বের শর্তারোপ অগ্রহণযোগ্য হবে না, যেমনটি অনেকে বলেছেন; বরং গ্রহণযোগ্য হবে, বেচাকেনাটি দৃশ্যত শর্তমুক্ত হবে, তবে অর্থগতভাবে শর্তযুক্ত হবে। এটা স্পষ্ট হয় না যে, দৃশ্যগতভাবে শর্তমুক্ত ও অর্থগতভাবে শর্তযুক্ত বেচাকেনা মূল মাযহাবের ভিত্তিতে ফাসেদ নাকি মানুষের প্রয়োজনে জায়েয। এমতাবস্থায় এই উদ্ধৃতির উদ্দেশ্য কী? তা বুঝা যায় না।

উত্তর : আসলে উদ্ধৃতটি বেচাকেনা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চুপ। এই উদ্ধিতির আসল উদ্দেশ্য হল, শর্ত গ্রহণযোগ্য হবার ব্যাপারে কারো কারো ধারণার বিরুদ্ধে দলিল উপস্থাপন করা। যৌক্তিকভাবে জায়েয হওয়ার পক্ষে দলিল হল, মানুষের প্রয়োজন। উদ্ধৃত দলিল হল, ফিক্বহের বিভিন্ন উদ্ধৃতিগুলো لضـــرورة النـــاس বলে যেগুলোর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন- দুররে মুখতারে আছে-

فيها: القول السادس في بيع الوفاء أنه صحيح لحاجة الناس فرارا مـــن الربوا، وقالوا: ماضاق على الناس أمر إلا اتسع حكمه — في رد المحتـــار: قوله :'فيها' أي في البزازية، وهو من كلام الأشباه — ج٤ ص٣٨٦

(ইমদাদুল ফাতাওয়া, কিতাবুল বুয়ূ' প্রশ্ন:১৩৫ খন্ড:৩ পৃ:১০৮-১০৯)

বাস্তবতা হল, ফতোয়া খায়রিয়ার উদ্ধৃতি যদিও সুস্পষ্ট নয় এবং এতে على ما تواضعا-এর এই উদ্দেশ্য নেয়ারও সুযোগ আছে যে, তাদের পূর্বের সমঝোতা বেচাকেনাকে ফাসেদ না করলেও বেচাকেনা বহির্ভূত একটি ওয়াদা হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে, তবুও কিতাবটির উদ্ধৃতির পূর্বাপর সূত্রের দিকে লক্ষ্য করলে মনে হয়, তাঁর মতে على ما تواضـــعا-এর উদ্দেশ্য হল, পূর্ববর্তী ওয়াদাকে বেচাকেনার শর্ত গণ্য করা হবে এবং ফলে বেচাকেনা ফাসেদ বা অবৈধ হবে। পক্ষান্তরে, জামেউল ফুসূলাইনের উদ্ধৃতি থেকে এটা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, বেচাকেনা সঠিক হবে এবং বেচাকেনাকালীন সময়ে "পূর্ববর্তী ওয়াদার ভিত্তিতে হচ্ছে" এটা উল্লেখ করা না হলে তাকে শর্তযুক্ত মনে করা হবে না। মোট কথা, এখানে দুই মতই আছে। হযরত হাকীমুল উম্মত রহ. প্রয়োজনের কারণে জায়েয হওয়ার মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, পূর্বের ওয়াদা সত্ত্বেও শর্তের উল্লেখবিহীন বেচাকেনাকে জায়েয বলা হলে –যেমনটি জামেউল ফুসূলাইনে উল্লেখিত ও ইমদাদুল ফাতাওয়াতে ফতোয়া প্রদত্ত হয়েছে– তা শুধু শব্দগত পার্থক্য হবে। অথচ উভয় পক্ষ জানে যে, তারা ঐ ওয়াদার ভিত্তিতেই বেচাকেনা করছে। তাই শর্তোল্লেখবিহীন এবং শর্তোল্লেখসহ বেচাকেনার মধ্যে গুণগত কোন পার্থক্য নেই। بحوث في قضـــايا فقهيـــة معاصرة তে আমি এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি এভাবে-

"والجواب عن هذا الإشكال على ما ظهرلي—والله سبحانه أعلـــم — أن الفرق بين المسألتين ليس في الصورة فحسب– بل هناك فرق دقيـــق في الحقيقة أيضا-

وذلك أن العقد الواحد إن كان مشروطا بالعقد الآخر، والذي يعبّر عنه بالصفقة في الصفقة، لايكون عقدا باتّا، وإنما يتوقف على عقد آخر بحيث لايتم العقد الأول إلا به، فكان في معنى العقد المعلق أو العقد المضاف إلى زمن مستقبل- فإذا قال البائع للمشتري: بعتك هذه الدار على أن تؤجر الدار الفلانية لي بأجرة كذا، فمعناه: أن البيع موقوف على الإجارة اللاحقة، ومتى توقف العقد على واقع لاحق، خرج من حيّز كونه باتّا، وصار عقدا معلقا، والتعليق في عقود المعاوضة لايجوز، ولو حكمنا بمقتضى هذا العقد، وامتنع المشتري من الإجارة، فإن ذلك يستلزم أن يرتفع البيع تلقائيا، لأنه كان مشروطا بالإجارة، وعند فوات الشرط يفوت المشروط-

فالعقد إذا شرط معه عقد آخر، وكان ذلك في معنى تعليق العقد الأول على العقد الثاني، صار كأنه قال: إن آجرتني الدار الفلانية بكذا، فداري بيع عليك بكذا، وهذا مما لايجيزه أحد، لأن البيع لايقبل التعليق-

وهذا بخلاف مالوذكرا ذلك على سبيل المواعدة في أول الأمر، ثم عقدا البيع مطلقا عن شرط- فإن البيع ينعقد من غيرتعليق بيعا باتا، ولايتوقف تمامه على عقد الإجارة- فلوامتنع المشتري من الإيجار بعد ذلك، فإنه لايؤثر على هذا البيع البات شيئا، فيبقى البيع تاما على حاله- وغاية الأمر أن يجبر المشتري على الأمر بالوفاء بوعده على القول بلزوم الوعد، لأنه أدخل البائع في البيع بوعده، فلزم عليه أن يفي بذلك الوعد قضاءعند من يقول بذلك- وهذا شيئ لا أثرله على البيع البات الذي حصل بدون أي شرط، فإنه يبقى تاما، و لم يف المشتري بوعده-

وبهذا تبين أن البيع إذا اشترط فيه العقد الآخر يبقى مترددا بين التمــام والفسخ، وإن هذا التردد يورث فيه الفساد، بخلاف البيع المطلق الذي سببه الوعد بالشيئ، فإنه لا تردد في تمام البيع، فإنه يتم في كل حــال، وغايــة الأمر أن يكون الوعد السابق لازما على المشتري على قول من يقول بلزوم الوعد-" —(بحوث في قضايا فقهية معاصرة ج:١ ص:٢٠٥—٢٠٦)

বিস্তারিত এই আলোচনার সারাংশ হল, কোন বেচাকেনার মূল লেনদেনে যদি কোন শর্তারোপ করা না হয়, লেনদেনের আগে বা পরে শর্তটি ওয়াদার মত করে করা হয়, তাহলে তার কারণে বেচাকেনা ফাসেদ বা অবৈধ হবে না। এতে صفقة في صــفقة বা এক লেনদেনের মধ্যে অন্য লেনদেনও হয় না। কখনো কখনো প্রয়োজনের কারণে ওয়াদাটিকে আবশ্যকীয়ও করা যেতে পারে। পিছনে আমরা (কৌশলের শরয়ী অবস্থান শীর্ষক আলোচনার শেষদিকে) এক কোঅপারেটিভ সোসাইটি সম্পর্কে হযরত মাদানী রহ. এবং 'মুসলিম ফান্ড' সম্পর্কে হযরত মাহমুদুল হাসান গাংগুহী রহ.-এর ফতোয়া উল্লেখ করেছি, যেখানে বেচাকেনা ও ঋণের চুক্তি আলাদা আলাদা ছিল। এটাকে তাঁরা صــفقة في صــفقة বা এক লেনদেনের মধ্যে অন্য লেনদেন বলেননি। তাঁদের ফতোয়ার নিম্নোক্ত অংশটি বিশেষভাবে লক্ষনীয় : যে ব্যক্তি সুদ থেকে বাঁচতে চায় সে সওয়াব পাবে। লেনদেন দুটি হলে, এক: ঋণ, যার সম্পর্ক টাকা ও বন্ধকের সাথে, দুই: বেচাকেনা, যার সম্পর্ক কাগজ ও ফরমের সাথে, দুটো সঠিক হলে পুরোটাকে সঠিক বলার সুযোগ আছে। যেমন- হযরতে আকদাস মাওলানা থানভী রহ. হাওয়াদিসুল ফাতাওয়া'র ২য় অংশে ১৫৫ পৃষ্ঠায় এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন: (উত্তর) মানি অর্ডার দুই লেনদেনের সমষ্টিতে হয়। এক: ঋণ- যা মূল টাকার সাথে সম্পৃক্ত, দুই: ইজারা- যা ফরম পূরণ ও প্রেরণের ফিস হিসেবে নেয়া হয়। পৃথকভাবে এ দু'টিই জায়েয, সুতরাং, দু'টি সমষ্টিগতভাবেও জায়েয। আর যেহেতু এর সাথে মানুষের ব্যাপক সম্পৃক্ততা আছে তাই এই ব্যাখ্যা করে এটাকে জায়েয বলা উচিৎ।

তারিখঃ ৯ শাওয়াল ১৩৩২ হিজরী

যদি صفقة في صفقة অর্থাৎ, এক লেনদেনের মধ্যে আরেক লেনদেন হচ্ছে- এই আপত্তি তোলা হয়, তাহলে তো মানি অর্ডারেও এমনটি হয়। অতএব, 'মুসলিম ফান্ড' থেকে টাকা নেয়ায় দু'টি লেনদেন হয়। এক: قرض بالرهن বা رهن بالقرض অর্থাৎ, বন্ধক দিয়ে ঋণ বা ঋণ দিয়ে বন্ধক, এর সম্পর্ক টাকার সাথে, আর বন্ধকী জিনিস স্বর্ণালংকার ইত্যাদি হয়। দুই: বেচাকেনা, এর সম্পর্ক কাগজ, ফরম ও চুক্তিনামা ইত্যাদির সাথে। উভয় লেনদেন পৃথকভাবে জায়েয আছে, তাই সম্মিলিতভাবেও জায়েয হবে।

তবে ফরমের দাম অনেক বেশী। কিছু জিনিস এমন, যার প্রকৃত মূল্যমান কম হলেও কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে তার দাম বেড়ে যায়। যেমন, সরকারী স্ট্যাম্প বিভিন্ন মূল্যের হয়ে থাকে। এগুলো বাস্তবে এত দামী না হলেও এগুলোর মাধ্যমে বিচারিক কার্যক্রম পরিচালিত হয় বিধায় দাম বেশী। অনুরূপভাবে এই ফরমগুলোর প্রকৃত মূল্য যত কমই হোক যেহেতু এগুলোর মাধ্যমে ঋণ ও বন্ধকের লেনদেন সহজে সম্পাদিত হয়, তাই এর দাম বৃদ্ধিতে কোন আপত্তি উত্থাপনের সুযোগ নেই।

হযরত থানভী রহ. মানি অর্ডার জায়েয হওয়ার আরেকটি কারণ বলেছেন, জনসাধারণের ব্যাপক সম্পৃক্ততা। কিন্তু তা প্রথম কারণ অর্থাৎ, দু'টি ভিন্ন জায়েয লেনদেন সমষ্টিগতভাবেও জায়েয- এর মাধ্যমে জায়েয হয়ে গেছে। দ্বিতীয় কারণ অর্থাৎ, জনগনের ব্যাপক সম্পৃক্ততা হারামকে হালাল করতে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। তাই বুঝা গেল, ব্যাপক সম্পৃক্ততা কারণ হিসেবে নয়; বরং হেকমত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আসল কারণ হল, প্রথমটিই অর্থাৎ, দুই পৃথক লেনদেন।"

-(ফতোয়া মাহমুদিয়া খন্ড:৪ পৃ:২২৪-২২৬ প্র: ক্বাদীম)

সুদবিহীন ব্যাংকসমূহে ইজারার যে পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে, তাতে দু'টি লেনদেন পৃথক পৃথকভাবে হয়। একটি হল ইজারা আর অন্যটি হল ইজারা শেষে বেচাকেনা বা দান। কিছু প্রতিষ্ঠানে শুধু ইজারা'র চুক্তি হয়, সেসময় বেচাকেনা বা দানের কোন ওয়াদা না হলেও কার্যক্ষেত্রে ইজারা শেষে গাড়ি ইজারাগ্রহীতার কাছে নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় করা হয় অথবা দান করা হয়। কিছু প্রতিষ্ঠানে ইজারা শেষ হবার পর ইজারাদাতার পক্ষ

থেকে এমন ওয়াদা থাকে যে, ইজারা শেষে গাড়িটি ইজারাগ্রহীতাকে বিক্রয় কিংবা দান করে দেয়া হবে। পরিশেষে যতক্ষণ পর্যন্ত বেচাকেনা বা দান হয় না, ততক্ষন পর্যন্ত ইজারাকৃত জিনিসটির উপর ইজারা'র সমস্ত আহকাম প্রযোজ্য হয় এবং ঐ জিনিসটি এই পুরো সময়ে ব্যাংকের জামানতেই থাকে। অর্থাৎ, নষ্ট হয়ে গেলে ক্ষতি ব্যাংককেই বহন করতে হয়। আবার যখন ইজারা শেষ হয়ে যায় তখন বেচাকেনা বা দান সংশ্লিষ্ট বিষয়সহ সংঘটিত হয়ে যায়। ওয়াদাকারী ওয়াদা পূরণ না করলে ইজারা শেষ হবে না। বরং ওয়াদাকারীকে তার ওয়াদা পূরণ করতে হবে, নতুবা যার সাথে ওয়াদা করা হয়েছে তাকে প্রকৃত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এই উভয় ক্ষেত্রেই صفقة في صفقة বা এক লেনদেনের মধ্যে অন্য লেনদেনের নিষিদ্ধ পদ্ধতি সৃষ্টি হচ্ছে না। যেমনটি বাই' বিল ওয়াফা' বা ফিরতি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে জামেউল ফুসূলাইনে, কোঅপারেটিভ সোসাইটির ব্যাপারে কেফায়েতুল মুফতীর ফতোয়ায়, মুসলিম ফান্ড সম্পর্কে মুফতী মাহমুদুল হাসান গাঙ্গুহীর ফতোয়ায় এবং মানি অর্ডার সম্পর্কে হযরত থানভী রহ.-এর ফতোয়ায় চুক্তিবহির্ভূত ওয়াদাকে صفقة في صفقة বা এক লেনদেনের মধ্যে অন্য লেনদেনের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা হয়নি।

এবার صفقة في صفقة বা এক লেনদেনের মধ্যে অন্য লেনদেনের আপত্তি উত্থাপনকারীদেরকে ঠান্ডা মাথায় কিছু বিষয় চিন্তা ভাবনা করার আহ্বান জানাচ্ছি:

'মুরাওয়াজা ইসলামী ব্যাংকারী' কিতাবের ২৯১ নং পৃষ্ঠায় সুদী ব্যাংকেও এলসি খোলার অনুমতি দেয়া হয়েছে। সুদী ব্যাংকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুদী এলসি হয়- এই আলোচনায় না গিয়ে বলতে হয় প্রকৃত পক্ষে এলসি'র চুক্তিতে একই সাথে وكالة بأجر (অর্থের বিনিময়ে প্রতিনিধিত্ব) এবং كفالة (তত্ত্বাবধান)-এর দুটি চুক্তি হয়। অর্থাৎ, সেখানে 'ওয়াকালা বি আজরিন' (অর্থের বিনিময়ে প্রতিনিধিত্ব) (প্রকৃত পক্ষে যা আইনগত ব্যক্তির ইজারা)এর সাথে 'কাফালাহ' (তত্ত্বাবধান)ও হয়। এটা কি صفقة في صفقة বা এক লেনদেনের মধ্যে অন্য লেনদেন নয়? এটা ঠিক যে, উক্ত কিতাবে

এলসি খোলার অনুমতি দিতে গিয়ে 'অপারগতার সময়' এবং 'নাজায়েয মনে করে' ইত্যাদি বন্ধনী যুক্ত করে শেষে বলা হয়েছে যে, এসব স্তরে যেসব নাজায়েয কাজের সম্মুখীন হতে হয়, তার দায় তাদের উপরই বর্তাবে যারা এই আইন রচনা করেছেন। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, এলসি খোলার প্রয়োজনীয়তাকে তো আপনারা স্বীকার করেন; তাই আইন রচনা যদি আপনাদের হাতে হত, তাহলে এলসি খোলার জন্য ওয়াকালাহ ও কাফালাহ একত্রিত হয় না এমন কী আইন আপানারা তৈরী করতেন?

ইজারায় মেরামতের শর্ত

আমরা উপরে উল্লেখ করে এসেছি যে, সুদী লিজিংয়ের বিপরীতে সুদবিহীন প্রতিষ্ঠানসমূহে ইজারা পদ্ধতি জায়েয করার জন্য শরীয়ত মতে এটা জরুরী যে, ইজারার ভিত্তিতে যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান গাড়ি দিচ্ছে, ইজারার মেয়াদকালীন সে প্রতিষ্ঠান গাড়ির মালিক হিসেবে মালিকানার পুরো দায় দায়িত্ব বহন করবে। অর্থাৎ, গ্রাহকের অবহেলা বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই যদি গাড়ির কোন ক্ষতি হয় তাহলে ব্যাংক এর ক্ষতি বহন করবে। তাছাড়া গাড়িটি ব্যবহারযোগ্য করার জন্য যত মেরামতের প্রয়োজন হবে তার সকল ব্যয়ভার হবে ব্যাংকের উপর। তবে যেহেতু গাড়িটি দীর্ঘ মেয়াদে –যেমন, তিন বছরের জন্য দেয়া হচ্ছে– তাই গাড়ির ব্যবহার সংক্রান্ত সাধারণ কাজগুলো যেমন- জ্বালানী সংগ্রহ, সার্ভিসিং, টিউনিং, প্লাগ বদলানো, ব্যাটারী বদলানো ইত্যাদি কাজগুলো ইজারাগ্রহীতার বলে সাব্যস্ত করা হয়। ইজারার উপরোক্ত পদ্ধতির উপর একটি আপত্তি এও উত্থাপন করা হয় যে, এই ইজারাতে ছোট খাট মেরামতের শর্ত যেহেতু ইজারাগ্রহীতার দায়িত্বে দেয়া হয় তাই এই ফাসেদ শর্তের কারণে লেনদেনটি নাজায়েয। বলা হয়েছে, গাড়ির সার্ভিসিং, টিউনিং এবং সাধারণ মেরামতের দায়িত্বও ইজারাদাতার উপর হওয়া উচিৎ। ইজারাগ্রহীতার দায়িত্বে এই কাজ দেয়া শর্তে ফাসেদ এবং নাজায়েয।

এই আপত্তিকে প্রামাণ্য করার জন্য ফুক্বাহাদের সেযব উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর উপর ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করলে আপত্তিটি আপনা আপনি দুর হয়ে যায়। এ ব্যাপারে ফিক্বহবিদগণ এই মূলনীতি বলেছেন যে, ইজারাদাতা ইজারাগ্রহীতার উপর এমন কোন কাজের শর্তারোপ

করতে পারে না যার প্রভাব ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও উল্লেখযোগ্যভাবে অবশিষ্ট থাকে। কেননা, এর উদ্দেশ্য হল, সে এমন শর্তারোপ করছে যার মাধ্যমে ইজারা শেষ হওয়ার পরও সে লাভবান হতে থাকবে। যেমন- কোন ব্যক্তি জমি দেয়ার সময় শর্ত করে যে, এখানে এমন একটি দালান বা সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করে দাও যা পরেও থাকবে। জমির ইজারার ব্যাপারে আরো বলা হয়েছে যে, ইজারাদাতা গ্রহীতাকে হাল চাষ করার, প্রস্রবণ তৈরী করে দেয়ার শর্তও আরোপ করতে পারবে না। আবার এটাও স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, ইজারা দীর্ঘমেয়াদী হলে হাল চালানো এবং নালা বানানোর শর্তারোপ করলে কোন অসুবিধা নেই। কেননা, দীর্ঘদিন পর ইজারা শেষ হলে উক্ত কাজগুলোর মাধ্যমে ইজারাদাতা তেমন কোন উল্লেখযোগ্য লাভবান হবে না। উল্লেখযোগ্য এজন্যই বলা হয়েছে যে, দীর্ঘমেয়াদী ইজারায় নালা ইত্যাদি বানানো যদি ইজারাগ্রহীতার যিম্মায় থাকে তাহলে তো এর বেশী লাভ সেই ভোগ করবে। ইজারা শেষ হবার পর জমিটি যখন ইজারাদাতার কাছে ফেরত দেয়া হবে তখন নালা ইত্যাদির কিছু অংশতো অবশিষ্ট থাকতে পারে, তবে তা দ্বারা এমন উল্লেখযোগ্য ফায়েদা হবে না যার কারণে ইজারাকে ফাসেদ বলা যায়। নিম্নলিখিত ফিক্বহী উদ্ধৃতিটি এই অর্ন্তনিহিত মর্মার্থকে সুস্পষ্ট করার জন্য যথেষ্ট। 'তাবয়ীনুল হাকায়েক শরহে কানযুদ্দাকায়েকে আছে :

” (وإن شرط أن يثنيها أو يكري أنهارها أو يسرقنها أو يزرعها بزراعة أرض أخرى لا كإجارة السكنى بالسكنى) لأن أثر التثنية وكرى الأنهار والسرقنة يبقى بعد إنقضاء مدة الإجارة فيكون فيه نفع صاحب الأرض وهو شرط لا يقتضيه العقد فيفسد كالبيع، ولأن مؤجرالأرض يصير مستأجرا منافع الأجيرعلى وجه يبقى بعد المدة فيصير صفقة في صفقة وهو مفسد أيضا لكونه منهيا عنه حتى لو كانت بحيث لا يبقى لفعله أثر بعد لمدة بأن كانت المدة طويلة أو كان الريع لايحصل إلا به يفسد اشتراطه، لأنه مما يقتضيه العقد؛ لأن من الأراضي ما لا يخرج الريع إلا بالكراب

مرارا وبالسرقنة، وقد يحتاج إلى كرى الجداول ولا يبقى أثره إلى القابل عادة، بخلاف كرى الأنهار؛ لأن أثره يبقى إلى القابل عادة. وفي لفظ الكتاب إشارة اليه حيث قال كرى الأنهار؛ لأن مطلقه يتناول الأنهارالعظام دون الجداول واستئجار الأرض ليزرعها بأرض أخرى ليزرعها الآخر يكون بيع الشيئ بجنسه نسيئة وهو حرام لما عرف في موضعه وكذا السكنى بالسكنى أو الركوب بالركوب إلى غير ذلك من المنافع

(باب الإجارة الفاسد ج:٦ ص:١٣١ ط: سعيد)

রদ্দুল মুহতারে আছে:

" (قوله بشرط أن يثنيها) في القاموس ثنّاة تثنية: جعله اثنين اهـ وهوعلى حذف مضاف أي يثنّى حرثها- وفي المنح إن كان المراد أن يردها مكروبة فلا شك في فساده، وإلا فإن كانت الأرض لاتخرج الريع إلا بالكراب مرتين لا يفسد، وإن مماتخرج بدونه، فإن كان أثره يبقى بعد إنتهاء العقد يفسد؛ لأن فيه منفعة لرب الأرض وإلا فلا اهـ ملخصا- وذكرفي التتارخانية عن شيخ الإسلام ما حاصله أن الفساد فيما إذا شرط ردها مكروبة بكراب يكون في مدة الإجارة. أما إذا قال: على أن تكربها بعد مضيّ المدة أو أطلق، صحّ وانصرف إلى الكراب بعده- قال: وفي الصغرى واستفدنا هذا التفصيل من جهته وبه يفتي اهـ-

قلت: ووجهه أن الكراب يكون حينئذ من الأجرة تأمل ــ

(قوله أي يحرثها) فالحرث هو الكرب وهو إثارة الأرض للزراعة كالكراب، قاموس- (قوله أو يكري) من باب رمى أي يحفر- (قوله العظام)؛ لأن أثره يبقى إلى القابل عادة، بخلاف الجداول أي الصغارفلا

Contents

تفسد بشرط كربها، هو الصحيح ابن كمال- (قوله أويسرقنها) أي يضع فيها السرقين وهو الزبل لتهييج الزرع ط- (قوله فلو لم تبق) بأن كانت المدة طويلة لم تفسد؛ لأنه لنفع المستأجر فقط

(ردالمحتار، باب الإجارة الفاسدة ج:٦ ص:٥٩–٦٠ ط: إيچ إيم سعيد)

দুররে মুখতারে আছে :

(وصحت لو استأجرها على أن يكربها ويزرعها أو يسقيها ويزرعها) لأنه شرط يقتضيه العقد. "

এর নিচে আল্লামা শামী রহ. বলেন:

(قوله لأنه شرط يقتضيه العقد) لأن نفعه للمستأجرفقط-

(أيضا ج:٦ ص:٦٠)

সার কথা হল, ইজারাকৃত জিনিসের ব্যবহারের লক্ষ্যে ইজারাগ্রহীতার উপর এমন কোন শর্তারোপ করা যার মাধ্যমে ইজারাগ্রহীতা লাভবান হয় এবং ইজারা শেষ হওয়ার পর এর উল্লেখযোগ্য কোন প্রভাব অবশিষ্ট না থাকে- জায়েয আছে। সাধরণত গাড়ির ইজারা তিন বছরের জন্য হয়ে থাকে। প্রকাশ থাকে যে, এই তিন বছরের দীর্ঘ সময়ে যে সার্ভিসিং, টিউনিং বা সাধারণ মেরামত ইত্যাদি করা হয়, তিন বছর পর তার উল্লেখযোগ্য কোন প্রভাব অবশিষ্ট থাকে না। তাই এসব ফিক্বহী উদ্ধৃতির ভিত্তিতে একথা বলা যে, সার্ভিসিং, টিউনিং বা সাধারণ মেরামতের শর্ত ইজারাগ্রহীতার উপর চাপিয়ে দেয়ায় ইজারা ফাসেদ বা অবৈধ হয়ে যাবে- কথাটি উপরোক্ত মূলনীতির সম্পূর্ণ বিপরীত।

এখানে আরেকটি কথা উল্লেখযোগ্য। ফুক্বাহায়ে কেরাম এই মাসআলাও বর্ণনা করেছেন যে, কোন ব্যক্তি কোন পশু ভাড়া নিলে তার খাদ্য ইজারাদাতার যিম্মায় হবে। যদি এ শর্তটি ইজারাগ্রহীতার উপর আরোপ করা হয় তাহলে তা শর্তে ফাসেদ হবে। কিন্তু ফক্বীহ আবুল লাইস রহ. বলেন, পশুর খাদ্যের ব্যাপারে আমরা পূর্ববর্তী ফক্বীহদের মতের উপরই কাজ করব, তবে আমাদের সময়কালের প্রচলন অনুযায়ী দাসের খাবার ইজারাগ্রহীতাকেই দিতে হবে। তাই আমাদের সময় ইজারাগ্রহীতার

উপর এ শর্তারোপ করলে ইজারা ফাসেদ হবে না। এ ব্যাপারে আল্লামা তাহতাবী রহ. মত প্রকাশ করেছেন যে, ইজারাগ্রহীতা কোন শর্ত ছাড়া নিজ থেকে যদি খাবার দেয় তাহলে এতে ইজারাগ্রহীতার উপর শর্তারোপ জায়েয হওয়া জরুরী নয়। আল্লামা শামী রহ. এর বিরোধীতা করে বলেন, খাবার ইজারাগ্রহীতাই দিবে- এটা যেহেতু প্রচলিত তাই তা শর্তের মতোই বিবেচিত হবে। অতএব, প্রচলন শর্তটিকে বৈধতা দেয়ায় তা প্রচলিত কিংবা উল্লেখিত যাই হোক ফক্বীহ আবুল লাইস রহ.ও একে জায়েয বলেছেন। তাঁর বর্ণিত কারণ থেকে বুঝা যায় যে, পশুর খাদ্য দেয়াটা রেওয়াজে পরিণত হলে ইজারাগ্রহীতাকে এর দায়িত্ব দেয়াও জায়েয হওয়া উচিৎ। যতক্ষণ এরকম রেওয়াজ চালু হবে না ততক্ষণ তা করার জন্য কিছু কৌশলও তিনি লিখেছেন। দেখুন:

" في الظهيرية : إستأجر عبدا أو دابة على أن يكون علفها على المستأجر، ذكر في الكتاب أنه لايجوز. وقال الفقيه أبوالليث: في الدابة نأخذ بقول المتقدمين، أما في زماننا فالعبد يأكل من مال المستأجر عادة. قال الحموي: أي فيصح اشتراطه، واعترضه ط بقوله: فرق بين الأكل من مال المستأجربلا شرط، ومنه بشرط اهـ. أقول: المعروف كالمشروط، وبه يشعر كلام الفقيه كما لايخفى على النبيه. ثم ظاهر كلام الفقيه أنه لو تعورف في الدابة ذلك يجوز تأمل. "—(رد المحتار، باب الإجارة الفاسدة ج:٦ ص:٤٧)

মনে হচ্ছে, পশুর খাদ্যের ব্যাপারেও স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। প্রাচীন কালে হজ্জে যাওয়ার জন্য যেসব পশু ইজারা নেয়া হত তার বিস্তারিত মাসআলা আল্লামা সারাখসী রহ. باب الكراء إلى مكة শীর্ষক আলোচনায় উল্লেখ করেছেন। সেখানে তিনি একটি মাসআলা বর্ণনা করেছেন যে, কুফা থেকে হজ্জে যাবার জন্য সাধরণত ৫ যুলক্বাদায় রওয়ানা করা হয়। এখন কোন ব্যক্তি হজ্জে যাবার জন্য কোন পশু ইজারা নিতে চাইলে পশুর মালিক যদি বলে আমি তোমাকে ৫ তারিখের

পূর্বেই(যেমন, যুলক্বাদার এক তারিখে) নিয়ে যেতে চাই, তাহলে এই শর্তারোপ করা জায়েয হবে না। কেননা, এতে ইজারাগ্রহীতাকে বিনা কারণে অতিরিক্ত কষ্ট সহ্য করতে হবে। পশুর মালিক তাকে আগে রওয়ানা হতে বাধ্য করে প্রকৃত পক্ষে এই কয়দিনের পশুর খাদ্যের খরচ থেকে বাঁচতে চায়। তাই তার এই দাবী গ্রাহ্য হবে না। দেখুন:

" فإن اراد الحمّال أن يخرجه قبل ذلك فهو يريد أن يلزمه ضرر السفر من غير حاجة إليه فيسقط عن نفسه مؤنة العلف فلايمكّن من ذلك.

(المبسوط للسرخسي ج:١٦ص:٢٠، ط: دارالمعرفة)

এখানে দাগ টানানো বাক্যটি বলছে যে, হজ্জের দীর্ঘ সফরে পশুখাদ্যের খরচ ইজারাদাতার পরিবর্তে ইজারাগ্রহীতাকে বহন করতে হত। তাই ইজারাদাতা চাচ্ছিল, যেন সফরের জন্য আগেই বের হয়ে পড়ে, যাতে করে ঐ কয়দিনের পশুখাদ্যের ব্যয়ভার ইজারাগ্রহীতার দায়িত্বে পড়ে।

অনুরূপভাবে ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেছেন যে, মজুরীর বিনিময়ে দুধমাতা রাখা হলে তার খাদ্য ও বস্ত্রের ব্যবস্থা করা ইজারাগ্রহীতার দায়িত্বে অর্পণ করা যেতে পারে। অথচ যুক্তির চাহিদা হল, জায়েয না হওয়া। কেননা, এতে পারিশ্রমিক অজানা হয়ে যায়। তবুও রেওয়াজের কারণে এটাকে জায়েয করা হয়েছে। এ ব্যাপারে দুররে মুখতারে আছে:

"(والظئر)....(بأجرمعين) لتعامل الناس....(وكذا بطعامها وكسوتها) ولها الوسط، وهذا عند الإمام لجريان العادة بالتوسعة على الظئرشفقة على الولد. "

আল্লামা শামী রহ. বলেন:

"قوله: 'وكذا بطعامها وكسوتها' أشار إلى أنها مسئلة مستقلة وأنهما عليها إن لم يشترطا على المستأجر بالعقد. قوله: 'لجريان العادة إلخ' جواب عن قولهما 'لاتجوز لأن الأجرة مجهولة' ووجهه أن العادة لما جرت بالتوسعة على الظئر شفقة على الولد لم تكن الجهالة مفضية إلى النزاع،

والجهالة ليست بمانعة لذاها، بل لكوها مفضية إلى النزاع." —(ردالمحتار، باب الإجارة الفاسدة ج:٦ ص:٥٣)

এখান থেকে বুঝা যায় যে, ইজারাতে এই ধরণের শর্তাবলী জায়েয হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে রেওয়াজ ও প্রচলনের বিরাট ভূমিকা আছে। আমাদের এখানে গাড়ির ইজারায় বিভিন্ন রেওয়াজ আছে। কয়েক ঘন্টার জন্য টেক্সী ভাড়া নিলে জ্বালানীসহ সবকিছু ইজারাদাতা (ভাড়াদাতা)কে বহন করতে হয়, কয়েকদিনের জন্য নিলে ইজারাগ্রহীতাকে বহন করতে হয়, আবার আরো বেশী দীর্ঘ সময়ের জন্য নিলে সার্ভিসিং, টিউনিংসহ ইজারাগ্রহীতাকে বহন করতে হয়। তাছাড়া দীর্ঘমেয়াদী ইজারায় এমন কিছু শর্তাবলী ফিক্বহবিদগণ জায়েয বলেছেন যা সাধারণ অবস্থায় জায়েয নয়। যেমন, বেশী মূল্যে বেচার জন্য রেখে দেয়া জমির ক্ষেত্রে এরকম অনেক শর্তকে জায়েয করা হয়েছে, এখানে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। অতএব, এটা এমন কোন বিষয় নয় যে, যার কারণে ইজারা ফাসেদ হয়ে যাবে।

মজুরী অজানা হওয়া

ইজারার উপর আরেকটি আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছিল যে, এই ইজারায় ভবিষ্যতে ভাড়া কী পরিমাণ কমবেশী করা হবে তা অজানা। তাই মজুরী অজানা হওয়ার কারণে এই লেনদেন জায়েয হবে না। বলা হয়েছেঃ

"ইজারার মজুরী বা ভাড়া নির্ধারণের জন্য বাজার অথবা কোন দেশের সুদের হারকে মাপকাঠি হিসেবে ধরা হয়, যাতে করে প্রচলিত ব্যাংক লিজিং ও সুদী ঋণের মাধ্যমে যে পরিমাণ অর্থ লাভ করে থাকে ইসলামী ব্যাংকও সে পরিমাণ মুনাফা হাসিল করতে পারে।...... সুদী মার্কেটে সুদের হার সর্বদা একরকম থাকে না; বরং বদলাতে থাকে। ...... তাই মজুরী বা ভাড়া নির্ধারিত ও জানা থাকা অসম্ভব হয়ে যায়।" –(মুরাওয়াজা ইসলামী ব্যাংকারী পৃ: ২৫৮-২৬০)

এই সম্পর্কে প্রথমে আরজ হল, কথাটি গাড়ির ইজারা সূত্রেই বলা হয়েছে। অথচ জনসাধারণের জন্য গাড়ির ইজারায় অধিকাংশ মজুরী কোন সুদের হারের সাথে সম্পৃক্ত হয় না; বরং ইজারার লেনদেনের সময়ই

মজুরীর একটি সূচী চুড়ান্ত করা হয়। ভবিষ্যতে সুদের হারের বাড়া-কমা যাই হোক মজুরী ঐ সূচী অনুযায়ীই হয়ে থাকে। তাই ইজারাগ্রহীতা শুরুতেই ধারণা পেয়ে যায় যে, তাকে কোন সময় কী পরিমাণ মজুরী আদায় করতে হবে। তাই গাড়ির সাধারণ ইজারার উপর এই আপত্তি উথাপন করার সুযোগ নেই। কেননা, আমার জানামতে যেসব সুদবিহীন ব্যাংক আছে সেগুলোতে পুরো সময়ের নির্ধারিত মজুরী প্রথম থেকেই জানা হয়ে যায়। তবে বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে যেসব মেশিনারী ভাড়ায় দেয়া হয় তাতে প্রথম মেয়াদের ভাড়া তো নির্ধারিত থাকে, তবে পরবর্তী মেয়াদগুলোতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে মজুরী বৃদ্ধি করা হতে থাকে।

দীর্ঘ মেয়াদী ইজারায় যে মজুরী এক সমান রাখা মুশকিল- তা স্পষ্ট। আপনি যদি ঘর ভাড়া দেন এবং ভাড়ার চুক্তি পাঁচ-দশ বছর মেয়াদী হয় তাহলে কি আজকেই কম বেশী করা ছাড়া পুরো পাঁচ বছরের একই ভাড়া ধার্য্য করা সম্ভব? এটা স্পষ্ট যে, কোন বাড়ীওয়ালা এতে রাজি হবে না এবং কোন ভাড়াটিয়াও এ ধরনের বাড়িওয়ালা পাবে না যে পুরো পাঁচ দশ বছর পর্যন্ত বার্ষিক হারে না বাড়িয়ে একই ভাড়া উসুল করতে থাকবে। এই বাড়ানো দুইভাবে হতে পারে। এক: শুরুতেই প্রত্যেক বছরের ভাড়া নির্ধারণ করে নিবে। কোন কোন ইজারায় এরকম হয়। দুই: প্রতি বছর ভাড়ায় শতকরা দশ অথবা পনের ভাগ হারে বৃদ্ধি হতে থাকবে। বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ব্যাংক থেকে মেশিনারী ইত্যাদি ইজারা নিলে তখন এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়, তবে সাথে এতটুকু পার্থক্য থাকে যে, প্রথম মেয়াদের ভাড়া একটি নির্ধারিত পরিমাণে হয়, এরপর ভাড়াকে কোন মাপকাঠির (benchmark) সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। এটা ঠিক যে, এই মাপকাঠি সুদ বা মুনাফার ঐ হারে হয় যার উপর ব্যাংক পরস্পর লেনদেন করে। তবে সাথে চুক্তিতে এটাও উল্লেখ করে দেয়া হয় যে, এই হার যদি প্রাথমিক ভাড়া থেকে শতকরা পনের ভাগ বেড়ে যায় তাহলে বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা পনের ভাগ থেকে বেশী হবে না। এ কর্মপদ্ধতির উপর দুটি আপত্তি উথাপিত হয়েছে।

এক: এই কর্মপদ্ধতিতে ভাড়া অজানা। কিন্তু চিন্তার বিষয় হল, যদি বলা হত যে, প্রতি বছর ভাড়া শতকরা পনের ভাগ বৃদ্ধি হবে তাহলে কি তা জায়েয হত? এটা স্পষ্ট যে, এতে করে ভাড়া অজানা হত না। এ

পদ্ধতি শুধু জায়েযই নয়; বরং অধিকাংশ ভাড়াটিয়াদের মধ্যে শতকরা হারের রেওয়াজ আছে। এটা যখন জায়েয তখন এর সাথে এই শর্ত জুড়ে দেয়া যে, কোন নির্দিষ্ট মাপকাঠি অনুযায়ী এই ভাড়া শতকরা পনের ভাগ থেকে কমও হতে পারে- আরো বেশী জায়েয হবে। দীর্ঘ মেয়াদী ইজারাসমূহে ভবিষ্যত ভাড়াকে কোন নির্ধারিত মাপকাঠির সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়ার ফিক্বহী দৃষ্টান্ত হলো- মজুদদারীর জমি, যার ইজারা হয় দীর্ঘমেয়াদী। এগুলোতে সব সময়ের জন্য এক ভাড়া নির্ধারণ করার পরিবর্তে এটা চূড়ান্ত করা হয় যে, ইজারাগ্রহীতা সবসময় اجـــرت مثــل উজরাতে মিসিল' (অনুরূপ ভাড়া) আদায় করবে। 'উজরাতে মিসিল' বাড়লে জমির ভাড়াও বাড়বে। তবে ইজারাগ্রহীতার পক্ষ থেকে জমি আবাদ করতে গিয়ে তার নিজ খরচ অতিরিক্ত হওয়ার কারণে যদি এই বৃদ্ধি হয় তাহলে ইজারাগ্রহীতা এই বৃদ্ধির জন্য দায়ী হবে না। (দেখুন

(ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في وقف الكردار والكدك ص:٣٩١ ج:

চুক্তিটি যখন হচ্ছিল তখন ভবিষ্যত 'উজরাতে মিসিল' কত হবে তা জানা থাকে না। কিন্তু মাপকাঠি সম্পর্কে যেহেতু ঐকমত্য আছে, তাই ঐ চুক্তিকে ভাড়া অজানা হবার কারণে ফাসেদ বলা হয়নি।

দুই: এই মাপকাঠি সুদের হার ভিত্তিক, তাই এটা নাজায়েয। এটা এমন এক প্রশ্ন যা শুনে অধিকাংশ মানুষই চমকে উঠে। এর ভিত্তিতেই সাধারণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় যে, সুদ আর এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যদিও পার্থক্য বিদ্যমান এভাবে যে, এর সর্বোচ্চ সীমা শতকরা হিসেবে নির্ধারিত হয়, আর সুদী ব্যাংকে সুদের হারে কোন সীমা নির্ধারিত হয় না। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে, এক্ষেত্রে সুদের হারকে মাপকাঠি বানানো সুদবিহীন ব্যাংকের ইজারার এমন একটি দিক যার কারণে অনেক সময় এ ধরণের ইজারার প্রতি মানসিক অসন্তোষ বোধ করি। আমি আমার সীমিত সামর্থ্য অনুযায়ী এই মাপকাঠিকে বাদ দেয়ার জন্য সুদবিহীন ব্যাংকসমূহের কাছে শুধু দাবিই জানাইনি; বরং প্রচেষ্টাও চালিয়ে যাচ্ছি। কিছুকাল ধরে সুদের হারের এই মাপকাঠি থেকে পরিত্রাণের শুভ চিন্তা ব্যাংকগুলোতেও সৃষ্টি হয়েছে। আশা করি, এখন যেভাবে সুদবিহীন ব্যাংকের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেড়ে চলেছে অদূর ভবিষ্যতে তারা নিজেদের লেনদেন থেকে

এই সুদের হারের পরিবর্তে অন্য কোন মাপকাঠি (benchmark) গ্রহণ করতে সফল হবে ইনশাআল্লাহ। কিন্তু প্রশ্ন হল, কোন চুক্তি যদি নিজে জায়েয হয় এবং তাতে মূল্য বা ভাড়া নির্ধারণের জন্য কোন ব্যক্তি সুদের হারকে মাপকাঠি বানায় তাহলে মাপকাঠি যত অপছন্দনীয়ই হোক না কেন এর কারণে কি চুক্তি/লেনদেনটি নাজায়েয হয়ে যাবে? এই সূত্রে আমি আমার কিতাবে নিম্নলিখিত আলোচনা করেছি:

"এতে কোন সন্দেহ নেই যে, হালাল মুনাফা নির্ধারণ করার জন্য সুদের হার ব্যবহার করা পছন্দনীয় নয়। এতে লেনদেনটি নিদেনপক্ষে বাহ্যিকভাবে হলেও সুদী ঋণের সদৃশ হয়ে যায়। সুদের হারামের কাঠিন্যের প্রেক্ষাপটে এই বাহ্যিক সাদৃশ্য থেকেও যতদুর সম্ভব বাঁচা উচিৎ। কিন্তু এই বাস্তবতাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মুরাবাহা শুদ্ধ হবার জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয় হল, এটি এমন একটি প্রকৃত বেচাকেনা হবে যেখানে বেচাকেনার সকল প্রয়োজনীয় বিষয় ও ফলাফল পরিপূর্ণভাবে পাওয়া যাবে। কোন মুরাবাহায় যদি ইতোপূর্বে আলোচিত সকল শর্ত পাওয়া যায়, তাহলে শুধু মুনাফা নির্ধারণে সুদের হারকে উদ্বৃতি হিসেবে ব্যবহার করলে তা অশুদ্ধ এবং হারাম হয়ে যাবে না। কেননা, লেনদেনটি সুদের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়; সুদের হারকে শুধু উদ্বৃতি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এটি একটি উদাহরণের সাহায্যে বুঝা যেতে পারে।

ক ও খ দুই ভাই। ক মদের ব্যবসা করে, যা সম্পূর্ণরূপে হারাম। খ যেহেতু একজন আমলদার মুসলমান তাই সে ঐ ব্যবসাকে অপছন্দ করে। অতএব, সে মাদকমুক্ত পানীয়ের ব্যবসা আরম্ভ করে। কিন্তু সে ঐ পরিমাণ মুনাফা অর্জন করতে চায় যে পরিমাণ তার ভাই মদের ব্যবসা থেকে অর্জন করে। তাই সে গ্রাহকদের থেকে ঐ পরিমাণ মুনাফা নিতে সিদ্ধান্ত নেয়, যে পরিমাণ ক মদের উপর নেয়। এতে সে তার মুনাফার পরিমাণকে ক-এর নাজায়েয মুনাফার সাথে জড়িয়ে ফেলেছে। এতে যে কেউ পছন্দ হওয়া না হওয়ার প্রশ্ন উত্থাপন করতেই পারে। তবে এটা স্পষ্ট যে, কেউ একথা বলতে পারবে না, এই জায়েয ব্যবসা থেকে অর্জিত মুনাফা হারাম। কেননা, সে মদের মুনাফাকে শুধু উদ্বৃতি বা রেফারেন্স হিসেবে গ্রহণ করেছিল।

অনুরূপভাবে যদি মুরাবাহা ইসলামী মূলনীতির উপর থাকে এবং তার প্রয়োজনীয় শর্তাবলীও পূর্ণ করে, তাহলে মুনাফার হার প্রচলিত সুদের হারের বরাতে নির্ধারণ করলে চুক্তিটি নাজায়েয হয়ে যাবে না।

তবে এটা ঠিক যে, যতদ্রুত সম্ভব ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে এ পদ্ধতি থেকে পরিত্রাণের চেষ্টা করতে হবে।

(ইসালামী ব্যাংকারী কি বুনিয়াদী পৃ; ১২৪-১২৫)

এটাকে সুদের আরেকটি উদাহরণ থেকে বুঝা দরকার। একটি হাদিস ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, এক সাহাবী খায়বায় থেকে দুই সা' সাধারণ খেজুরের বিনিময়ে এক সা' পরিমাণ জুনাইব খেজুর কিনে নিয়ে আসলে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সুদ অভিহিত করে তার বিকল্প ব্যবস্থা বলে দিয়েছিলেন যে, দুই সা' সাধারণ খেজুরকে প্রথমে দেরহামের বিনিময়ে বিক্রয় কর, অতঃপর ঐ দেরহাম দিয়ে এক সা' জুনাইব খেজুর কিনে নাও। এখানে গবেষণার বিষয় হলো যে, সাধারণ খেজুর আর জুনাইব খেজুরের মধ্যে সুদের হার ছিল এক সা' বনাম দুই সা'। হুযুর বললেন, দুই সা' সাধারণ খেজুর দেরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করে তা দিয়ে এক সা' জুনাইব খেজুর কিনে নাও। এখন যার সাথে দুই সা' খেজুর কেনার লেনদেন করা হচ্ছে তার সাথে যদি এটা চূড়ান্ত করা হয় যে, এক সা' জুনাইব খেজুরের যা দাম হয় আমরা এই দুই সা'র দামও তাই নির্ধারণ করব, বাজারে খেজুরের দাম যাই হোক না কেন। এভাবে বেচাকেনা হলে তাকে কি শুধু সুদের হার সামনে রেখে তার দাম নির্ধারিত হয়েছে বলে নাজায়েয বলা হবে? এটা যদি নাজায়েয হত তাহলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই পদ্ধতি শিখিয়ে দেয়ার সময় –খেজুর দেরহামের বিনিময়ে বাজার দর অনুযায়ী বিক্রয় করবে– এই শর্তটি যুক্ত করে দিতেন, যেমনটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের হাদিসে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই শর্তযুক্ত করে দিয়ে বলেছেন-

'بسعريومها' (ابوداؤد، كتاب البيوع، باب ١٤ حديث ٣٣٠٤)

কিন্তু জুনাইব ওয়ালা হাদিসে তিনি এরকম কোন শর্ত আরোপ করেননি। যার উদ্দেশ্য হচ্ছে, উভয় পক্ষ যে দরেই দেরহামের বিনিময়ে সাধারণ খেজুর বিক্রয় করতে একমত হবে তাই সঠিক হবে। আর যেহেতু

জুনাইব খেজুর কেনাই উদ্দেশ্য তাই এক সা' পরিমান জুনাইব পেতে যে পরিমাণ দেরহাম প্রয়োজন, তাকেই মূল্য হিসেবে নির্ধারণ করাতে নাজায়েয হওয়ার কোন কারণ নেই। এখান থেকে আরো জানা যায় যে, কোন বেচাকেনা বা ইজারা যদি আপন শর্তাবলী অনুসারে সঠিক হয়, তাহলে তাকে শুধু সুদের সমান মূল্য বা ভাড়া নির্ধারণ করার কারণে হারাম বা সুদ বলা যেতে পারে না।

আমার হযরত আব্বা জান রহ.-এর জীবদ্দশায় এক ব্যক্তি হাউজ বিল্ডিং কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে ঘর নির্মাণের জন্য استصناع 'ইস্তেস্না' (অর্ডার দিয়ে মাল তৈরী করা)-এর ভিত্তিতে অর্থায়নের একটা পদ্ধতি অনুমোদন করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, এর জায়েয পদ্ধতি কী হতে পারে? আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ রফী উসমানী সাহেব এই প্রশ্নের উত্তর লিখেছিলেন, যার উপর হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ. সত্যায়ন করেছেন। এটা তখনকার (১৩৯৩ হিজরী মোতাবেক ১৯৭৩ ইং) কথা যখন সুদবিহীন ব্যাংকের কল্পনাও ছিল না। তখন উত্তরে এটাও উল্লেখ করা হয়েছিল "কর্পোরেশন সামগ্রিক নির্মাণের (মাল ও শ্রমসহ) মূল্য ততটুকু নির্ধারণ করবে যা মূল পুঁজি ও সুদের সমষ্টির সমপরিমাণ হয়।"-(নাওয়াদেরুল ফিকহ খন্ড:২ পৃ:১৩৬, মাসিক আল বালাগ শাওয়াল ১৩৯৩ হিজরী সংখ্যা)

সিকিউরিটি ডিপোজিটের শর্ত

ইজারার উপর আরেকটি আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে যে, "'শরয়ী ইজারা'র জন্য 'সিকিউরিটি ডিপোজিট'কে জরুরী ও আবশ্যকীয় শর্ত সাব্যস্ত করায় আরেকটি ফিক্বহী আপত্তি হয় যে, এ শর্ত ইজারার চুক্তির উপযুক্ত নয়, তাই জায়েয নয়।" -(মুরাওয়াজা ইসলামী ব্যাংকারী পৃ:২৮৬)

বাজারের কার্যক্রমের প্রতি মোটেই দৃষ্টিপাত না করে এই কথা বলা যেতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হল, আজকাল বাড়ি ও গাড়ির ইজারাসমূহে (যেমন- রেন্ট এ কার) এমন কোন ইজারা আছে কি যেখানে সিকিউরিটি ডিপোজিট রাখা হয় না? আপনি নিজে কোন ঘর ভাড়া নেন কিংবা দেন তাতে কি সিকিউরিটি ডিপোজিট রাখেন না? এই ডিপোজিট সাধরণত

এজন্যই রাখা হয়, যদি ইজারাগ্রহীতা বাড়ি অথবা গাড়ি ফেরত দেয়ার সময় তার পক্ষ থেকে কোন বাড়াবাড়ির কারণে এতে ক্ষতি হয় তাহলে এই ডিপোজিট থেকে যাতে তা উসুল করা যায়। এটাকে শরীয়ত মতে 'রেহেন' বা বন্ধক বলা যায় না। কেননা, 'রেহেন বিদ দারক' শুদ্ধ নয়। (দেখুন হেদায়া, কিতাবুর রেহেন, বাবু মা ইয়াজুযু ইরতেহানুহু)। দ্বিতীয়তঃ ইজারাগ্রহীতার পক্ষ থেকে এই অনুমতি দেয়া থাকে যে, ইজারাদাতা এটাকে তার মালের সাথে মিলিয়ে এর জামানত গ্রহণ করে। ফলে এটা ঋণ হয়ে যায়।[১]

ঐ মালে এই শর্ত এতবেশী প্রচলিত হয়ে গেছে যে, বর্তমানে এটা ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোন ইজারার কল্পনাই করা যায় না। আর হানাফীদের মূলনীতি হলো- কোন শর্ত চুক্তির চাহিদার বিপরীত হলেও প্রচলন ও

---

১. ফুক্বাহায়ে কেরাম বলেছেন, আমানতের রক্ষক যদি আমানতকারীর অনুমতিক্রমে আমানতকে নিজের মালের সাথে মিলিয়ে ফেলে তাহলে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মতে তার উপর আমানতকারীর মালিকানা শেষ হয়ে যায় এবং জামানতের শর্তে তা ব্যবহার করা রক্ষকের জন্য জায়েয হয়ে যায়। ইমাম মুহাম্মদ রহ.এর মতে তাদের উভয়ের অংশীদারী মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়।

وهذا إذا خلط الدراهم بغير إذنه فأما إذا خلط بإذنه فجواب أبي حنيفة رحمه الله تعالى لايخلف بل ينقطع حق المالك بكل حال وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه جعل الأقل تابعا للأكثر وقا ل محمد رحمه الله تعالى يشاركه بكل حال وكذلك أبويوسف رحمه الله تعالى في كل مائع خلطه بجنسه يعتبرالأكثر وأبوحنيفة رحمه الله تعالى يقول بإنقطاع حق المالك في الكل ومحمد رحمه الله تعالى بالشركة في الكل كذا في الكافي اهـ -(الفتاوى الهندية ٤:٣٤٩)

আল্লামা খালেদ আতাসী'র উদ্ধৃতি থেকে বুঝা যায় যে, ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতের উপরই ফতোয়া।–(শরহুল মাজাল্লা লি খালেদ আল আতাসী রহ. ৩/২৬৮)

তাছাড়া হযরত হাকীমুল উম্মত থানভী রহ. দুই জায়গায় অনুমতির রেওয়াজকে স্পষ্ট অনুমতির হুকুমে গণ্য করে এই ধরণের আমানতকে ঋণ সাব্যস্ত করেছেন। –(ইমদাদুল ফাতাওয়া খন্ড:২ পৃ:৫৭১ কিতাবুল ওয়াকফ প্রশ্ন:৬৯৪ এবং খন্ড:৩ কিতাবুল বুয়ূ পৃ:১৪৫ প্রশ্ন:১৯১)

ব্যবহারের কারণে তা জায়েয হয়ে যায়। এ ধরণের শর্ত যেগুলোকে হানাফীরা জায়েয বলেন তাকে দুররে মুখতারে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্য থেকে তৃতীয় প্রকারের উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছে:

"أو (جرى العرف به كبيع نعل)…. (على أن يحذوه) البائع (ويشركه) أي يضع عليه الشراك وهو السير، ومثله تسمير القبقاب (استحسانا) للتعامل بلا نكير. "

এর নিচে আল্লামা শামী রহ. লেখেন:

"قلت: وتدل عبارة البزازية والخانية وكذا مسئلة القبقاب على اعتبارالعرف الحادث، ومقتضى هذا أنه لو حدث عرف في شرط غيرالشرط في النعل والثوب والقبقاب أن يكون معتبرا إذ لم يؤد إلى المنازعة، و انظر ما حررناه في رسالتنا المسماة بنشرالعرف ـــ" -(ردالمحتار ج:٥ ص:٨٧—٨٨)

আল্লামা শামী রহ. তাঁর পুস্তিকা 'নশরুল উরফ'-এ লেখেন :

"(ويدل) على ذلك أنهم صرحوا بفساد البيع بشرط لايقتضيه العقد وفيه نفع لأحد العاقدين، واستدلوا على ذلك بنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، وبالقياس واستثنوا من ذلك ما جرى به العرف كبيع نعل على أن يحذوه البائع. قال في منح الغفار: فإن قلت : إذا لم يفسد الشرط المتعارف العقد يلزم أن يكون العرف قاضيا على الحديث. قلت: ليس بقاض عليه بل على القياس، لأن الحديث معلول بوقوع النزاع المخرج للعقدعن المقصود به، وهو قطع المنازعة، والعرف ينفي النزاع، فكان موافقا لمعنى الحديث، و لم يبق من الموانع إلا القياس. والعرف قاض عليه. انتهى فهذا غاية ما وصل إليه فهمي في تقريرهذه المسألة والله تعالى أعلم-

এই উদ্ধৃতির টিকায় লেখেন:

" هذا' وإن كان فيه تكلف وخروج عن الظاهر، ولكن دعـــا إليـــه الإحترازعن تضليل الأمة وتفسيقها بأمرلامحيص عن الخروج عنه إلابذلك. قال الشاعر:

إذا لم تكن إلا الأسنة مركبا
فما حيلة المضطرإلا ركوبها

على أن قواعد الشريعة تقتضيه، فإنها مبنية على التسييرلا على التشديد والتعسير، وما خُيِّرصلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيســـرهماعلى أمته، ومن القواعد الفقهية : إذا ضاق الأمر اتسع منه-"—(مجموعة رسائل ابن عابدين رسالة نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العـــرف ج:٢ ص:١٢١)

এখানে এটাও স্পষ্ট করা দরকার যে, বিভিন্ন ব্যাংকে সিকিউরিটি ডিপোজিট গ্রহণে বিভিন্ন পদ্ধতি প্রচলিত আছে। এগুলোর মধ্যে কিছু পদ্ধতির উপর ফিক্বহী দিক থেকে আপত্তিও আছে। উদাহরণস্বরূপ: সিকিউরিটি ডিপোজিট, যা মিশ্রিত হয়ে যাবার কারণে পরবর্তীতে ঋণ হয়ে যায়,-এর কারণে ভাড়ায় 'উজরাতে মিসিল' এর চেয়ে কমানো জায়েয নয়। তাই যেসব ব্যাংকে এই কারণে ভাড়া কমানো হয়, তা শরয়ী দৃষ্টিকোণে সঠিক হবে না। সুতরাং, সিকিউরিটি ডিপোজিট নেয়া হলে তার কারণে ভাড়া যাতে 'উজরাতে মিসিল' এর চেয়ে কম না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এ ডিপোজিট ব্যাংক তার লাভজনক কাজে ব্যবহার না করাটাই উত্তম। অতএব, স্টেটব্যাংকে সুদবিহীন যে টাকা রাখতে হয় অনেক সুদবিহীন ব্যাংক তাতে এই ডিপোজিটের টাকাও রেখে দেয়। এতে কোন মুনাফা না হলেও এতটুকু লাভ হয়, নিজের যে পরিমাণ টাকা স্টেট ব্যাংকে আবশ্যকীয়ভাবে রাখতে হয় তাতে সিকিউরিটি ডিপোজিটের সমপরিমাণ কম রাখতে পারে। তবে এটা এমন এক ফায়েদা যার সম্পর্ক সম্ভাব্য লাভ (opportunity cost)-এর ক্ষতিপুরণের সাথে। টাকার

লেনদেনে শরীয়ত মতে সম্ভাব্য লাভের কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। তাই এই পদ্ধতিতে কোন অসুবিধা নেই।

এ পদ্ধতি থেকে উত্তম পদ্ধতি হল, সিকিউরিটি ডিপোজিট হিসেবে যে টাকা উসুল করা হয় ঐ পরিমাণ টাকাকে ইজারার মোট মেয়াদের অগ্রিম ভাড়া হিসেবে উসুল করা যেতে পারে। অর্থাৎ, ভাড়া দুই ভাগে বিভক্ত হবে। এক: মাসিক বা বার্ষিক ভিত্তিতে উসুল করা হবে, দুই: ইজারার পুরো মেয়াদের বিপরীতে অগ্রিম হিসেবে অবশ্যকীয়ভাবে আদায় করা হবে। অগ্রিম ভাড়াটি যেহেতু পুরো মেয়াদের বিপরীতে নেয়া হবে তাই কোন কারণে মেয়াদের মাঝখানে যদি ইজারা শেষ হয়ে যায় তাহলে অগ্রিম ভাড়া থেকে অবশিষ্ট মেয়াদের সমপরিমাণ টাকা ইজারাগ্রহীতাকে ফেরত দিতে হবে। কিছু সুদবিহীন ব্যাংক এই পদ্ধতিটি গ্রহণ করেছে।

শিরকাতে মুতানাক্বাসা

সাধারণত বাড়ী ক্রয়ের ক্ষেত্রে 'শিরকাতে মুতানাক্বাসা'-এর পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। এখানে ব্যাংক ও গ্রাহক মিলে কোন বাড়ী খরিদ করে। উদাহরণস্বরূপ: মূল্যের শতকরা আশি ভাগ ব্যাংক পরিশোধ করে বাড়ীর শতকরা আশিভাগের মালিক ব্যাংক হয়, আর বাকী বিশ ভাগ গ্রাহক পরিশোধ করে ঐ বিশ ভাগের মালিক গ্রাহক হয়। এর পর ব্যাংক তার আশি ভাগের অংশ গ্রাহককে ভাড়ায় দেয়। গ্রাহক ধীরে ধীরে ব্যাংকের মালিকানাধীন অংশ কিনতে থাকে। যে পরিমাণে তার অংশ বৃদ্ধি পায় সেই পরিমাণে ব্যাংকের অবশিষ্টাংশ এবং ভাড়া কমতে থাকে। এ পদ্ধতির এক একটি অংশ আমি আমার কিতাব بحوث في قضايا فقهية معاصرة তে الطريق المشروعة للتمويل العقاري শীর্ষক অংশে আলোচনা করেছি। যাঁরা সুদবিহীন ব্যাংকিংয়ের উপর আপত্তি উত্থাপন করেছেন তাঁরা এই প্রবন্ধের কোন অংশেরই মোকাবেলা করেননি। 'মজলিসে তাহক্বীকে মাসায়িলে হাজেরা'র এক রেজুলেশনে অনেকটা এর মতো একটি পদ্ধতির উপর ঐকমত্য হয়েছে, যার ভাষা নিম্নরূপ:

"এজেন্টের অংশ হবে শিরকাহ'র ভিত্তিতে এবং বাড়ীর মালিকানায় উভয়ে অংশীদার হবে। পরে ব্যাংক তার অংশ 'মুরাবাহা মুয়াজ্জালা'র

Contents

ভিত্তিতে এজেন্টের কাছে বিক্রয় করবে। প্রারম্ভিকভাবে এটি মালিকানার অংশীদার এবং পরিশেষে মুরাবাহা মুয়াজ্জালা হবে।

দস্তাবেজে মুরাবাহা মুয়াজ্জালা ওয়াদা হিসেবে উল্লেখ করা হবে।"

(আহসানুল ফাতাওয়া খন্ড:৭ পৃ:১২৩-১২৪)

যারা সুদবিহীন ব্যাংকিংয়ের উপর আপত্তি উত্থাপন করেছেন তারা 'শিরকাতে মুতানাক্বাসা'র উপরও আপত্তি উত্থাপন করেছেন যে, এতে صفقة في صفقة বা এক লেনদেনের মধ্যে অন্য লেনদেন হয়ে যায়। আমার উক্ত প্রবন্ধে আমি নিজেই এই আপত্তি উল্লেখ করে এর উত্তরও দিয়েছি। ইতোপূর্বে ইজারার আলোচনায় صفقة في صـــفقة শীর্ষক অংশে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। যার সারমর্ম হল, কোন মূল লেনদেনে আরেকটি লেনদেন শর্ত হয় না। তবে এই তিনটি লেনদেন যথা- মালিকানা অংশীদারী, ইজারা এবং বেচাকেনা নিজ নিজ সময়ে ভিন্ন ভিন্নভাবে সম্পাদিত হয়। আর যে ওয়াদা লেনদেন থেকে পৃথকভাবে হয় তার উপর শর্তের আহকাম প্রযোজ্য হয় না। যার ফিক্বহী দলিল ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, যা এখানে পুণঃ উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন নেই।

ইলতেযাম বিত্ তাসাদ্দুক (সদকাকে আবশ্যকীয় করা)

এখানে আরেকটি আপত্তিকৃত মাসআলা হচ্ছে, ইলতেযাম বিত তাসাদ্দুক বা সদকাকে আবশ্যকীয় শর্ত করে দেয়া। মুরাবাহা আর ইজারা যাই হোক, গ্রাহক আবশ্যকীয় করে নেয় যে, আমি যদি নির্ধারিত সময়ে আমার আদায়ী অর্থ আদায় করতে না পারি তাহলে এত টাকা সদকা করব। তাদের আপত্তি হল, এটা কাউকে সদকা করতে বাধ্য করার শামিল। সদকাকে এভাবে আবশ্যকীয় করে নেয়ার সমর্থনে কিছু মালেকী উলামার মতের উপর ভরসা করা হয়েছে বিধায় তারা আপত্তি জানিয়ে বলেছেন, এটা এমন خروج عن المذهب (মাযহাব পরিত্যাগ), যার শর্তাবলী পূরণ হয়নি। এ আপত্তি অত্যন্ত জোরালোভাবে উত্থাপন করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, একে যারা জায়েয বলে তারা সুদকে জায়েয করেছে (নাউযু বিল্লাহ)।

আমি ভারাক্রান্ত হৃদয় এবং দরদ নিয়ে বলছি যে, অনুগ্রহপূর্বক এই মাসআলায় ঠান্ডা মাথায় চিন্তাভাবনা করার প্রয়োজন আছে। শুরুতে যখন সুদবিহীন ব্যাংকিংয়ের সুচনা হয়, তখন এ ধরনের কোন নিশ্চয়তা গ্রাহকের কাছ থেকে গ্রহণ করা হত না। কিন্তু মুরাবাহাতে একটি মূল্য নির্ধারিত হওয়ায় তা সময়মত আদায় না করলেও মূল্য বাড়ানো যায় না। এতে কিছু মানুষ অবৈধভাবে এর সুযোগ গ্রহণ করে বিরাট অংকের অবশ্য আদায়ী অর্থ আদায়ে টাল বাহানা এবং অনাকাঙ্খিত বিলম্ব করা শুরু করল। বলা বাহুল্য যে, এটা শুধু ব্যাংকের ক্ষতি নয়; বরং হাজার হাজার মানুষের ক্ষতি, যাদের গচ্ছিত আমানত দিয়ে ব্যাংক এসব লেনদেন করে। সুদের লেনদেনে দৈনন্দিন হিসেব সুদের মিটার চলতে থাকে বিধায় ঋণগ্রহীতা যতদিন দেরী করবে দৈনিক হিসাবে ততদিনের অতিরিক্ত টাকা তাকে পরিশোধ করতে হয়। কিন্তু সুদবিহীন বেচাকেনায় এরকম হতে পারে না বিধায় ঋণগ্রহীতা সুযোগ পেয়ে যতদিন ইচ্ছা দেরী করে। পরিতাপের বিষয় হল, একদিকে আমাদের সমাজে বদদ্বীনি ও স্বার্থপরতার সয়লাব, অন্যদিকে বিচারব্যবস্থা এমন যে, তাদের মাধ্যমে অধিকার আদায় করা 'জুয়ে শীর' (জুয়ে শীর বলা হয়, পর্বত খোদাইকৃত নদী বিশেষ, যা খনন করেছিলেন বিশ্বপ্রেমিক ফরহাদ; এই নদীপথে তার প্রেমিকা শীরীর ঘরে ফরহাদের বকরীর দুধ প্রবাহিত হত।) আনার মতো দুঃসাধ্য ব্যাপার। এ

সমস্যার আসল সমাধান তো হল, সমাজে দ্বীনদারি ও আমানতদারীর উন্নতি সাধন করা এবং দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা করা, যেখানে ন্যায়বিচার পাওয়া সহজ হয়। কিন্তু ভূখন্ডের বাস্তবতাকে তো অস্বীকার করার উপায় নেই। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যপ্রাচ্যের কিছু উলামা একটি প্রস্তাব পেশ করলেন এবং সেখানকার কোন কোন ব্যাংকে এর উপর কার্যক্রমও হয়েছে। তা ছিল, যে ব্যক্তির ব্যাপারে এটা প্রমাণিত হবে যে, অভাবের কারণে নয়; বরং শুধু স্বার্থসিদ্ধির জন্য আদায়ে বিলম্ব করে, তার উপর একটা জরিমানা আরোপ করা হবে। বিলম্বিত দিনগুলোতে ব্যাংক যদি নিজের আমানতে মুনাফা করে থাকে তাহলে সে মুনাফা হারে বিলম্বকারী জরিমানা আদায় করবে। তখন আমি জোরালোভাবে শুধু এর প্রতিবদই করিনি; বরং যেসব উলামায়ে কেরাম সেসময় সুদবিহীন ব্যাংকগুলোর পরামর্শদাতা ছিলেন তাদেরকেও এ কথার প্রবক্তা বানিয়ে ফেলেছিলাম যে, এই পদ্ধতি 'إما أن تقضي وإما أن تربي' -এর মতো হয়ে যাবে। এ বিষয়ে আমি আমার কিতাব 'বুহুসুন ফি কাজায়া ফিক্বহীয়্যা মুআসারা'–এর প্রথম খন্ডে 'বাই বিত তাক্বসীত' শীর্ষক আলোচনায় বিস্তারিত দলিল পেশ করেছি। অতএব, আল্লাহ পাকের মেহেরবাণীতে সর্বসম্মতিক্রমে এই দলিল গ্রহণ করে উক্ত প্রস্তাব আর কার্যকর করা হয়নি। কিন্তু মাসআলাটি আপন জায়গায় ছিল।

এ সময় এই প্রস্তাবটি সামনে আসে যে, জরিমানা আদায় করার পরিবর্তে টালবাহানাকারী ঋণগ্রহীতা কিছু সদকা আবশ্যকীয় করে নিবে। এতে ব্যাংকের আয় বৃদ্ধি না হলেও গ্রাহকের উপর একটি চাপ থাকবে। কিছু মালেকী উলামায়ে কেরামের বক্তব্য থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। অতঃপর এই মাসআলাটি 'মজলিসে তাহক্বীকে মাসায়িলে হাজেরা'য় পেশ করা হলে সেখানেও সবাই এ পদ্ধতি গ্রহণ করা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে একমত পোষণ করেন। উপস্থিতিদের মধ্যে শুধুমাত্র হযরত মাওলানা মুফতী আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব –সদকার এই টাকা ব্যাংকের মাধ্যমে ব্যয় হবে–এই কথার সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। এ ব্যাপারে আমাদেরও চিন্তা ছিল, যা হযরত মাওলানা মুফতী রশীদ আহমদ রহ. এই মজলিসের কার্য বিবরণীর টিকায় উল্লেখ করেছেন, যা আহসানুল ফাতাওয়া'র ৭নং খন্ড ১২১ নং পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এই আবশ্যকীয়তার উদ্দেশ্য ছিল,

যথা সময়ে আদায়ে গ্রাহকদের উপর একটা চাপ সৃষ্টি করা। আর এই চাপ তখন বিদ্যমান থাকবে না যখন সদকার দায়িত্ব গ্রাহকের উপর ছেড়ে দেয়া হবে। তাই মজলিস এটা নিয়ে আর চাপাচাপি করেনি। আবশ্যকীয়তার মাধ্যমে যদি কোন সদকা আবশ্যক হয়ে যায়, তাহলে তা সদকাই থাকবে; কোনভাবেই ব্যাংক তাকে তার আয় বলে গণ্য করতে পারবে না। তাই মজলিসে অনুমোদিত রেজুলেশনের ভাষা ছিল এরকম:

"সুদী লেনদেনে ঋনগ্রহীতা যথা সময়ে আদায় না করলে তার সুদ বাড়তে থাকে, তাই সুদের বোঝা কমানোর জন্য সে সর্বদাই সময়মত আদায় করার চেষ্টা করে। কিন্তু সুদবিহীন ব্যবস্থায় যদি সময়মত আদায় না করে তাহলে সুদ বাড়ার কোন ভয় নেই। এই প্রেক্ষাপটে কিছু বদদ্বীন লোক সুযোগের অসৎ ব্যবহার করে এবং আদায়ের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সময়মত আদায় করে না। এই আশংকায় প্রথম প্রথম পাকিস্তানে এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছিল যে, আনাদায়ের ক্ষেত্রে 'মার্কআপ'এর উপর আরো 'মার্কআপ' জুড়ে দেয়া হত।

কিন্তু এটাও যে এক প্রকার সুদ তা স্পষ্ট। তাই এটা জায়েয হতে পারে না। কিন্তু সাম্প্রতিককালের কিছু আলেম এর সমাধানে একটি প্রস্তাব পেশ করেছেন যে, 'এজেন্টের সাথে মুরাবাহা করার সময় এটা লিখিয়ে নিতে হবে যে, আদায়ের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি সময়মত আদায় না করে তাহলে সে আদায়যোগ্য ঋণের একটি নির্ধারিত শতকরা হারে কোন খয়রাতি ফান্ডে চাঁদা হিসেবে জমা করবে।'

এই উদ্দেশ্যে ব্যাংক একটি খয়রাতী ফান্ড কায়েম করবে। ব্যাংক এর মালিক হবে না এবং এই অর্থ ব্যাংকের আয়ের সাথে মিলাতে পারবে না। বরং এটা দ্বারা অসহায় গরীবদের সাহায্য এবং সুদবিহীন ঋণ দেয়ার কাজ করবে। কোন কোন মালেকী ফিক্বহবিদের মতে এমন আবশ্যকীয়করণ আইনগতভাবেও কার্যকর করা যায়। খয়রাতী ফান্ডে গ্রাহকের চাঁদা দেয়ার এই আবশ্যকীয়তা শুধু ঐ ক্ষেত্রেই হবে, যখন সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আদায় করবে না। কিন্তু বাস্তবেই যদি অভাবের কারণে আদায়ে অসমর্থ হয় তাহলে খয়রাতী ফান্ডে চাঁদা দেয়া জরুরী নয়। বক্ষমান রিপোর্টে এই প্রস্তাব অনুমোদন করে আরো বলা হয়েছে 'গ্রাহকের অভাব নির্ধারণ এভাবে

করা হবে যে, ইতোমধ্যে তার উপর হুকুম বিল ইফলাস বা গরীব হওয়ার হুকুম লাগানো হয়েছে' ।" –(আহসানুল ফাতাওয়া খন্ড:৭ পৃ:১২০-১২১)

সুদবিহীন ব্যাংকগুলোতে এই প্রস্তাবের উপর আমল করা শুরু হলে তাতে দু'টি শর্ত আরোপ করা হয়। এক: গ্রাহকের অভাবের কারণে আদায়ে বিলম্ব হলে তখন এ পদ্ধতি প্রযোজ্য হবে না। কেননা, কুরআনে কারীমে পরিস্কার নির্দেশ আছে: 'وإن كان ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة'। দুই: এভাবে যে টাকা উসুল হবে তা ব্যাংকের শরীয়া বোর্ডের নির্দেশনামত সমাজসেবামূলক কাজে ব্যয় হবে। ব্যাংকের কোন কাজে তা ব্যয় করা যাবে না। ব্যয় হওয়া পর্যন্ত তা আলাদা একাউন্টে থাকবে। এই একাউন্টে কোন লাভ আসলে তাও এর সাথে যুক্ত হবে। এ সদকা থেকে শরীয়া বোর্ডের কোন আত্মীয় স্বজনকে কোন টাকা দেয়া যাবে না। বরং অধিকাংশ কার্যক্ষেত্রে এটাও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, সদস্যদের সম্পৃক্ত কোন সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানেও কোন টাকা দেয়া যাবে না। কিছু ব্যাংকে এই কাজের জন্য একটি ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে, যার নামে ব্যাংকের কোন উল্লেখ থাকে না, যাতেকরে ঐ টাকা সেবামূলক উদ্দেশ্যে ব্যয় করার সময় ব্যাংক নিজের নাম ব্যবহার করতে না পারে এবং এর মাধ্যমে যাতে ব্যাংকের সুনামও অর্জিত না হয়।

এই প্রেক্ষাপট সামনে রেখে ঐ আপত্তিটির প্রতি লক্ষ্য করুন যেখানে বলা হয়েছে, "এই আবশ্যকীয় সদকার মাধ্যমে হানাফী মাযহাব থেকে বের হয়ে মালেকী কোন আলেমের অপ্রাধান্য মতকে গ্রহণ করা হয়েছে।"

এ ব্যাপারে আরজ হল, সত্যিকার অর্থে মাযহাব পরিত্যাগ তখনই বলা যাবে, যখন হানাফী ফিক্বহে স্পষ্টভাষায় নাজায়েয করা হয়েছে এমন কোন জিনিস অন্য কোন মাযহাব থেকে জায়েয করা হয়। যদি নিজের মাযহাবে এই মাসআলায় কোন সুস্পষ্ট বক্তব্য না থাকে অথবা তাকে আপন মাযহাবের কোন সাধারণ নিয়মের আওতাভুক্ত করা না যায় অথবা মাযহাব এ ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকে এবং অন্য কোন মাযহাবে এর সুস্পষ্ট বক্তব্য মিলে যায়, সেক্ষেত্রে ঐ মাযহাব থেকে সাহায্য নেয়াকে সত্যিকার অর্থে কখনোই মাযহাব পরিত্যাগ বলা যায় না; বরং এটা এমন বিষয় যার ব্যাপারে হানাফী ফিক্বহবিদ বলেন, 'قواعـــدنا لا تأبـــاه' (দেখুন রদ্দুল

মুহতার, বাবুস সালাতি ফিল কা'বাতি খন্ড:৬ পৃ:২৫৫, আদ দুররুল মুখতার বাবুল উশর খন্ড:২ পৃ: ৩২৮, আল বাহরুর রায়েক্ব কিতাবুল ক্বাজা খন্ড:৬ পৃ:৪৪৮)। এখানের অবস্থা হল, এই সদকা আবশ্যকীয় হওয়ার ব্যাপারে হানাফী ফিক্বহে কোন সুস্পষ্ট বক্তব্য নেই; বরং 'قد تجعل المواعيد لازمة لحاجة الناس' এই মূলনীতির ব্যাপকতায় একে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব এবং ঐ মূলনীতিরও অন্তর্ভুক্ত করা যায় যা ফিক্বহের কিতাবে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে:

'المواعيد باكتساء صورة التعليق تكون لازمة'

শরহুল আশবাহ ওয়ান নাযায়েরে আছে:

"قوله : ولا يلزم الوعد إلا إذا كان معلقا- قال بعض الفضلاء : لأنه إذا كان معلقا يظهر منه معنى الإلتزام كما في قوله: 'إن شفيت أحج' فشفي، يلزمه. ولو 'أحج' لم يلزمه بمجرده -

قوله : 'كما في كفالة البزازية' حيث قال في الفصل الأول من كتاب الكفالة : الذهب الذي لك على فلان أنا أدفعه وأسلمه إليك أو أقبضه مني، لايكون كفالة ما لم يقل لفظا يدل على اللزوم، كضمنت أو كفلت عليّ أو إليّ، وهذا إذا ذكره منجّزا. أما إذا ذكره معلقا بأن قال: إن لم يؤد فلان فأنا أدفعه إليك، ونحوه يكون كفالة، لما علم أن المواعيد بإكتساب صورة التعليق تكون لازمة. انتهى- ومثله في التتارخانية وفي البحرللمصنف نقلا عن الفتاوى الظهيرية والولوالجية: ولوقال: 'إن عوفيت صمت كذا' لم يجب عليه حتى يقول : 'لله عليّ' وهذا قياس. وفي الإستحسان يجب، فإن لم يكن تعليقا فلا يجب عليه قياسا واستحسانا.

نظيره ما إذا قال: 'أنا أحج' لاشيئ عليه، ولو قال: 'إن فعلت كذا فأناأحج' ففعل ذلك يلزمه ذلك انتهى –

أقول على ما هو الإستحسان يكون الواجب بإيجاب العبد شيئين: نذر و وعد مقترن بتعليق، فاستفده فإنه بالقبول حقيق. بقي أن يقال في مثل 'إن حئتني أكرمك' فجاءه هل يكون الإكرام على المعلّق واجبا ديانة و قضاء أو ديانة فقط ؟ محل نظر

(شرح الأشباه والنظائر ج:٢ ص:١١٠)

বিভিন্ন হানাফী ফক্বীহদের কিতাবে ব্যাপকভাবে আছে যে, ওয়াদা শর্তযুক্ত হলে অবশ্য পালনীয় হয়। যার অর্থ হল, যেকোন ওয়াদা যেকোন শর্তের সাথে যুক্ত করে দেয়া হলে তা আবশ্যকীয় হয়ে যায়। কিন্তু যেসব ফিক্বহবিদ কথাটি বলেছেন তাদের দেয়া উদাহরণগুলো গবেষণা করলে বুঝা যায় যে, তা কেবল দুই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। একটি হল, কাফালত বা তত্ত্বাবধান অন্যটি নযর বা মান্নত। সুতরাং, ফতোয়া বায্যাযীয়ার যে উদ্ধৃতি শরহুল আশবাহে উল্লেখিত হয়েছে তাতে উদাহরণসমূহ এই দুই ক্ষেত্রের সাথে সম্পর্কিত। একই ধরনের উদাহরণ ফতোয়া খানিয়ার আলকাফালাতু বিল মাল অধ্যায়ে ২য় খন্ড ৬০ পৃষ্ঠা, আল বাহরুরায়েক্বের কিতাবুস সাওম ২য় খন্ড ৫১৯ পৃষ্ঠা, ফতোয়া তাতারখানিয়ার কিতাবুস সাওম ২য় খন্ড ৩০৮ পৃষ্ঠা, জামেউল ফুসূলাইনের বাহসু আলফাযিল কাফালাহ ২য় খন্ড ৫৪ পৃষ্ঠা, রদ্দুল মুহতারের কিতাবুল কাফালাহ ৫ম খন্ড ২৮৮-২৮৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে। যেগুলো থেকে দৃশ্যত বুঝা যায় যে, এই নিয়ম নীতি শুধূ কাফালাহ ও নযরের সাথে সম্পৃক্ত। শরহুল আশবাহের উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে এই দুই ক্ষেত্র ছাড়া অন্য ক্ষেত্রের ব্যাপারে কোন ফয়সালা না করে 'মহল্লে নযর' বা গবেষণার বিষয় বলে রেখে দেয়া হয়েছে। সদকার শর্তযুক্ত ওয়াদা এক প্রকার নযর বা মান্নত। তাই হানাফীদের মূলনীতি মোতাবেক তা আবশ্যকীয়। যদি ধরে নেয়া হয় যে, তা এ নীতির অন্তর্ভুক্ত নয়, তবুও শরহুল আশবাহের উদ্ধৃতি অনুযায়ী 'গবেষণার বিষয়' হিসেবে এ ব্যাপারে মাযহাব নিশ্চুপ বলা যাবে।

এমতাবস্থায় অন্য কোন মাযহাব থেকে কোন মত গ্রহণ করা হলে তাকে 'মাযহাব পরিত্যাগ' বলা যাবে না।

যদি মনে করা হয় যে, এই মাসআলা হানাফী মাযহাবের বিরোধী, তাহলে বলতে হয়, কিছু নির্ভরযোগ্য উলামা পরামর্শ করে মালেকী উলামার মত গ্রহন করেছেন। আর এভাবে অন্য কোন মাযহাব থেকে কোন মাসআলা গ্রহণ করা নাজায়েয ও নিষিদ্ধ নয়। মূল হানাফী মাযহাবে ইমামতি, কুরআন শিক্ষা বা ফতোয়া দিয়ে মজুরী নেয়া জায়েয নয়। কিন্তু এ বিষয়ে কড়াকড়ি করা হলে দ্বীনি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবার আশংকায় হানাফী ফিক্বহবিদগণ ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর মাযহাব গ্রহণ করেছেন এবং এরই ভিত্তিতে সকল মাদরাসাগুলো পরিচালিত হচ্ছে।

লেনদেনে মানুষের অধিকার সংরক্ষণের জন্য কয়েকটি মাসআলায় হানাফী ফিক্বহবিদগণ অন্য মাযহাব মতে ফতোয়া দিয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ: কেউ যদি কারো কাছে পাওনা থাকে এবং সে তা আদায় করছে না। এই অবস্থায় কোনভাবে ঋণগ্রহীতার কিছু মাল, যা পাওনা মালের শ্রেণীভুক্ত নয়, ঋণদাতার কাছে চলে আসে। এ ক্ষেত্রে মূল হানাফী মাযহাব হল, ঋণদাতা ঐ মাল বিক্রয় করে তার হক উসুল করা জায়েয হবে না। কিন্তু মুতাআখখিরীন বা পরবর্তী হানাফী ফিক্বহবিদগণ এই মাসআলায় ইমাম শাফেয়ী রহ. মতের উপর ফতোয়া দিয়েছেন। সুতরাং, আল্লামা শামী রহ. আল্লামা হামভী রহ.-এর উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেন:

"إن عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس كان في زمانهم لمطاوعتهم في الحقوق. والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من أي مال كـــان، لاسيما في ديارنا لمداومتهم العقوق. قال الشاعر:

عفاء على هذا الزمان فإنه

زمان عقوق، لازمان حقوق"

(ردالمحتار، كتاب الحجر ج:٦ ص:١٥١)

দুররে মুখতারে আছে

"ليس لذي الحق أن يأخذ غيرجنس حقه، وجوّزه الشافعي وهو الأوسع."

এর নিচে আল্লামা শামী রহ. লেখেন :

"(قوله: وجوزه الشافعي) قدمنا في كتاب الحجر أن عدم الجواز كان في زمانهم. أما اليوم فالفتوى على الجواز. (قوله: وهو الأوسع) لتعينه طريقا لإستيفاء حقه فينتقل حقه من الصورة إلى المالية كما في الغصب والإتلاف مجتبى (در المحتار، كتاب الحظروالإباحة ج:٦ ص:١٥١)

ছিনতাইকৃত মালামালের ব্যাপারে হানাফীদের আসল মাযহাব হল, ছিনতাইকারী থেকে এর ক্ষতিপূরণ নেয়া যায় না। কিন্তু পরবর্তী ফিক্বহবিদগণ প্রথমে এতিমের মাল, ওয়াকফের মাল এবং পরে জমানোর জন্য প্রস্তুতকৃত মালের ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর মতের উপর ফতোয়া দিয়ে এসব মালের ছিনতাইয়ের ক্ষেত্রে ছিনতাইকারীর উপর ক্ষতিপূরণ আবশ্যকীয় করেছেন। আল্লামা ইবনুল হুমাম রহ. এবং আল্লামা ইবনে আমিরুল হাজ্জ রহ. বলেন, আজকাল মানুষকে ছিনতাইকারীদের জুলুম থেকে বাঁচানোর জন্য সার্বিকভাবে ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর মাযহাব মতে ফতোয়া দেয়া উচিৎ। আত তাক্বরীর ওয়াত তাহবীর কিতাবে আল্লামা ইবনে আমিরুল হাজ্জ রহ. লেখেন:

"وفي جامع الفتاوى نقلا عن المحيط : الصحيح لزوم الأجران مُعَدّا للإستغلال بكل حال، وحكى بعضهم الإجماع على ضمان المنافع بالغصب والإتلاف إذا كان العين مُعَدّا للإستغلال. بل وسيذكر المصنف في ذيل الكلام على العلة من مباحث القياس أنه ينبغي الفتوى بضمان المنافع مطلقا لوغلب غصبها وهوحسن."—(التقرير والتحبير لأبن أمير الحاج، ج:٢ ص:١٣٠ ط: المطبعة الكبرى ، مصر ١٣١٦)

একই কিতাবে আরেকটু পরে বলা হয়েছে :

"(وفتوى المتأخرين بالضمان بالسعاية بخلاف القياس استحسان لغلبة نسعاة) بغير الحق إلى الظلمة في زماننا وبه يفتى، لأن مجرد وكول الأمرإلى القاضي لايجدي في هذا المطلوب في زماننا. قال المصنف : (وينبغي مثله) أي الإفتاء بضمان إتلاف المنافع مطلقا زمانا ومكانا (لوغلب غصب المنافع) مطلقا فيهما وإن كان على خلاف القياس في باب الضمان زجرا للغصبة عن ذلك، وقد أسلفنا .... تقييد بعضهم ذلك بالأوقاف وأموال اليتامى وحكايةَ بعضهم الإجماع على ضمان المنافع بالغصب والإتلاف إذا كان العين مُعَدّا للإستغلال. وإذا كان الموجب لذلك الزجر للغصبة والحفظ لأموال الضَعَفة فلا بأس بالفتوى بضمانها حينئذ على الإطلاق لإحتياج ماسوى هؤلاء إلى هذا الارتفاق وحسما لمادة هذا الفساد بين العباد."—(التقرير والتحبير ج:٣ ص:٢٠٤)

ইমদাদুল ফাতাওয়াতে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. অনেক মাসআলায় লেনদেনের সহজীকরণের জন্য অন্য মাযহাবের উপর ফতোয়া দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ: বাইয়ে সালামে হানাফীদের নিকট শর্ত হল, নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত মুসাল্লাম ফিহি (অর্থাৎ যে মালে সালাম করা হয় তা) বাজারে মজুদ থাকবে। কিন্তু হযরত রহ. বলেছেন, এখানে ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর মতের উপর আমল করার সুযোগ আছে। তিনি বলেন:

"পণ্য নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত পাওয়া যাওয়া হানাফীদের মাযহাব অনুযায়ী শর্ত। কিন্তু শাফেয়ী রহ.-এর মতে শুধু নির্ধারিত মেয়াদের সময় পাওয়া যাওয়াই যথেষ্ট। যেমনটি হেদায়াতে আছে। প্রয়োজনে এর উপর আমল করলে অসুবিধা নেই, অনুমতি আছে।"

(ইমদাদুল ফাতাওয়া খন্ড:৩ পৃ:১০৬ প্রশ্ন:১৩২)

বাইয়ে সালামে হানাফীদের মাযহাব অনুযায়ী একমাসের সময়সীমা শর্ত। কিন্তু হযরত থানভী রহ. বলেন:

"এবং ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর মতে যেহেতু মেয়াদ শর্ত নয় তাই সালামে প্রবেশ করতে পারে। যেহেতু এর সাথে জনসাধারণের ব্যাপক সম্পৃক্ততা আছে তাই ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর মতের উপর আমল করার সুযোগ আছে।" –(প্রাগুক্ত খন্ড:৩ পৃ:২১)

হানাফী মাযহাবে মালের মাধ্যমে অংশীদারী জায়েয নাই, কিন্তু ইমাম মালেক রহ. এটাকে জায়েয বলেছেন। হযরত হাকীমুল উম্মত রহ. কোম্পানী জায়েয হওয়ার উপর আলোচনা করতে গিয়ে বলেন:

"কোম্পানী প্রতিষ্ঠাকারীদের পক্ষ থেকে ব্যয়ের মাধ্যমে অংশীদারী হবে না; বরং মালের মাধ্যমে অংশীদারী হবে। অনেক ইমামের নিকট এই পদ্ধতি জায়েয।

فيجوز الشركة والمضاربة بالعروض ... عند أحمدفي رواية، وهو قـــول مالك وابن ابي ليلى، كما ذكره الموفق في المغني-

(ইমদাদুল ফাতাওয়া খন্ড: ৩ পৃ:৪৯৫)

এই চুক্তির ভিত্তিতে পশুপালন করা যে, এগুলোতে যা বৃদ্ধি হবে তা আমরা পরস্পর ভাগাভাগি করে নেব –শুধু হানাফীদের দৃষ্টিতে নয়; বরং জমহুরের মতে নাজায়েয। কিন্তু হযরত থানভী রহ. বলেন :

"হানাফীদের নিয়ম অনুযায়ী এই চুক্তি নাজায়েয।.....কিন্তু কোন কোন সাহাবীর বর্ণনার ভিত্তিতে ইমাম আহমদ রহ.-এর নিকট জায়েয হওয়ার সুযোগ আছে। তাই বাঁচতে পারলে ভাল। যেখানে খুব বেশী ব্যাপক সম্পৃক্ততা আছে সেখানে প্রশস্ততার সুযোগ নেয়া যায়।

(প্রাগুক্ত খন্ড:৩ পৃ:৩৪৩)

আমি আমার আব্বাজান হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ.কে হযরত হাকীমুল উম্মত রহ.এর একটি কথা বারবার উদ্ধৃত করতে শুনেছি। তিনি বলতেন, আমি তৎকালীন আবু হনিফা হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ.-এর কাছ থেকে এই সুস্পষ্ট অনুমতি নিয়ে রেখেছিলাম যে, বিশেষ করে যেসব লেনদেনে জনগণের ব্যাপক সম্পৃক্ততা আছে সেখানে চার ইমামের মাযহাবের মধ্যে যে ইমামের মাযহাব মতে সুযোগ মিলে তাকেই কাজে লাগানো উচিৎ।

এ সূত্রে হযরত শায়খ আল্লামা ইউসুফ বিন্নুরী রহ.-এর বক্তব্য লক্ষ্য করুন, যা তিনি 'মাজমাউল বুহুসিল ইসলামীয়া'র এক সভায় 'বর্তমান সময়ের মাসআলাসমূহে ইজতেহাদ' বিষয়ে নিজ প্রবন্ধে পেশ করেছিলেন। এই বক্তব্যটির উর্দূ অনুবাদ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইদরীস মিরঠী রহ. বাইয়েনাতে প্রকাশ করেছিলেন। শুরুতেই হযরত রহ. বলেন :

"ইসলামী ও ইউরোপীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার সংঘর্ষের এই যুগে দুনিয়া সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী দু'টি ভাগে বিভক্ত। একদিকে সেসব উলামায়ে কেরাম, যারা কঠোরভাবে দ্বীনি অনুশাসন ও শরীয়তকে আঁকড়ে ধরার কারণে এমন কট্টর অবস্থান গ্রহণ করেছেন যে, বর্তমান সময়ে ইলম ও দ্বীনের খেদমতের জন্য যেসব চাহিদা ও মাধ্যমের খুবই প্রয়োজন তাকে পরিপূর্ণরূপে উপেক্ষা করে চলেছেন। অন্যদিকে সেসব মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন অস্বীকারীদের দল, যারা বর্তমান সময়ের সমস্যা ও জটিল বিষয়গুলো সম্পর্কে যথেষ্ঠ জ্ঞান রাখেন....... কিন্তু তাদের দ্বীনি অন্তর্দৃষ্টি ও ঈমানী তিক্ষ্ণবুদ্ধি এবং সঠিক গভীর দ্বীনি ইলম নেই, যা ছাড়া এসব সমস্যার সমাধান হতে পারে না। ফলে সন্দেহাতীতভাবে এই উভয় পক্ষই উম্মতের আশা পূরণে অপারগ। এ ধরণের আধুনিক মাসায়িল তাদের কোন এক দলের হাতে ছেড়ে দিয়ে বসে থাকাটা বিরাট ভুল ও বোকামী হবে। এতে দ্বীন ও মিল্লাতের দৃঢ়িকরণ এবং উম্মতের পিপাসা নিবারণ কোনটাই হবে না।"–(বাইয়্যেনাত, সফর সংখ্যা, ১৩৮৪ হিঃ পৃ:১৫-১৭)

অতঃপর তিনি আধুনিক মাসআলাসমূহের ফিক্বহী সমাধানের মূলনীতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন :

"যতদুর সম্ভব এবং যেভাবে সম্ভব আইম্মায়ে মুজতাহিদীনদের মত থেকে আমাদের দলিল পেশ করতে হবে। চার মাযহাবের বাইরে যাওয়া যাবে না। যদি কোন বিশেষ মাসআলায় এক মাযহাব ছেড়ে অন্য মাযহাব গ্রহণ করতে হয় অর্থাৎ, এই অনুকরণীয় মাযহাবগুলোর মধ্য থেকে যে মাযহাবেই আধুনিক সমস্যাগুলোর সমাধান মিলবে সেই মাযহাব থেকেই দলিল পেশ করতে হবে এবং তাকে আঁকড়ে ধরতে হবে। যাতেকরে প্রত্যেক নতুন মাসআলায় আমাদের ইজতেহাদ করতে এবং যার তার জন্য ইজতেহাদের দরজা খুলে দিতে না হয়। কেননা, সময়ের তাগিদ ও চাহিদার প্রয়োজন ইজতেহাদের দরজাকে পরিপূর্ণভাবে খুলেও দেয় না,

আবার বন্ধ এবং সীলও করে দেয় না। বরং এ বাড়াবাড়ির মাঝে সামঞ্জস্যপূর্ণ পথ অবলম্বন করাই হল 'সীরাতে মুস্তাকীম'। কঠিন প্রয়োজনের সময় ইজতেহাদ করতে হবে এবং তা চার মাযহাবের মূলনীতি ও কর্মপদ্ধতির বহির্ভূত ও মুক্ত যাতে না হয়।" -(বাইয়্যিনাত সফর সংখ্যা ১৩৮৪ হিঃ পৃ:২০)

আধুনিক মাসায়িলসমূহের সমাধানের মূলনীতি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত রহ. আরেকটি প্রবন্ধে লেখেন :

"মাবসূত, বাদায়ে', ক্বাজীখান থেকে শুরু করে তাহতাবী, রদ্দুল মুহতার, আত তাহরীরুল মুখতার পর্যন্ত হানাফী ফিক্বহের কিতাবের পৃষ্ঠা উল্টিয়েও যদি মাসআলা পাওয়া না যায় তাহলে বাকী তিন মাযহাবের মূল কিতাবগুলো দেখতে হবে। ফিক্বহে মালেকীতে মুদাওয়ানায়ে কুবরা থেকে হাত্তাব পর্যন্ত, ফিক্বহে শাফেয়ীতে কিতাবুল উম্ম থেকে তুহফাতুল মুহতাজ পর্যন্ত দেখতে হবে। সউদী সরকারের তত্ত্বাবধানে ফিক্বহে হাম্বলীর বিরাট সম্ভার ছাপার অক্ষরে উম্মতের সামনে এসেছে। সেখান থেকে মুগনীয়ে ইবনে কুদামা, আলমুহাররির এবং আল ইনসাফ ইত্যাদি দেখে নেয়াই যথেষ্ঠ। মোট কথা, প্রার্থিত মাসআলা এসব কিতাবে মিলে গেলে তার উপরই ফতোয়া দিয়ে দিবে। নতুন করে ইজতেহাদের কোন প্রয়োজন হবে না। আর যদি সুস্পষ্টভাবে না মিলে তাহলে সুস্পষ্ট মাসআলাসমূহের উপর ক্বিয়াস (অনুমান) করতে হবে। তবে ক্বিয়াস যাতে ক্বিয়াস মাআল ফারিক (অযৌক্তিক অনুমান) না হয়। ক্বিয়াসটি কোন পর্যায়ের তা উলামায়ে কেরাম নির্ধারণ করবেন।

যদি কোন প্রার্থিত মাসআলা সব মাযহাবে পাওয়া যায়, তবে হানাফী মাযহাবে কঠিন এবং অন্য মাযহাবে তূলনামূলক সহজ হয় এবং জনসাধারণও তার সাথে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত হয়, তাহলে উলামায়ে কেরামের একটি দল নিষ্ঠার সাথে গবেষণা করবে। তাদের যদি দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, ব্যাপক গণসম্পৃক্ততার কারণে দ্বীনি চাহিদা হল সহজতর হওয়া, তাহলে ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মাযহাবকে যথাক্রমে গ্রহণ করে তার উপর ফতোয়া দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

আমাদের বর্তমান সময়ের আকাবিরগণ এভাবেই বিবাহ বিচ্ছেদের সমস্যাগুলো সমাধান করেছেন। শেষদিককার হানাফী ফিক্বহবিদগণও নিরুদ্দেশ ব্যক্তির মাসআলাতেও এমনটি করেছেন। তবে মিথ্যাচার থেকে বাঁচা এবং সুযোগের সন্ধানকে লক্ষ্য উদ্দেশ্য না বানানো জরুরী। উদাহরণ স্বরূপ: বর্তমানে কব্জা বা নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করার আগেই বিক্রয় করা। বর্তমানের অনেক ব্যবসায়ীই এ কাজে লিপ্ত। এখন এ প্রেক্ষাপট চিন্তা করে পরিস্থিতি পূর্ণ পর্যবেক্ষণ করে যদি মনে করা হয় যে, এটা বাস্তবিক অপারগতা, অর্থব্যবস্থা এ ব্যাপারে বাধ্য এবং এটা ছাড়া কোন উপায়ই নেই তাহলে মালেকী মাযহাবের উপর ফতোয়া দিয়ে দেয়া যাবে যে, শুধু খাদ্যদ্রব্যের বেলায় কব্জার আগে বিক্রয় নাজায়েয। এ মাসআলাতে হাম্বলী মাযহাবও মালেকীদের মত। হাদীসে স্পষ্টভাবেই খাদ্যদ্রব্যের কথাই আছে। نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل ان يستوفيه (سنن) ইমাম আবু হানিফা রহ. ও ইমাম শাফেয়ী রহ. খাদ্যদ্রব্যের উপর অন্যান্য বিষয়কে ক্বিয়াস করে নিষেধ করে দিয়েছেন।" –(বাইয়্যিনাত রবিউস সানি ১৩৮৩ হিঃ/সেপ্টেম্বর ১৯৬৩ইং ফিকর ওয়া নযর শীর্ষক আলোচনা পৃ:৪-৫)

আরেকটি জায়গায় হযরত রহ. লেখেন:

"দ্বীনের আহকাম তিন প্রকার।

১. আহকামে মানসুসা ইত্তেফাকীয়া (কুরআন হাদীসে বর্ণিত সর্বসম্মত আহকাম)

২. আহকামে ইজতেহাদীয়া ইত্তেফাকীয়া (সর্বসম্মত ইজতেহাদী আহকাম)

৩. আহকামে ইজতেহাদীয়া খেলাফীয়া (বিরোধপূর্ণ ইজতেহাদী আহকাম)।

প্রথম দুই প্রকারে নতুন করে ইজতেহাদের কোন সুযোগ নেই। তৃতীয় প্রকারেও ইজতেহাদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি না। তবে এতটুকু সুযোগ আছে যে, প্রকৃতপক্ষে যদি হানাফী মাযহাবে তা কঠিন হয়, অথচ বাস্তবে উম্মতে মুহাম্মদীয়া সহজতর হবার মুখাপেক্ষী এবং অপারগতাও সঠিক ও বাস্তব; কাল্পনিক নয়, তাহলে অন্য মাযহাবমতে ফতোয়া দেয়া যাবে। প্রয়োজনীয়তা কোন্ পর্যায়ের বা আদৌ প্রয়োজনীয়তা আছে কি না

তা ফিক্বহবিদ আলেমগণ নির্ধারণ করবেন।" –(বাইয়্যিনাত রজব সংখ্যা ১৩৮৩ হিঃ / ডিসেম্বর ১৯৬৩ ইং পৃঃ ৬)

সম্ভবত ১৯৬৭ইং সনে হযরত শায়খ আল্লামা বিন্নুরী রহ.-এর আহ্বানে জামেয়াতুল উলুম আল ইসলামীয়া বিন্নুরী টাউনে দেশের অর্থনৈতিক বিশেষত কৃষি সংক্রান্ত মাসআলার উপর একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে হযয়ত শায়খ রহ. ছাড়াও হযরত মাওলানা মুফতী মাহমুদ রহ, হযরত মাওলানা মুফতী রশীদ আহমদ রহ., হযরত মাওলানা মুফতী ওয়ালী হাসান রহ. এবং হযরত মাওলানা মুফতী রফী উসমানী দা:বা: উপস্থিত ছিলেন। সেখানে এসব বুযুর্গরা আমি অধমকেও অংশগ্রহণ করার অনুমতি প্রদান করেছিলেন। হযরত আব্বাজান রহ. সেসময় অসুস্থ থাকার কারণে নিজে অংশগ্রহণ করতে পারেননি, আমাদের দুইভাইকে পাঠিয়েছিলেন। সভাটি কমবেশী এক সপ্তাহ পর্যন্ত চলেছিল এবং এ বুযুর্গরা কার্যবিবরণী লেখার জন্য আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। সভায় মাসায়িলের উপর আলোচনার পূর্বে কিছু মূলনীতি নির্ধারণ করা হয়, যার উপর সবাই একমত পোষণ করেন। এ মূলনীতিগুলোর মধ্যে একটি ছিল, লেনদেনের বেলায় যেখানে প্রশস্ততার প্রয়োজন হয় সেখানে চার মাযহাব থেকে কোন একটি মাযহাব গ্রহণ করা যাবে; তবে চার মাযহাবের বাইরে যাওয়া যাবে না। দুঃখের বিষয় হল, উক্ত সভার কার্যবিবরণীটি আমার কাগজপত্রের জঙ্গলে খুজে পাইনি। সম্ভবত জামেয়া বিন্নুরী টাউনের ফাইলসমূহে সংরক্ষিত থাকবে। আমার যতদুর মনে পড়ে আলোচনার মাঝে কিছু মসআলায় এই মূলনীতির উপর আমলও করা হয়েছিল।

সুদবিহীন ব্যাংকিংয়ের বিরুদ্ধে যেসব লেখা প্রকাশিত হয়েছে, তাতে মাযহাব পরিত্যাগকে এতো কঠোরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যে, এতে মনে হয় যেন কোন অমৌলিক মাসআলায় কোন মাযহাব পরিত্যাগ দ্বীন পরিত্যাগের সমতুল্য, আর সুদবিহীন ব্যাংকিংয়ের পুরো ব্যবস্থাই যেন মাযহাব পরিত্যাগের শামিল এবং যেন মাযহাব পরিত্যাগের বিষয়টি একক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই গ্রহণ করা হয়েছে। অথচ এর কোনটিই সত্য নয়। আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে, কোন অমৌলিক মাসআলায় অন্য মাযহাব গ্রহণ নতুন কোন বিষয় নয়। উপরোক্ত সকল উদাহরণেই এর উপর আমল করা হয়েছে। আপনারা আরো লক্ষ্য করেছেন যে, এ পর্যন্ত যতগুলো

মাসআলা আলোচিত হয়েছে তাতে এটিই একমাত্র মাসআলা যেখানে কিছু মালেকী ফিক্বহবিদের মতানুসারে ফতোয়া দেয়া হয়েছে। বিষয়টিও এমন যে, এটি নাজায়েয হওয়ার ব্যাপারে হানাফীদের কোন সুস্পষ্ট বক্তব্য নেই; বরং হানাফীদের বর্ণিত কিছু নিয়মের ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত। আরো লক্ষ্য করেছেন যে, এটা শুধু আব্দুর রহমান ইবনে দীনার রহ.-এর মতের উপর নির্ভর করেই বলা হয়নি; বরং সেসব মালেকী ফিক্বহবিদগণের পক্ষ থেকে এর সমর্থন মিলে, যারা বলেন যে, ওয়াদাকারী যদি ওয়াদাকৃত ব্যক্তিকে কোন কষ্টে ফেলে দেয় তাহলে ওয়াদাকারীর জন্য সে ওয়াদা পুরণ করা আবশ্যক। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা ওয়াদার আলোচনার শেষে ফাতহুল আলী আল মালেকীর উদ্ধৃতিতে করা হয়েছিল। আর আব্দুর রহমান ইবনে দীনার এমন কোন আলেম নন, যার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। তিনি ফিক্বহে মালেকীর নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী ঈসা ইবনে দীনারের ভাই, যিনি ফিক্বহে মালেকীর কিতাবসমূহ পশ্চিম থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় নিয়ে এসেছিলেন। আল্লামা হাত্তাব রহ. গুরুত্বের সাথে তাঁর মত উল্লেখপূর্বক তাকে 'শায' না বলে 'মুজতাহাদ ফীহি' বলেছেন। তিনি বলেছেন, কোন বিচারক এর উপর ফয়সালা দিলে তা কার্যকর হবে।-(তাহরীরুল কালাম ফি মাসায়িলিল ইলতেযাম পৃ:১৭৬ ও ১৮৫)। আব্দুর রহমান ইবনে দীনার রহ. সম্পর্কে বলা হয়েছে:

"عبد الرحمن بن دينار: ذكر الرازي في كتاب الإستيعاب في أنساب الأندلس- قال: أخبرنا واقد الغافقي أبوأمية غلبت عليه كنيته- وكان عالما زاهدا- وذكرعبدالرحمن فقال: كان فقيها عالما حافظا يكنى أبا زيد شدور بقرطبة- قا ل في كتاب آخر: وكانت له رحلات استوطن في احداها المدينة وهو الذي أدخل الكتب المعروفة بالمدينة- سمعها منه أخوه عيسى ثم خرج بها عيسى فعرضها على ابن القاسم- قا ل: وكان عبد الرحمن قد أخذه بالأندلس عن محمد بن يحيى السماني ومن الصغير- ويروى عن محمد بن ابراهيم بن دينار المدني وغيره- وتوفي يوم الجمعة لسبع خلون من المحرم

سنة إحدى ومائتين ومولده سنة ستين ومائة وكان هو وأخوه يتواليان إلى يزيد العتبي وذكر أن أصلهم من طليطلة- وبنو دينار معروفون بالعلم- قال هو عبد الرحمن دينار بن واقد ورجا بن عامر بن مالك الغافقي وذكر أنه لما لقي ابن القاسم في رحلته الأخرى وروى عنه سماعه، وعرض عليه المدونة وضمنها أشياء من رأيه وكان من الحفاظ المتقدمين والخيـــار الصـــالحين- استوطن قرطبة-'' –(ترتيب المدارك وتقريب المسالك ج:٣ ص:١٥ دار مكتبة الحياة، بيروت)

তাঁর এই কথা শুধু কোন এক ব্যক্তির একক মতের ভিত্তিতে নেয়া হয়নি; বরং এই মাসআলাটি প্রথমে 'মজলিসে তাহক্বীকে মাসায়িলে হাজেরা'র সভায় পেশ করা হয়, যার কার্যবিবরণীর ভাষা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। সে সভায় হযরত মাওলানা মুফতী রশিদ আহমদ রহ., হযরত মাওলানা মুফতী আব্দুশ শুকুর তিরমিযী রহ., হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ ওয়াজিহ রহ., হযরত মাওলানা সাহবান মাহমুদ রহ., হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ রফী উসমানী দা:বা: হযরত মাওলানা মুফতী আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব, খায়রুল মাদারিসের নায়েবে মুফতী মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার সাহেব উপস্থিত ছিলেন। মাসআলাটি মালেকী আলেমদের কাছ থেকে গ্রহণে হযরত মাওলানা মুফতী আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের ভিন্নমত ছিল না; বরং তাঁর মত ছিল, এই টাকা যেন ব্যাংকের মাধ্যমে ব্যয় না হয়। অন্য উলামাদেরও এ ব্যাপারে শংসয় ছিল; কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা কার্যবিবরণীতে এ শর্ত ঐসব কারণেই জুড়ে দেননি, যা আমি ইতোপূর্বে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। ঘটনাটি অনেক দিন আগের হওয়ায় আমার এখন একটুও মনে নেই কেন এই সভায় বিন্নুরী টাউন থেকে কেউ অংশগ্রহণ করেননি। হযরত আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ ইউসুফ বিন্নুরী রহ. এ মজলিসের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ছিলেন। এ মজলিসে সবসময় তিনি নিজে অথবা হযরত মাওলানা মুফতী ওয়ালি হাসান রহ. বরং অধিকাংশ সময় উভয়েই উপস্থিত থাকতেন। যতদুর মনে পড়ে, হযরতের ইন্তেকালের পরেও এই অবস্থা চলছিল। আল্লাহ পাকের মেহেরবানীতে কোন এসময় এমন হয়নি যে, কোন ক্লেশ বা মতপার্থক্যের কারণে জামেয়াতুল উলুম আল ইসলামীয়া বিন্নুরী টাউনের পক্ষ থেকে কেউ

অংশগ্রহণ করেননি। এরকম কোন পরিস্থিতি কোন সময়ই সৃষ্টি হয়নি। দৃশ্যত: মনে হচ্ছে, সেসময় হযরত মাওলানা মুফতী ওয়ালী হাসান রহ. অসুস্থতার কারণে অংশ নিতে পারেননি। এটা ছাড়া তৎকালীন পরিস্থিতি অনুযায়ী অন্য কিছু ঘটার সম্ভাবনা দেখছি না।

মাসিক বাইয়্যিনাতের যুলহাজ্জা ১৪২৯ হিঃ সংখ্যায় নুকতা বা'দাল উকু' (ঘটনার পর কারণ) হিসেবে বলা হয়েছে, যার সারাংশ হল, বিন্নুরী টাউনের দারুল ইফতা যেহেতু শুরু থেকেই কৌশলনির্ভর ইসলামী ব্যাংকিংয়ের বিরোধী, তাই এখান থেকে কেউ সেই মজলিসে অংশগ্রহণ করা সমীচীন মনে করা হয়নি। এর অর্থ দাঁড়ায়, ওখানকার মুফতী সাহেবরা আগে থেকেই জেনে গিয়েছিলেন যে, মজলিসে কৌশলের উপর ভিত্তি করে কোন প্রস্তাব আসবে, তার বিরোধীতা কঠিন হবে, তাই আলাদা থাকাই নিরাপদ মনে করা হয়েছে। এর উত্তরে নেয়ামতের শুকরিয়া হিসেবে আমি যদি বলি তাহলে বাড়াবাড়ি হবে না যে, আল্লাহ পাক তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে আমাকে হযরত শায়খ আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ ইউসুফ বিন্নুরী রহ. এবং হযরত মাওলানা মুফতী ওয়ালী হাসান রহ.-এর যতটুকু সান্নিধ্য দান করেছেন সম্ভবত বরং নিশ্চিতভাবে তা ওখানকার বর্তমান অধিকাংশ দারুল ইফতার বন্ধুদের হয়নি। তাদের মধ্যে অনেকে এসব বুযুর্গদের দেখেনওনি। আল্লাহ পাকের মেহেরবানীতে সফরে হাজরে হযরত বিন্নুরী রহ.-এর সাথে এই অধমের থাকার সুযোগ হয়েছে। আমি হযরতের ইলমী উপদেশ থেকে শুরু করে হযরতের খোশ মেজাজের কথা ও কাজ পর্যন্ত একেকটি কাজ ও ভঙ্গি থেকে বিশেষ উপকৃত হয়েছি। হযরত রহ.-এর সাথে একদিন নয়; পুরো সপ্তাহই কাটিয়েছি, তাঁর সাথে বিভিন্ন ইলমী মজলিসে উপস্থিত থেকেছি। হযরতের নির্দেশে ও তত্ত্বাবধানে অনেক লেখা রচনা করেছি এবং হযরতের সেসব স্নেহ-মমতার পাত্র ছিলাম, যার উল্লেখ করা আমার পক্ষে কঠিন। অনুরূপভাবে হযরত মাওলানা মুফতী ওয়ালী হাসান রহ.ও আমার শৈশবের উস্তাদ ছিলেন। আমি আমার জীবনের প্রথম ফতোয়া তাঁর কথায় লিখেছিলাম। অতঃপর ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন ফিক্বহী মজলিসে তার সান্নিধ্য থেকে উপকৃত হয়েছি। তাই আল্লাহার মেহেরবানীতে এসব মহান বুযুর্গদের ফিক্বহী, ইলমী এবং আমলী মেজাজ এবং চাহিদা সম্পর্কে আমার এতো ধারণা আছে, যার ভিত্তিতে উপরোক্ত ব্যাখ্যা নিশ্চিতভাবে নাকচ করতে পারি। বরং বেয়াদবী মনে না করলে এই তিক্ত কথাও বলতে পারি যে, এই মাসআলায় বর্তমানের দারুল ইফতার বন্ধুরা যে পথ অবলম্বন করেছেন তা

এসব বুযুর্গদের পথের সাথে মোটেই মিলে না, যাদের আমি বহু বছর প্রত্যক্ষ করেছি। এ কথার স্বাক্ষ্য জামেয়ার পুরনো সেসব উস্তাদরা দিয়েছেন, যারা এ বুযুর্গদের সান্নিধ্য পেয়েছেন এবং তাঁদের ফিক্বহী রুচি সম্পর্কে অবগত।

তাই ঐ মজলিসে বিন্নুরী টাউনের পক্ষ থেকে কেউ অংশগ্রহণ করেনি এটা সঠিক হলেও এ কথা বলা সঠিক হবে না যে, এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম ও মুফতীয়ানে কেরামদের সাথে কোন পরামর্শই হয়নি, যেমনটি প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। যাঁরা সেসময় পরামর্শে অংশ নিয়েছিলেন তাদেরকে তৎকালীন সময়ে মুফতীদের স্তম্ভ বলে মনে করা হত।

যাই হোক! 'মজলিসে তাহক্বীকে মাসায়িলে হাজেরা' তে এই মাসআলাটি ঐকমত্যের সাথে চুড়ান্ত হয়েছিল যে, মালেকী উলামাদের মত গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই। এই মাসআলাটি আবার বিভিন্ন বৈঠক ও সভায় উথাপিত হয়েছে যেখানে মালেকী উলামারাও উপস্থিত ছিলেন, সেখানেও অধিকাংশ উলামা এটাকে গ্রহণ করেছেন। সুতরাং, এক ব্যক্তির মতামতের ভিত্তিতে এই মত গ্রহণ করা হয়েছে– এ কথাটি কোনভাবেই সঠিক নয়।

এ বিষয়টিও গবেষণার দাবি রাখে যে, এই ধরণের সদকার আবশ্যকীয় করণ আইনগতভাবে আবশ্যক হওয়াটা কিছু মালেকী উলামার মত হলেও এটা যে দ্বীনদারির ভিত্তিতে ওয়াজিব সে ব্যাপারে সবাই একমত। সুদবিহীন ব্যাংকে গ্রাহকের পক্ষ থেকে যে আবশ্যকীয়করণ হয় তাতে এটা স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে না যে, এই আবশ্যকীয়করণ আইনগতভাবে আবশ্যক হবে। আমার জানা মতে এই লেনদেনে এমন কোন ঘটনা নেই যা আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে এবং সেখান থেকে তা আদায় করার ফয়সালা হয়েছে। তাই আদালতে গড়ানো ছাড়াই যদি এর উপর আমল হয়ে থাকে তাহলে কোন মাযহাব অনুযায়ীই তাতে আপত্তি থাকার কোন কারণ নেই। এতটুকু কথা থেকে যায় যে, সদকা ঐচ্ছিক থাকে এটাকে আবশ্যকীয় করে বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে আরজ হল, সব ধরণের মান্নতই এরকম যে, এর মাধ্যমে ঐচ্ছিক ইবাদত ওয়াজিব এবং আবশ্যকীয় হয়ে যায়।

মুদারাবা

যারা সুদবিহীন ব্যাংকে টাকা রাখে তাদের সাথে ব্যাংক মুদারাবার চুক্তি করে। যার সারাংশ হল, টাকা জমা কারীরা 'রাব্বুল মাল' (পুঁজিপতি) এবং ব্যাংক 'মুদারিব' (শ্রমের বিনিময়ে অংশীদার) হয়। এটাও চূড়ান্ত হয় যে, মুনাফা হলে উভয়ের মাঝে কী হারে ভাগ হবে, ক্ষতি হলে তা পুঁজিপতির পুঁজি থেকে হবে এবং মুদারিবের ক্ষতি হবে এতটুকু যে, তার পরিশ্রম বৃথা যাবে।

সুদবিহীন ব্যাংকে মুদারাবার উপর যেভাবে আমল হয় তার উপরও বিভিন্ন আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে কিছু আপত্তি এমন, যা বাস্তবতার সঠিক যাচাই ছাড়াই করা হয়েছে, যে সম্পর্কে ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপঃ বলা হয়েছে যে, মুদারিবের কাছ থেকে এ চুক্তি করার জন্য কোন ফিস নেয়া হয়। আমার জানামতে কোন সুদবিহীন ব্যাংক এমন নেই যারা এ ধরণের ফিস গ্রহণ করে, যাকে কিছু আপত্তিকারী 'মুদারাবা ফি' বলেছেন। অনুরূপভাবে ডলার একাউন্টের উপর ফিস গ্রহণের যে আপত্তি করা হয়েছে, তাও সঠিক নয়। এ রকম কোন ফিস নেয়া হচ্ছে না। অথচ আপত্তিগুলোতে তাই বলা হচ্ছে। কয়েক বছর আগে একটি সুদবিহীন ব্যাংক এই ফিস এজন্যই নেয়া শুরু করেছিল যে, দেশে ডলারের মাধ্যমে কাজকর্ম নিষেধ ছিল। তাই কেউ যদি ডলার রাখতে আসত, তাহলে সে ডলার হয় বাজারে বিক্রয় করে টাকায় রূপান্তরিত করতে হত অথবা দেশের বাইরে পাঠিয়ে কোন কারবারে লাগানো হত। স্থানান্তরের এই ব্যয়গুলো মেটানোর জন্য ব্যাংক এই ফি নির্ধারণ করেছিল। কিন্তু শরীয়া বোর্ডের কাছে এই মাসআলা আসলে তারা এর উপর গবেষণা করে তা অবশিষ্ট রাখার অনুমতি দেননি। ফলে তা পরিপূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়।

অনুরূপভাবে এই আপত্তিও সঠিক নয় যে, কোন ব্যক্তি একাউন্ট খোলার সময় জানে না যে, সে শিরকাহ করছে না মুদারাবা করছে। প্রকৃত সত্য হল, যে ফরমের মাধ্যমে একাউন্ট খোলা হয়ে থাকে তাতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে যে, একাউন্টহোল্ডার ও ব্যাংকের মাঝে

মুদারাবা'র সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে, যার ফলে ব্যাংক মুদারিব এবং একাউন্ট হোল্ডার পুঁজিপতি হয়। দেখুন :

3.1 The relationship between the Bank and the customer shall be based on the principles of Mudarabah where the customer is the Rab ul Maal and the Bank is the Mudarib.

"ব্যাংক ও গ্রাহকের মাঝে মুদারাবার ভিত্তিতে সম্পর্ক স্থাপিত হবে, যেখানে গ্রাহক রাব্বুল মাল এবং ব্যাংক মুদারিব হবে।"

তবে অনেক আগে কোন এক ব্যাংক এখানে শুধু মুদারাবার জায়গায় 'শিরকাহ/মুদারাবাহ' লিখে দিয়েছিল, এটা মনে করে যে, ব্যাংক যেখানে মুদারিব হয় সেখানে নিজের পুঁজিও অংশীদারী কারবারে খাটায়। এ হিসেবে সে শরীক বা অংশীদার হয়ে যায়। কিন্তু শরয়ী দিক থেকে তাকেও মুদারিব বলা হয়। যেমন, হানাফী ফিক্বহবিদগণ সামগ্রিকভাবে এটাকে 'মুদারাবা' হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। ইমাম তাহাবী রহ. বলেন,

"إذا قال المضارب: 'ضُمّ إليها ألفا من عندك واعمل بها مضاربة' قال أصحابنا: لابأس به وإن شرط فضل الربح للمضارب لأنه عامل

(اختلاف العلماء للطحاوي ج:٤ ص:٤٦)

তবে শুধু নিজের খাটানো পুঁজির হিসাবে এর উপর ঐ হুকুমই জারি হয়, যা অন্যান্য একাউন্ট হোল্ডারদের উপর জারি হয়। তাই পরবর্তীতে শুধু 'মুদারাবা' লিখে দেয়া হয়। আপত্তিকারীদের হাতে প্রথম ফরমটিই গিয়েছে যেখানে 'শিরকাহ/মুদারাবাহ' লেখা ছিল। এর ভিত্তিতেই তারা বলে দিয়েছেন যে, সম্পর্কটি কি শিরকাহ না মুদারাবা'র, তা নির্ধারিত নয়। এক হিসেবে তারাও ভুল বলেননি, কারণ, তা এক হিসেবে শিরকাহ আরেক হিসেবে মুদারাবা ছিল।

মুদারাবা'র ব্যয়

আরেকটি আপত্তি করা হয় যে, ব্যাংক মুদারিব হিসেবে নিজের সকল ব্যয় ডেপোজিটরদের উপর চাপিয়ে দেয়। সকল ব্যয় বাদ দিয়ে মুনাফা ভাগ করে। অথচ মুদারিব হিসেবে সকল দাফতরিক ব্যয়ভার তার

নিজেরই বহন করা উচিৎ। এই আপত্তিটিও প্রকৃত অবস্থা না জানার কারণে করা হয়েছে।

প্রকৃত পক্ষে সাধারণ শরয়ী নিয়ম হল, মুদারাবা'র সকল ব্যয় যাকে আরবীতে نفقات مباشرة উর্দূতে براه راست اخراجات এবং ইংরেজীতে উরৎবপঃ বীঢ়বহংবং বলা হয়, তা খোদ মুদারাবার মাল থেকে হবে। এ ব্যয়ে মাল ক্রয়, প্রেরণ ইত্যাদি ব্যয় শামিল হবে। মুদারিবের শুধু শ্রম থাকবে। কিন্তু মুদারিব যদি কোন প্রতিষ্ঠান হয় তখন পরিস্থিতি ভিন্ন। এ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের দাফতরিক ব্যয়, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ইত্যাদিকে আরবীতে نفقات غيرمباشرة উর্দূতে بالواسطه اخراجات এবং ইংরেজীতে ওহফরৎবপঃ বীঢ়বহংবং বলা হয়। সময়ের উলামায়ে কেরাম বলেছেন, মুদারিব কোন প্রতিষ্ঠান হলে এই ধরণের ব্যয় সে নিজেই বহন করবে। এ ব্যয় মুদারাবার মাল থেকে করবে না। বিষয়টি আমি আমার المضاربة المشتركة তে স্পষ্ট করেছি। প্রবন্ধটি আমার কিতাব بحوث في قضايا فقهية معاصرة-এর দ্বিতীয় খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং, সুদবিহীন ব্যাংকে যেখানে মুদারাবার ভিত্তিতে মানুষের টাকা রাখা হয়, সেখানে এই মূলনীতির ভিত্তিতেই কাজ হয় যে, সরাসরি ব্যয় মুদারাবার মাল থেকে করা হয়; অসরাসরি ব্যয় নয়।

আপত্তি উত্থাপনকারীরা এই মূলনীতি মানেন, যা উপরে উল্লেখিত হয়েছে (যদিও একদিকে তারা আইনগত ব্যক্তিকে অগ্রহণযোগ্য বলেছেন, অন্যদিকে এই মূলনীতিও মানেন যে, কোন প্রতিষ্ঠান তথা আইনগত ব্যক্তি মুদারিব হলে সেক্ষেত্রে অসরাসরি ব্যয়সমূহ মুদারাবার মাল থেকে নয়; বরং মুদারিবের দায়িত্বে থাকবে। এই দু'টি কথার মধ্যে কোন মিল খুঁজে পাই না)। কিন্তু তারা বলেন যে, সুদবিহীন ব্যাংক এই মূলনীতির উপর আমল না করে তাদের সকল প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়ও মুদারাবার মাল থেকে উসুল করে।

যেমনটি প্রথমে বলা হয়েছে যে, তারা পরিস্থিতি সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই এই আপত্তি উত্থাপন করেন। ফরমের নিম্নলিখিত বাক্যগুলোতেই

স্পষ্টভাবে বলা আছে যে, মুদারাবার মাল থেকে শুধু সরাসরি ব্যয়সমূহ Direct expenses মিটিয়ে মুনাফা বন্টন করা হবে।

3.4 The Bank shall share in the profit on the basis of a predetermined percentage of the gross income of the Business (the "Management Share"). The gross income of the Business is defined as all income of the Business minus all direct costs and expenses incurred in deriving that income.

অর্থাৎ "ব্যাংক কারবারের মোট আয়ের একটি পূর্বনির্ধারিত হারের ভিত্তিতে মুনাফায় অংশীদার হবে। 'মোট আয়' বলতে আয় করার জন্য যা সরাসরি বিনিয়োগ করা হয় এবং যা ব্যয় হয় তাকে বাদ দিয়ে পুরো আয়কে বুঝানো হয়।"

এখানে পরিস্কার করা হয়েছে যে, মুদারাবার মাল থেকে শুধু 'সরাসরি ব্যয়' মেটানো হবে। অবশিষ্ট মোট আয়ে উভয়ে অংশীদার হবে। মোট আয়ে 'অসরাসরি ব্যয়' অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ, মোট আয় থেকে তা বাদ দেয়া হয় না। সুতরাং, এর অর্থ হল, ব্যাংক নিজেই তা বহন করবে। সরাসরি ব্যয় এবং অসরাসরি ব্যয় একাউন্টিংয়ের পরিচিত পরিভাষা; যাতে কোন অস্পষ্টতা নেই।

ব্যাংকে একাউন্ট খোলার পর মুদারাবা ছাড়াও ব্যাংক আরো অনেকগুলো সেবা দিয়ে থাকে। যেগুলোর মধ্যে চেক ইস্যু করা, ড্রাফট বানানো, এক একাউন্ট থেকে অন্য একাউন্টে অর্থ স্থানান্তর, পে অর্ডার ইস্যু করা, এলসি খোলা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ ধরণের সেবাগুলোর জন্য নির্ধারিত ফি আছে। অনেক সময় এগুলোর উপর করারোপ করা হয়। মুদারাবা'র সাথে এসব কাজের কোন সম্পর্ক নেই। মুদারাবা থেকে পৃথক সম্পূর্ণ প্রশাসনিক ধরণের এই ফি এবং ব্যয় একাউন্ট হোল্ডারদের কাছ থেকে উসুল করা হয়। যেহেতু আপত্তি উত্থাপনকারীরা নিজে থেকে ব্যাংকে গিয়ে বিষয়গুলো যাচাই করেন না, তাই কেউ তাদেরকে কোন সুদবিহীন ব্যাংকের ফরমের এই বাক্য এনে দেখায়, যেখানে প্রশাসনিক ব্যয় ও ফিসের কথা আছে এবং এর অনুবাদ অসম্পূর্ণভাবে করা হয়েছে। এতে তাদের বিভ্রান্তি হয়েছে যে, অসরাসরি ব্যয়সমূহও মুদারাবা থেকে

উসুল করা হয়। অথচ সঠিকভাবে বাক্যগুলো পড়লে পরিস্কার হয়ে যায় যে, এখানে সেসব প্রশাসনিক ব্যয়ের কথা বলা হচ্ছে যা উপরে বিস্ত ারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। বাক্যগুলো নিম্নরূপঃ

21. CHARGES AND EXPENSES

21.1 The Bank may, without any further express authorization from the customer, debit any account of the customer maintained with the Bank for:

(i) All expenses, fees, commissions, taxes, duties or other charges and losses incurred, suffered or sustained by the Bank in connection with the opening/ operation/ maintenance of the Account and/ or providing the services and/ or for any other banking service which the Bank may extend to the Customer.

(ii) The amount of any all losses, claims, damages, costs, charges, expenses or other amount which the Bank may suffer, sustain or incur as consequence of acting upon the instructions

–(মুরাওয়াজা ইসলামী ব্যাংকারী পৃঃ ২০৪-২০৫)

এই বাক্যগুলোকে ঐ বাক্যের সাথে যেখানে শুধু সরাসরি ব্যয় মেটানোর কথা আছে, তা কোন একজন আইনজ্ঞ ব্যক্তি দিয়ে পড়িয়ে নিন। তিনিও আমরা উপরে যা বলেছি তা ছাড়া অন্য কোন অর্থ বলবেন না। তাই এই আপত্তিও সঠিক অবস্থা না জেনে করা হয়েছে।

দৈনিক উৎপানের ভিত্তিতে মুনাফা বন্টন

ব্যাংকের কর্মপদ্ধতি হল, যারা সেখানে অর্থ জমা রাখে তারা একটি সময়সীমার জন্য জমা রাখলেও একাউন্টে অর্থ জমা ও উত্তোলন ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে। এই প্রেক্ষাপট সামনে রেখে সুদবিহীন ব্যাংকসমূহে মুনাফা বন্টনের একটি কর্মপদ্ধতি হয়ে থাকে, যাকে 'দৈনিক উৎপাদন' বলা হয়, ইংরেজীতে Daily product বলা হয়, আরবীতে حساب النّمر বা حساب النقاط বলা হয়। এই কর্মপদ্ধতি

সম্পর্কে সর্বপ্রথম আলোচনা আমি সেসময় শুনেছি, যখন ইসলামী নযরিয়াতী কাউন্সিলে মাসআলাটি আলোচনায় এসেছিল। মাসআলা হল, যদি ব্যাংকে অর্থ জমা ও উত্তোলনের জন্য কোন তারিখ নির্ধারিত থাকে, যাতে সবাই একই তারিখে অর্থ জমা করবে এবং একই তারিখে লাভ-ক্ষতির ভিত্তিতে উত্তোলন করবে, মাঝখানে কেউ কোন অর্থ জমা কিংবা উত্তোলন কোনটাই করতে পারবে না, তাহলে মানুষের অনেক বেশী অসুবিধা হত। তাই বর্তমানে ব্যাংকে প্রচলিত অর্থ জমা ও উত্তোলনের ব্যবস্থা বহাল রাখা কি সম্ভব? ব্যাংকে অর্থ জমা করা আজকাল এক ব্যাপক প্রয়োজন হয়ে দাড়িয়েছে। এমনকি এই প্রয়োজনের কারণেই সুদী ব্যাংকের কারেন্ট একাউন্টে টাকা জমা রাখাকে বর্তমান সময়ের উলামারা ঐকমত্যের ভিত্তিতে জায়েয বলেছেন। অথচ, এ টাকা দিয়ে সুদী কাজের সহায়তা হয়। এখন নির্ধারিত তারিখে ব্যাংকে টাকা জমা করা কিংবা উত্তোলন করা প্রায় অসম্ভব। আর যদি বলা হয় যে, এই নির্ধারিত ছাড়া অন্য কোন দিন টাকা জমা দিতে হলে কারেন্ট একাউন্টে জমা দিতে হবে এবং তা মুদারাবার হিসাবে যোগ হবে না, তাহলে এর অর্থ হবে, এ ধরণের টাকা থেকে ব্যাংক মুনাফা পাবে কিন্তু টাকার মালিকরা মুনাফা পাবে না।

এসব বিষয় সামনে রেখে ইসলামী নযরিয়াতী কাউন্সিলে এই প্রস্তাব করা হয় যে, টাকা যখনই রাখা হোক তাকে দৈনিক উৎপাদনের হিসাব পদ্ধতি অনুযায়ী মুনাফায় শরীক করা হবে। দৈনিক উৎপাদনের হিসাব পদ্ধতির অর্থ হল, মুদারাবার মেয়াদ শেষে যে মুনাফা আসবে তার ব্যাপারে হিসাব করা হবে যে, মধ্যবর্তী দিনে টাকা প্রতি কত মুনাফা হয়? উদাহরণ স্বরূপ: ত্রিশ দিনে তিনশত টাকায় ত্রিশ টাকা মুনাফা হয়। এর অর্থ হল, তিনশত টাকায় দৈনিক এক টাকা মুনাফা হয়েছে। সুতরাং, এক টাকার দৈনিক মুনাফা ০.০০৩৩৩ হবে। এখন যদি কোন মানুষের একটাকা পনের দিন মুদারাবা খাতে থাকে তাহলে একটাকাকে পনের দিয়ে গুন করতে হবে। যার ফল দাঁড়ায়, পনের দিনে এক টাকায় ০.০৪৯৯৯ মুনাফা আসে। আর কারো দশ টাকা পনের দিন থাকলে ঐ মুনাফাকে দশ দিয়ে গুন করলে তার মুনাফা ০.৪৯৯৯ হয়। এই পদ্ধতিকে দৈনিক উৎপাদন পদ্ধতি বলা হয়।

এসব বিষয় সামনে রেখে ইসলামী নযরিয়াতী কাউন্সিল সুদবিহীন ব্যাংকের জন্য এই কর্মপদ্ধতি অনুমোদন করে, যা কাউন্সিলের রিপোর্টের ৪৮ নং পৃষ্ঠায় 'ব্যাংক ডিপোজিটস' শিরোনামে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি তখন কাউন্সিলের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য ছিলাম। কিন্তু কাউন্সিলের উলামা সদস্যদের মধ্যে হযরত মাওলানা শামসুল আফগানী রহ. হযরত মাওলানা মুফতী সাইয়্যাহুদ্দীন কাকাখীল রহ. এবং বেরেলভীদের মধ্য থেকে হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ হুসাইন নঈমী রহ. এবং পীর কামরুদ্দীন সিয়ালভী রহ. অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

যেখানেই সুদবিহীন ব্যাংক হচ্ছিল সেখানেই এই কর্মপদ্ধতি আলোচনায় এসেছে এবং সব জায়গাতেই এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। সুতরাং, শায়খ ওয়াহবা যুহাইলী দা:বা: তাঁর সুপ্রসিদ্ধ কিতাব الفقه الإسلامي وأدلته তে এ বিষয়ে এভাবে আলোচনা করেছেন:

"يتحدد عائد الإستثمارفي المصارف الإسلاميةعلى النحو الذي يجري في الشركات المساهمة في خلال فترة زمنية معينة، وهي سنة مالية نظرا لاستمرار المضاربة المشتركة- وعلى ذلك فإن الربح المعلن في نهاية كل سنة مالية لا يتقرر إلا للمبلغ الذي يبقى من أول السنة إلى نهايتها- فإذا استرد المستثمرفي المضاربة المشتركة كاملَ مبلغه أوجزءً منه قبل انتهاء السنة حيث لايكون هناك إعلان للربح الذي يجري حسابه وإعلانه للتوزيع في نهاية تلك السنة-

ولهذا نظيرمماثل في المضاربة الخاصة المقرراحكامها لدى فقهائنا- ذكرالرملي في نهاية المحتاج : أنه إذا استرد المالك بعض مال القراض قبل ظهور ربح أو خسارة فإن المال المضارب به يرجع إلى الباقي لأن مالك المال لم يترك في يد المضارب غيره فصار كما لو اقتصرفي الإبتداء على إعطائه- (نهاية المحتاج: ٤/١٧٦) ويعرف العائد بضرب المبلغ المستثمر في

المدة التي بقي فيها في الإستثمار، والحاصل هو المعروف في اعمال البنــوك الربوية بنظام الأعداد أو النِّمر: وهو ضربالرصيد اليومي في عدد الأيام التي مكثتها هذا الرصيد- والعدد الناتج هو مقدار الفائدة لمدة يوم واحد- علماً بأن الربح يكون بالمال أو بالعمل حسب الإتفاق أو بضمان العمل كما في شركة الأعمال وتضمين الغاصب؛ لأن الغنم مقابــل الغــرم او الخــراج بالضمان أي مستحق بسببه (بدائع: ٦/٧٧)- فإذا صار الشريك ضـــامنا بسبب ماكان جميع الربح له لضمانه إياه لأنه خراج المال-

وبما أن الإستثمار اللاربوي إستثمارإنتاجي يعتمد على الربح الفعلــي الذي لا يتحقق بالسرعة التي يبدأ فيها الإستثمارالمصرفي حركة الحساب في ميدان الفوائد فإن الطريقة الحسابية المصرفية في البنوك الإسلامية تكــون المدة فيها على أساس الشهور بدل الأيام- فمن يدفع ألف دينارللإستثمار السنوي لايتساوي مع من يدفع نفس الألــف في منتصـــف الأيـــام أي الإستثمار لمدة ستة أشهرفقط ويكون عائد الإستثمارالسنوي أكثربنســبة مثلاً وعائد الإستثمار النصف السنوي ٧٪ فإن اقتصر الإســتثمار علــى نصف سنة فقط فتكون النسبة نصف نسبة العائد السنوي-

وذكر الدكتور أحمد النجار: أن وحدة المدة إما اليوم أو الأســبوع أو الشهر وفقا لما تقرره اللوائح التنظيمية المعتمدة للبنــك وتكــون معلنــةً للمستثمرين- وهذا مقبول من حيث المبدأ إن تحقق الربح كمــا ســيأتي بيانه- وأضاف الدكتور النجار: أنه في حالات تغيرمبلغ المســتثمرالواحد خلال السنة بأن تتناولها الإضافةأو السحب يكون حساب النِّمرعلى أساس أرصدة الإستثمارعقب كل تعديل مابين تاريخ التعــديل وتــاريخ إنهـــاء

الإستثمارأو نهاية السنة المالية أيهما اقرب- كما يمكن كطريق آخرأخـــذ الفرق بين نمرالمبالغ المضافة للإستثمار ونمرالمبالغ المسحوبة محسوبة من تاريخ الإضافة ومن تاريخ السحب إلى تاريخ إنهاء الإستثمار أو تـــاريخ إنتـــهاء السنة المالية أيهما أقرب- وإن اتباع أي من الطريقين يعطي نفس النّمرالتي تعطيها الطريقة الأخرى-" —(الفقه الإسلامي وأدلته ج:٩ ص:٤٦١—٤٦٢ دار الفكر دمشق)

আমিও আমার কিতাব بحوث في قضايا فقهية معاصرة -এর দ্বিতীয় খন্ডে এই পদ্ধতির উপর আলোচনা করেছি। যার সারাংশ হল, এটি একটি নতুন কর্মপদ্ধতি, যার সুস্পষ্ট উল্লেখ ফিকহের কিতাবগুলোতে পাওয়া সম্ভব নয়। যেহেতু এটি একটি নতুন পরিস্থিতি, যার প্রয়োজনীয়তার কথা তখন কল্পনায় আসেনি, তাই এটাকে শিরকাহ ও মুদারাবা'র মৌলিক মূলনীতিসমূহের আলোকে দেখতে হবে। কুরআন ও হাদীসে শিরকাহ ও মুদারাবা'র ব্যাপারে মৌলিক নির্দেশনা দেয়া আছে। যার আলোকে ন্যায়নীতির সাধারণ মূলনীতি এবং প্রচলন ও রেওয়াজের ভিত্তিতে ফুক্বাহায়ে কেরাম আহকাম নির্ধারিত করেছেন। শিরকাহ ও মুদারাবা'র মুনাফা বন্টনে যে মৌলিক নিয়ম ফুক্বাহায়ে কেরাম বর্ণনা করেছেন তা হল, الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على قدرالمال অর্থাৎ, "অংশীদাররা যে মূলনীতির উপর একমত হবেন তার ভিত্তিতেই মুনাফা বন্টিত হবে। আর লোকসান হবে পুঁজির সমপরিমাণ"। হেদায়ার রচয়িতা এই মূলনীতিকে হাদীসে মারফূ' হিসেবে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু হেদায়ার 'তাখরীজাতে' বলা হয়েছে, এই শব্দে কোন মারফূ' হাদীস নেই, তবে হযরত আলী রাজি. এবং বেশকিছু তাবেঈনদের কাছ থেকে এই মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে।

(١) أخبرنا عبد الرزاق قال: قال القيس بن الربيع عن أبي الحصين عن الشعبي عن علي في المضاربة: 'الوضيعة على المال والربح على ما اصطلحوا عليه-'

وأما الثوري فذكره عن أبي حصين عن علي في المضاربة أو الشريكين- -(مصنف عبد الرزاق، كتاب البيوع، باب نفقة المضارب ووضيعته، رقم ١٥٠٨٧ ج:٨ ص:٢٤٧ ط: المجلس العلمي)

(٢) روينا من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن أبي حصين قال قال علي بن أبي طالب في المضارب وفي الشريكين : 'الربح على ما اصطلحا عليه' - رواه ابن حزم في المحلى ١٢٦/٨ وسنده صحيح مرسل، ورواه عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن الشعبي عنه <التلخيص ٢/٢٥٥>(إعلاء السنن، باب شركة العنان وأحكامها، ج:١٣ ص:٧٦)

(٣) ..... عن إبراهيم والشعبي في الشريكين قالا: 'الشركة على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال-'

(٤) ..... عن أبي جعفرقال: 'إذا اشترى الرجل المتاع وأشرك فيه أحدا فالربح على ما اشترطا عليه والوضيعة على المال-'

(٥) ..... عن الحسن وابن سيرين قالا: 'الربح على ما اشترطا عليه والوضيعة على المال-'

(٦) ..... عن شعبة قال : سألت الحكيم وحمادا وقتادة عن رجلين اشتركا فجاء أحدهما بألفين وجاء الآخربألف فاشتركا واشترطا أن الوضيعة بينهما والربح نصفين فقال : 'الربح على ما اشترطا عليه والوضيعة على المال-' -(المصنف لإبن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية،

باب في الشريكين: من قال الربح على ما اصطلحا عليه الخـــ، رقم الآثار بالترتيـــب: ٢٠٣٢٧، ٢٠٣٢٨، ٢٠٣٣٠، ٢٠٣٤، ج:١٠ ص:٤٨٥–٤٨٦ ط:شركة دارالقبلة)

(٧) ..... عن قتادة ..... قال: '..... الربح على ما اصطلحوا عليـــه والوضيعة على المال-'

(٨) أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن سيرين وأبي قلابة قالا في المضاربة: 'الوضيعة على المال والربح على ما اصطلحوا عليه-'

(٩) أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن أبي حصـــين وعـــن هاشم أبي كليب وعن إبراهيم وإسماعيل الأسدي عن الشـــعبي وعاصـــم الأحول عن جابربن زيد قالوا: 'الربح على ما اصطلحواعليه والوضـــيعة على المال. هذا في الشريكين فإن هذا بمئة وهذا بمئتين-' -(مصنف عبـــد الـــرزاق، كتـــاب البيـــوع، بـــاب نفقـــة المضـــارب الخـــــ، رقـــم الآثاربالترتيب:١٥٠٨١، ١٥٠٨٥، ١٥٠٨٩ ج:٨ ص:٢٤٧)

এইসব মূলনীতি থেকে বুঝা যায় যে, কারবারের লোকসান সর্বদা পুঁজির উপরই পড়ে। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি যে পরিমাণে পুঁজি খাটাবে সে সে পরিমাণে লোকসান বরদাস্ত করবে। যদি কেউ এর বিপরীত কোন পারস্পরিক চুক্তি করে যে, কোন এক পক্ষ লোকসান বহন করবে বা কোন এক পক্ষ তার খাটানো পুঁজি থেকে কম বা বেশী বহন করবে তাহলে তা নাজায়েয হবে। কিন্তু যতদুর মুনাফা বন্টনের প্রশ্ন, যতক্ষণ পর্যন্ত সব অংশীদার মুনাফা পায় এবং এমন কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয় যাতে এক অংশীদার মুনাফা পায় আর অন্য অংশীদার পায় না (যাকে ফুক্বাহায়ে কেরাম انقطـــاع الشـــركة বলে অভিহিত করেছেন) ততক্ষণ পর্যন্ত

পারস্পরিক সন্তুষ্টির ভিত্তিতে মুনাফা যে কোন হারেই বন্টনের সিদ্ধান্ত নেয়া যায়। এই বিভিন্ন হারকে ব্যাকিংয়ের ভাষায় 'ওজন' বা ওয়েটেইজ (weightage) বলা হয়। হযরত আলী রাজি.-এর যে বর্ণনার উপর ভিত্তি করে হানাফী ফিক্বহবিগণ এই মূলনীতি উদ্ভাবন করেছেন তা শিরকাহ ও মুদারাবা উভয়টির জন্য প্রযোজ্য। সুতরাং, মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাকে আছে:

"وأما الثوري فذكره عن أبي حصين عن علي في المضاربة أو الشريكين-" —(مصنف عبد الرزاق، كتاب البيوع، باب نفقة المضارب ووضيعته، رقم:١٥٠٨٧ ج:٨ ص:٢٤٧)

ফুক্বাহায়ে কেরাম আরো বলেছেন, মুদারাবায় যদি মুনাফার হার বিভিন্ন রকম নির্ধারণ করা হয় তা জায়েয আছে। বাদায়েউস সানায়ে' কিতাবে আছে:

"وقال ابن سماعة: سمعت محمدا قال في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة فقال له: إن اشتريت به الحنطة فلك من الربح النصف ولي النصف، وإن اشتريت به الدقيق فلك الثلث ولي الثلثان، فقال: هذا جائزوله أن يشتري أيّ ذلك شاء على ما سمّي له رب المال؛ لأنه خيّره بين عملين مختلفين فيجوز، كما لو خيّر الخيّاط بين الخياطة الرومية والفارسية- ولودفع إليه على أنه إن عمل في المصرفله ثلث الربح، وإن سافر فله النصف جاز، والربح بينهما على ما شرطا إن عمل في المصر فله الثلث وإن سافر فله النصف-" —(بدائع الصنائع، كتاب الضاربة ج:٦ ص:٩٩ ط: إيچايم سعيد)

দৃশ্যত: এখানেও শিরকাহ ও মুদারাবা'র মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কেননা, মুনাফার হার নির্ধারিত হওয়া শিরকায় যেমন জরুরী তেমনিভাবে মুদারাবয়ও জরুরী। (দেখুন শিরকা'র জন্য বাদায়ে সানায়ে' খন্ড:৬ পৃ:১৫৯ এবং মুদারাবার জন্য খন্ড:৬ পৃ:৮৫)।

এখন একটু ব্যাংক একাউন্টের ফিক্বহী দিক লক্ষ্য করুন।

যারা ব্যাকের একাউন্টে টাকা জমা রাখেন তারা পরস্পর শিরকাহ বা অংশীদারী কারবার করেন। আবার সবাই মিলে ব্যাংকের সাথে মুদারাবা করেন, যেখানে একাউন্ট হোল্ডারগণ আরবাবুল আমওয়াল বা পুঁজিপতি এবং ব্যাংক মুদারিব হয়। অনেক ব্যক্তি মিলে একজনের সাথে মুদারাবা'র চুক্তি করাতে ফিক্বহী দিক থেকে কোন আপত্তি নেই। শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের অনেক কিতাবে এর সুস্পষ্ট বর্ণনা আছে। যদিও হানাফী কিতাবে এর সুস্পষ্ট কিছু আমি পাইনি, তবে আল্লামা ইবনে ক্বুদামা রহ. ইমাম আবু হানিফা রহ. থেকে একটি মাসআলা উদ্ধৃত করেছেন, যা থেকে বুঝা যায় যে, ইমাম আবু হানিফা রহ.ও এটাকে জায়েয বলেছেন। সাথে তাঁর মতে এ ক্ষেত্রে পুঁজিপতিদের মাঝে মুনাফার তারতম্যও জায়েয আছে। লক্ষ্য করুন, আল্লামা ইবনে ক্বুদামা রহ. লেখেন:

”وان قارض إثنان واحدا بألف جاز. وإذا شرطا له ربحا متساويا منهما جاز، وان شرط أحدهما له النصف والآخرالثلث جاز، ويكون باقي ربح مال كل واحد منهما لصاحبه، وإن شرطا كون الباقي من الربح بينهما نصفين لم يجز، وهذا مذهب الشافعي، وكلام القاضي يقتضي جوازه، وحكي ذلك عن أبي حنيفة وأبي ثور- ولنا: أن أحدهمايبقى له من ربح ماله النصف والآخريبقى له الثلثان، فإذا شرطا التساوي فقد شرط أحدهما للآخرجزء من ربح ماله بغيرعمل فلم يجزكما لو شرط ربح ماله المنفرد.“

—(المغني لإبن قدامة ج:٥ ص:١٤٦)

এখানে মাসআলা বর্ণনা করা হচ্ছে যে, দুইজন মানুষ যেমন- যায়েদ ও আমর এক মুদারিব যেমন- বকরের সাথে আলাদা আলাদা মুদারাবা'র লেনদেন করেছে। যায়েদ মুদারিবের অংশ অর্ধেক নির্ধারিত করেছে আর আমর এক তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ- এক তৃতীয়াংশ বকরের হবে আর দুই তৃতীয়াংশ হবে আমরের। দুই পুঁজিপতি যেন বকরের সাথে পৃথক পৃথক হার নির্ধারণ করেছে। ইমাম আহমদ রহ. বলেন, এই ক্ষেত্রে মুদারিবকে তার অংশ দেয়ার পর যায়েদ এবং আমরের মাঝে মুনাফা তাদের

বিনিয়োগের হারে বন্টিত হবে। তাই সে মুদারিবের সাথে এটা চূড়ান্ত করতে পারবে না যে, তার অংশ দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা আমরা পরস্পর সমান ভাগে ভাগ করে নিব। কেননা, যায়েদের খাটানো পুঁজির অংশ মুনাফার অর্ধেক ছিল আর আমরের ছিল দুই তৃতীয়াংশ। তাই তা এই হারেই বন্টিত হওয়া উচিৎ। সমান ভাগে বন্টিত হবার শর্তারোপের অর্থ হল, দুই পুঁজিপতি যায়েদ এবং আমর নিজেদের খাটানো পুঁজির ভিত্তিতে নয়; বরং তারতম্যের ভিত্তিতে বন্টন করার শর্তারোপ করছে এবং আমর নিজের পুঁজির মুনাফার কিছু অংশ যায়েদকে দিচ্ছে, অথচ যায়েদ কোন কাজই করেনি, তাই তা নাজায়েয।

কিন্তু দাগ টানানো বাক্য থেকে বুঝা যায় যে, ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর নিকট এই পদ্ধতি জায়েয, যেখানে একাধিক ব্যক্তি পুঁজিদাতা হবে এবং তারা সবাই মিলে একজন মুদারিবের সাথে লেনদেন করবে। এই ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফী রহ.-এর মতে পুঁজিদাতাদের মাঝে অংশীদারিত্ব শিরকাহ হিসেবে। তাই পুঁজিদাতারা নিজেদের মধ্যে মুনাফার হারে তারতম্য করে ঠিক করে নিলে তা ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর নিকট জায়েয আছে।

ইমাম আহমদ রহ. শিরকায় হানাফীদের মতো মুনাফার তারতম্যের বৈধতার পক্ষে হওয়া সত্ত্বেও এই মাসআলায় ভিন্নমত পোষণ করার কারণ হল, মুদারিবকে দেয়ার সময় এটা চূড়ান্ত করা হয় যে, সে কোন কাজ করবে না। তাই কোন অংশীদার কাজ না করার শর্তারোপ করলে মূলধনের চেয়ে বেশী হারে মুনাফা নির্ধারণ করতে পারে না। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা রহ, ইমাম আবু সাওর রহ. এবং হাম্বলীদের মধ্য থেকে কাজী ইয়াজ রহ. এর উত্তর এভাবে দিতে পারেন যে, এই ক্ষেত্রে অংশীদারদের কাজ হল, শুধু মুদারিবের সাথে লেনদেন করা, এই কাজে সবাই শরিক। তাই তাদের মধ্যে মুনাফার তারতম্য জায়েয। তবে যেহেতু শাফেয়ী ও মালেকীদের দৃষ্টিতে শিরকাহতে সর্বাবস্থায় মুনাফা সমানভাবে বন্টিত হওয়া শর্ত, তাই একাধিক ব্যক্তি মিলে একজনের সাথে মুদারাবা করা জায়েয হলেও তাদের মাঝে মুনাফার বন্টন সমানভাবে হওয়া জরুরী। মুদারিবের সাথে প্রত্যেকের মুনাফার হার ভিন্ন ভিন্ন সাব্যস্ত হলেও। আল্লামা বগভী শাফেয়ী রহ. বলেন:

"ولوقارض رجلان رجلا على ألف، فقالا: قارضناك على أن نصف الربح لك، والباقي بيننا بالسوية، جاز- ولوقالا: على أن لك الثلث من نصيب أحدنا والربع من نصيب الآخر، إن لم يبينا لم يجز، وإن بينا نُظرإن لم يقولا : الباقي بيننا صح ويكون الباقي من نصيب كل واحد له، فإن قالا: الباقي بيننا لايصح لأنه يبقى لمن شرط للعامل الثلث أقل، فلا يكون الباقي بينهما سواء، كما لو قال: ثلث الربح لك، والباقي بيننا أثلاث لايصح -" —(التهذيب للبغوي رحـ، كتاب القراض، ج:٤ ص:٣٨٢ ط: دار الكتب العلمية)

মালেকীদের মতও অনেকটা এর কাছাকাছি। আল্লামা ইবনে রূশদ মালেকী রহ. লেখেন:

"وسئل مالك عن رجل أخذ من رجلين مالا قراضا فأراد أن يخلطه بغير إذنهما فقال: يستأذنهما أحسن وأحبّ إليّ، فإن لم يستأذنهم فلا ارى عليه سبيلا. قيل له: فإنه استاذن أحدهما فأذن له و لم يأذن له الآخر فخلطهما ؟ قال: يستغفرالله ولايعد." —(البيان والتحصيل لإبن رشد ج:١٢ ص:٣٤٩)

ইমদাদুল আহকাম কিতাবেও এক প্রশ্নের উত্তরে একাধিক পুঁজিদাতা এক মুদারিবের সাথে চুক্তি করার একটি পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। সেখানে জায়েয করা হয়েছে যে, কেন পুঁজিদাতার টাকা অন্য অংশীদারদের সন্তুষ্টির ভিত্তিতে হিসাবের আগেই ফেরত দেয়া যায়। লক্ষ্য করুন:

"**প্রশ্ন** : কিছু অসুবিধা লক্ষ্য করে কয়েকবার একথা মনে এসেছে যে, শুধু একহাজার টাকা দশজন মুসলমানের কাছ থেকে একই সাথে যেমন- মুহাররম মাসে নিয়ে তা দিয়ে সবসময় বিক্রয় হয় এমন কিছু কিতাব ক্রয় করব। সম্পূর্ণ আলাদাভাবে এর হিসাব রাখব। বছর শেষে বা ছয়মাস শেষে তার মুনাফা হিসাব করে আলাদা করে অর্ধেক পুঁজিদাতাকে দিব আর

অর্ধেক আমি নিজে নিব। এই ক্ষেত্রে পুঁজিদাতা হবেন দশজন। কোন শরীক তাঁর টাকা ফেরত নিতে চাইলে হিসাবের সময় দুইমাস আগে জানিয়ে দিবে। হিসাবের সময় তার টাকা মুনাফাসহ ফেরত দিয়ে দিব। এটা জায়েয আছে কি?

উত্তর : কিছু মানুষ একত্রিত হয়ে মুদারাবার জন্য টাকা দিলে তাতে অসুবিধার কিছু নেই। কিন্তু মুদারিব তাদের মধ্য থেকে একজনের টাকা মাঝখানে ফেরত দেয়াটা জায়েয হবে না; বরং সকল অংশীদরদের সন্তুষ্টি শর্ত وهذا كله من القواعد। যদি প্রত্যেকের টাকার হিসাব আলাদা খাতায় রাখা হয় তাহলে প্রত্যেকের হিসাব আলাদা হতে পারে। ॥আল্লাহই ভাল জানেন॥

উত্তরদাতা-

আহকার আব্দুল করিম

উত্তর সঠিক– যফর আহমদ

-(ইমদাদুল আহকাম, কিতাবুশ শিরকাতি ওয়াল মুদারাবাতি খণ্ড:৩ পৃ: ৩৫৭)

এই মূলনীতি ও আহকামসমূহ মনে রেখে সুদবিহীন ব্যাংকেসমূহে শিরকাহ ও মুদারাবাহ প্রতিষ্ঠা করা এবং দৈনিক উৎপাদনের ভিত্তিতে লাভ-ক্ষতির বন্টনের উপর গবেষণা করা হলে তাতে বর্ণিত কর্মপদ্ধতির সাথে দুইটি বিষয়ে পার্থক্য দৃশ্যমান হয়। এক: এতে অংশীদাররা থেমে থেমে আসতে থাকে এবং তাদেরকে তাদের শিরকাতের মেয়াদের হিসাবে লাভ-ক্ষতির অংশীদার করা হয়। দুই: অনেক মানুষ শিরকাতের মেয়াদ শেষ হবার আগেই সামগ্রিক বা আংশিকভাবে তা থেকে বেরিয়েও আসছে। এখন এই দু'টি দিকের উপর পৃথকভাবে আলোচনা করা উচিৎ।

প্রথম বিষয়ের জন্য একটি সাধারণ উদাহরণ লক্ষ্য করুন। মনে করুন, যায়েদ ও আমরের একটি চলমান কারবার আছে, যা বিভিন্ন প্রকার লেনদেনসমৃদ্ধ। তারা উভয়ে তাদের লাভ-ক্ষতির হিসাব বার্ষিকভাবে প্রথম রমজানে করে থাকে। এখন প্রথম রমজানের আরো ছয়মাস আগেই বকর তাদেরকে বলে যে, আমিও আপনাদের কারবারে পুঁজি দিয়ে শরীক হতে চাই। যেহেতু যায়েদ ও আমরের নিজেদের কারবারকে আরো প্রশস্ত করার

জন্য অতিরিক্ত পুঁজির প্রয়োজন, তাই তারা বকরকে তাদের কারবারে শরীক করার ব্যাপারে রাজি হয়ে যায়। তারা সিদ্ধান্ত নেয়, বকর ঐ পরিমাণ পুঁজি সরবরাহ করবে, যাতে করে সে কারবারের এক তৃতীয়াংশের অংশীদার হয়ে যায় এবং মুনাফার হারও তিনজনের একতৃতীয়াংশের ভিত্তিতে হবে। তবে যেহেতু প্রথম রমজানে লাভ-ক্ষতির হিসাব হওয়ার সময় বকরের অংশের ছয়মাস হবে যা অন্য দুই অংশীদারের তূলনায় অর্ধেক হয়, তাই সে এক তৃতীয়াংশের অর্ধেক অর্থাৎ, এক ষষ্ঠমাংশের হকদার হবে। তিন পক্ষ যদি এই বিষয়ে একমত হয়ে যায় তাহলে দৃশ্যত الربح على ما اصطلحا عليه-এর নিয়মের ব্যাপকতার প্রেক্ষাপটে এতে শিরকাহ'র কোন মৌলিক মূলনীতি অমান্য করা হয় না। ব্যস! এটাই হল দৈনন্দিন উৎপাদনের ভিত্তিতে মুনাফা বন্টনের উদ্দেশ্য।

এর উপর একটি মৌলিক আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে যে, শেষে মুনাফার যে হিসাব করা হয়েছে তাতে ঐ মুনাফাও শামিল হয়ে যায় যা শুধু প্রথম থেকেই অংশীদার যায়েদ ও আমরের মালের উপর হয়েছে, অথচ এতে পরবর্তীতে শরীক হওয়া বকরও অংশীদার হচ্ছে, অথচ তখন সে কারবারে উপস্থিত ছিল না।

এই আপত্তির ব্যাপারে আরজ হল, যেহেতু বকর কারবারের শুরুতে উপস্থিত ছিল না, তাই তার মুনাফার অংশও সে হিসাবে কম হয়েছে, তাই এখানে ন্যায়পরিপন্থী কোন বিষয় নেই। তাছাড়া শিরকাহ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার পর কার টাকায় কত মুনাফা, তা দেখা হয় না; বরং শিরকাহর হাউজে যাওয়ার পর সবার পুঁজি মিশ্রিত হয়ে যায়। তাই অংশীদারদের মুনাফায় কম-বেশী করা জায়েয আছে। মনে করুন, যায়েদের পুঁজি হল কারবারের শতকরা চল্লিশ ভাগ, আর আমরের শতকরা ষাট ভাগ এবং তারা উভয়েই কাজ করে। এখন তারা যদি এই চুক্তি করে যে, যায়েদ শতকরা ষাটভাগ ও আমর শতকরা চল্লিশভাগ হারে মুনাফা পাবে, তাহলে উপরে উল্লেখিত 'আসার' সমূহের আলোকে তা জায়েয হবে। হানাফী ফিকহবিদগণও এটাকে জায়েয বলেছেন। এখন যায়েদের শতকরা ষাটভাগ মুনাফার মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ তার খাটানো পুঁজির অংশ ও তার কাজের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে বাকি শতকরা বিশভাগ অর্জিত হয়েছে

আমরের খাটানো পুঁজি ও কাজ থেকে। কিন্তু ধার্য্যকৃত শর্ত হিসেবে তার জন্য এই বিশ ভাগ মুনাফাও হালাল।

আরো স্পষ্ট উদাহরণ হল, যায়েদ ও আমর শিরকাহ'র চুক্তি করেছে, কিন্তু পুঁজি একত্রিত করেনি। তা সত্ত্বেও যায়েদ যদি শিরকাহ'র জন্য নিজের মাল থেকে কিছু ক্রয় করে পূণরায় তা বিক্রয় করে, তাহলে মুনাফায় উভয়ে শরীক হবে। আর ক্রয়ের পর জিনিসটি নষ্ট হয়ে গেলে তার ক্ষতি উভয়েই বহন করবে। বাদায়েউস সানায়ে' কিতাবে আছে:

"أما قوله الشركة تنبئ عن الإختلاط فمسلم، لكن على إختلاط رأسي المال أو على إختلاط الربح؟ فهذا مما لا يتعرض له لفظ الشركة، فيجوز أن يكون تسمية شركة لإختلاط الربح يوجد إن اشترى كل واحد بمال نفسه على حدة، لأن الزيادة، وهي الربح، تحدث على الشركة ..... حتى لو هلك بعد الشراء بأحدهما كان الهالك من المالين جميعا لأنه هلك بعد تمام العقد."—(بدائع الصنائع ج:٦ ص:٦٠ ط: كراچي)

অনুরূপভাবে শিরকাতুল আমাল বা কাজের অংশীদরীতে কোন শরীক যদি কাজ না করে, তা হলেও সে ঐ ভাড়া/মজুরীতে শরীক হবে, যা অন্যের কাজের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে। আল্লামা সারাখসী রহ.-এর মাবসূতে আছে:

"قال: والشريكان في العمل إذا غاب أحدهما أو مرض أو لم يعمل وعمل الآخر: فالربح بينهما على ما اشترطا؛ لما روي أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أنا أعمل في السوق ولي شريك يصلي في المسجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لعلك بركتك منه))- والمعنى أن استحقاق الأجريتقبل العمل دون مباشرته، والتقبل كان منهما وإن باشر العمل أحدهما- ألا ترى أن المضارب إذا استعان برب المال في بعض العمل كان الربح بينهما على الشرط- أو لاترى أن

الشريكين في العمل يستويان في الربح وهما لايستطيعان أن يعملا على وجه يكونان فيه سواء، وربما يشترط لأحدهما زيادة ربح لحذاقته وإن كان الآخر أكثر عملا منه، فكذلك يكون الربح بينهما على الشرط ما بقي العقد بينهما وإن كان المباشرللعمل أحدهما، ويستوي إن امتنع الآخر من العمل بعذرأو بغيرعذر؛ لأن العقد لايرتفع بمجرد امتناعه من العمل واستحقاق الربح بالشرط في العقد-" -(المبسوط، اوائل كتاب الشركة ج:١١ ص:١٥٧—١٥٨ ط: دارالمعرفة)

'শিরকাতুল ওয়ুজুহ'-এ কোন শরীকেরই মাল থাকে না। শুধু এ বিষয়ে অংশীদারিত্ব হয় যে, দুই ব্যক্তি নিজেদের সুনামের ভিত্তিতে বাকীতে মাল খরিদ করে বাজারে তা বিক্রয় করে। এ দুই জনের মধ্যে একজন অংশীদার যদি শুধু নিজের সুনামের ভিত্তিতে কিছু মাল খরিদ করে, অন্যজন অনুপস্থিত থাকে এবং বিক্রেতাও তাকে না চিনে তাহলেও সে ঐ মালে শরীক বলে গণ্য করা হবে। বাদায়ে'তে আছে:

"حتى لو اشتركا بوجوههماعلى أن يكون ما اشتريا أو أحدهما بينهما نصفين أو أثلاثا أو أرباعا وكيف ما شرطا على التساوي والتفاضل؛ كان جائزا وضمان ثمن المشترى بينهما على قدر ملكيهما في المشترى والربح بينهما على قدر الضمان-"-(بدائع الصنائع، كتاب الشركة ج:٥ ص:٨٧)

আল্লামা কাসানী রহ. এই দুই প্রকারের শিরকাহ'র বৈধতার পক্ষে দলিল দিতে গিয়ে বলেন:

"ولنا: أن الناس يتعاملون بهذين النوعين في سائرالأعصارمن غيرإنكار عليهم من أحد. وقا ل عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة؛ ولأنهما يشتملان على الوكالة والوكالة جائزة والمشتمل على الجائز جائز

وقوله: إن الشركة شرعت لإستنماء المال فيستدعى أصلا يستنمي فنقول: الشركة بالأموال شرعت لتنمية المال وأما الشركة بالأعمال أو بالوجوه فما شرعت لتنمية المال بل لتحصيل أصل المال، والحاجة إلى تحصيل أصل المال فوق الحاجة إلى تنميته فلما شرعت لتحصيل الوصف فلأن تُشرع لتحصيل الأصل أولى-..... وكذا بُعث رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يتعاملون بهذه الشركة فقرّرهم على ذلك حيث لم ينههم ولم ينكر عليهم، والتقريرأحد وجوه السنة، ولأن هذه العقود شُرعت لمصالح العباد، وحاجتهم إلى إستنماء المال متحققة- وهذا النوع طريق صالح للإستنماء فكان مشروعا؛ ولأنه يشتمل على الوكالة والوكالة جائزة إجماعا-" —

(بدائع الصنائع، كتاب الشركة ج:٦ ص:٥٨)

এই সব উদাহরণ থেকে স্পষ্ট হয় যে, শিরকাহতে কত টাকায় কত মুনাফা হল তা দেখা হয় না; বরং সামগ্রিক মুনাফা, যতটাকার মাধ্যমেই অর্জিত হোক, তা শরীকদের মধ্যে নির্ধারিত হারে বন্টিত হবে।

শিরকাহ ও মুদারাবা'য় এমন অনেক উদাহরণ আছে, যেগুলোতে তর্ক শাস্ত্রের সুক্ষ্মতার দিক বিবেচনা করা হলে তা নাজায়েয হয়ে যাবে। কিন্তু ফুক্বাহায়ে কেরাম সেগুলোকে প্রচলন এবং প্রয়োজনের কারণে জায়েয বলেছেন। আরেকটি উদাহরণ লক্ষ্য করুন:

"إذا قعد الصائغ معه رجلا في دكانه، فطرح عليه العمل بالنصف، جاز استحسانا، لتعامل الناس من غيرنكيرمنكر، ولأن الناس بحاجة إلى ذلك، فالعامل قد يدخل بلدا لا يعرفه اهلها، ولايامنونه على متاعهم، وإنما يأمنون على متاعهم صاحب الدكان الذي يعرفونه، وصاحب الدكان لايتبرع على العامل بمثل هذا في العادة، ففي تجويزهذا العقد يحصل غرض الكل؛ فإن العامل يصل إلى عوض عمله، وصاحب الدكان يصل إلى

عوض منفعة دكانه، والناس يصلون إلى منفعة عمل العامل- ويطيب لرب الدكان الفضل، لأنه أقعده في دكانه، وأعانه بمتاعه، وربما يقيم صاحب الدكان بعض العمل، كالخياط يتقبل المكان، ويلي قطعه، ثم يدفع إلى آخر بالنصف-

قال شمس الأيمة السرخسي رحمه الله تعالى: هذا العقد نظيرعقد السلم، من حيث أنه رخص فيه لحاجة الناس-" -(المحيط البرهاني، كتاب الشركة، الفصل الأول ج:٨ ص:٣٥٥ ط: إدارة القرآن)

এটা ঠিক যে, যতগুলো উদাহরণ উপরে প্রদত্ত হয়েছে তাতে যদিও এক ব্যক্তি অন্যের মাল, কাজ বা সুনাম থেকে উপকৃত হচ্ছে, কিন্তু তাদের মাঝে প্রথম থেকেই চুক্তি বিরাজমান ছিল। আর ব্যাংকিংয়ের কর্মপদ্ধতিতে যেসব লোক শিরকাহ'র মেয়াদ শুরু হওয়ার পর আসে তারা প্রথম থেকেই চুক্তিতে শরীক থাকে না। তবে একটি উদাহরণ এমন আছে, যেখানে প্রথম থেকে চুক্তি না থাকা সত্ত্বেও দুই পক্ষের মাঝে মুদারাবা হিসেবে মেনে নেয়া হয়েছে। এটা হযরত উমর রাজি.-এর একটা প্রসিদ্ধ সিদ্ধান্ত, যা মুওয়াত্তা ইমাম মালেকে উদ্ধৃত হয়েছে। ঘটনাটি হচ্ছে- হযরত উমর রাজি.-এর দুই ছেলে হযরত আব্দুল্লাহ রাজি. ও হযরত উবায়দুল্লাহ রাজি. ইরাক গেলেন। সেখানে তখন প্রশাসক ছিলেন হযরত আবু মুসা আশআরী রাজি.। তিনি হযরত উমর রাজি.-এর কাছে কিছু অর্থ পাঠাতে চাচ্ছিলেন। যখন হযরত উমরের এই দুই সাহেবজাদা মদিনা যাচ্ছিলেন তখন হযরত আবু মুসা আশআরী রাজি. তাদের বললেন, এই অর্থ আমি আপনাদেরকে কর্জ্জ হিসেবে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে তা দিয়ে এখান থেকে কিছু মাল কিনে নিয়ে ওখানে বিক্রি করে মুনাফা নিজেদের কাছে রেখে দিবেন এবং মূল অর্থ হযরত উমর রাজি.-এর কাছে দিয়ে দিবেন। তারা এরকম করল। হযরত উমর রাজি. বিষয়টি জানার পর বললেন, আবু মুসা রাজি. আমার ছেলেদের ফায়েদা পৌছানোর জন্য এ কাজ করেছেন। তাই তারা যে মুনাফা কামিয়েছে তা বায়তুল মালে ফেরত দিতে হবে। হযরত উবায়দুল্লাহ রাজি. বললেন, এই মাল যদি নষ্ট হয়ে যেত, তাহলে এর দায়

দায়িত্বও তো আমাদের বহন করতে হতো, তাই মুনাফা আমাদের পাওয়া উচিৎ। হযরত উমর রাজি. তা মানলেন না। একজন প্রস্তাব পেশ করলেন, আপনি এটাকে মুদারাবা করে দিন। অতঃপর হযরত উমর রাজি. একে মুদারাবা সাব্যস্ত করে অর্ধেক মুনাফা তাঁর ছেলেদের দিলেন আর অর্ধেক বায়তুল মালে জমা করিয়ে দিলেন। -(মুওয়াত্তা ইমাম মালেক রহ., মা জাআ ফিল ক্বারাদি, হাদীস নং-১১৯৫)

এই ঘটনায় টাকা যখন দুই সাহেবজাদাকে দেয়া হয়েছিল তখন মুদারাবার চুক্তি ছিল না। কিন্তু হযরত উমর রাজি. পরে তাকে মুদারাবা সাব্যস্ত করেন। ফুক্বাহায়ে কেরাম হযরত উমর রাজি.-এর এই সিদ্ধান্তের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন। তার মধ্যে একটি ব্যাখ্যা হল:

"إن عمرأجرى عليهما أجرا في الربح حكم القراض الصحيح، وإن لم يتقدم منهما عقد، لأنه كان من الأمورالعامة ما يتسع حكمه عن العقـــود الخاصة، فلما رأى المال لغيرهما والعمل منهما و لم يرهما متعدين فيه، جعل ذلك عقد قراض صحيح. وهذا ذكره أبوعلي ابن أبي هريرة. (المجموع شرح المهذب ج:٨ ص:٩)

এসব উদাহরণ পেশ করার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, এই পদ্ধতিগুলো দৈনিক উৎপাদনপদ্ধতির সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ; বরং উদ্দেশ্য হল, ফুক্বাহায়ে কেরাম শিরকাহ'র এই ধরণের বিভিন্ন পদ্ধতি প্রচলন, রেওয়াজ ও প্রয়োজনের ভিত্তিতে জায়েয ঘোষণা করেছেন, যেখানে দৃশ্যত একজন মানুষ অন্যের টাকা, কাজ বা সুনাম থেকে ফায়েদা উঠাচ্ছে। তাই যেমনটি উপরে আরজ করা হয়েছে যে, দৈনিক উৎপাদন পদ্ধতিতে যদি এমনটি হয় তাহলে তাতে শিরকাহ'র কোন মৌলিক মূলনীতির বিরোধীতা হয় না। যখন তার মুনাফার হার সে সূত্রে কমেও যায় যে সূত্রে কারবারে তার অংশ শামিল ছিল না। শিরকাহ'র এই মৌলিক মূলনীতি যে, কোনভাবেই কোন অংশীদারকে মুনাফা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না, অর্থাৎ যাতে অংশীদারিত্ব শেষ না হয়ে যায় এবং এই মূলনীতি, যা সাহাবা ও তাবেঈনদের উপরোক্ত 'আসার'-এ উদ্ধৃত হয়েছে যে, الوضيعة على المال والربح على ما اصطلحوا عليه তা এই ক্ষেত্রে সংরক্ষিত আছে।

মূলধন জ্ঞাত হওয়া

আমি আমার প্রবন্ধে বলেছিলাম, এই পদ্ধতির উপর এই আপত্তিও হতে পারে যে, এখানে শিরকাহ'র মেয়াদ শুরু হবার সময় মূলধনের পরিমাণ জানা ছিল না। এর উত্তর হল, শিরকাহ'র চুক্তির সময় পুরো মূলধন জানা থাকা শর্ত নয়। বাদায়ে'তে আছে:

"وأما العلم بمقداررأس المال وقت العقد فليس بشرط لجوازالشـــركة بالأموال عندنا-" —(بدائع الصنائع ج:٦ ص: ٦٣)

এর উপর হযরত মাওলানা মুফতী আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব এই আপত্তি উত্থাপন করেছেন যে, বাদায়ে'র রচয়িতাই পূর্বে বলেছিলেন যে, যখন শিরকাহ'র জন্য কোন জিনিস ক্রয় করা হবে তখন দিরহাম দিনার ওজন করে দেয়া হলে মূলধন জ্ঞাত হয়ে যাবে। -(জাদীদ মাআশী মাসায়িল পৃ:১৪৪)

কিন্তু বাস্তবতা হল, শিরকা'য় অধিকাংশ সময় পুরো মূলধন দিয়ে একসাথে জিনিস ক্রয় করা হয় না; বরং ধীরে ধীরে ক্রয় করা হয়। তাই বাদায়ে' কিতাবের রচয়িতার উদ্দেশ্য হল, প্রথম ক্রয়ের সময় ঐ পরিমাণ মূলধন জানা হয়ে গেছে যাদ্বারা ক্রয় করা হয়েছে। পরবর্তী ক্রয়ের সময় অতিরিক্ত মূলধন সম্পর্কেও জানা হয়ে যাবে। এমনকি যখন মুনাফা বন্টনের সময় হবে তখন পুরো মূলধন জানা হয়ে যাবে। আর মূলধন জানা এ জন্য জরুরী যে, মুনাফার বন্টন এর উপর নির্ভর করে। সুতরাং, আল্লামা কাসানী রহ.-এর পুরো বক্তব্যটি এরকম:

"ولنا أن الجهالة لاتمنع جواز العقد لعينها بل لإفضائها إلى المنازعـــة، وجهالة رأس المال وقت العقد لا تفضي إلى المنازعة، لأنه يُعلـــم مقـــداره ظاهرا وغالبا، لأن الدراهم والدنانير توزنان وقت الشراء فيُعلم مقـــدارها، فلا يؤدي إلى جهالة مقدارالربح وقت القسمة." —(بدائع الصنائع، كتاب الشركة ج:٦ ص:٦٣)

এখানে দাগ টানানো বাক্যে পরিস্কারভাবে স্পষ্ট হয়েছে যে, পুরো মূলধন জানা থাকা মুনাফার বন্টনের সময় জরুরী, যাতেকরে তদনুযায়ী

চূড়ান্তকৃত হারে মুনাফা বন্টন করা যায়। আর যখনই কারবারে টাকা খাটতে থাকবে তখনই মূলধন জ্ঞাত হতে থাকবে। এভাবে মুনাফা বন্টনের সময় সবকিছুই স্পষ্ট হয়ে যাবে। যদি এই শর্ত আরোপ করা হয় যে, মুনাফার বন্টনের সময় পর্যন্ত যত পুঁজি খাটানো হবে তার পুরোটাই প্রথম দিনেই জানা হয়ে যাওয়া দরকার, তাহলে তার উদ্দেশ্য হল, একবার পুঁজি খাটানোর পর মুনাফার বন্টন পর্যন্ত কোন পক্ষেরই আর অতিরিক্ত পুঁজি বিনিয়োগ করার অনুমতি থাকবে না। বিষয়টা যে ভুল তা সুবিদিত। সুতরাং, যেমনটি আল্লামা কাসানী রহ. বলেছেন- প্রকৃত পক্ষে পুরো পুঁজি সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া মুনাফা বন্টনের সময় জরুরী। অনুরূপভাবে দৈনিক উৎপাদনের আলোচিত পদ্ধতিতেও এমন হয় যে, প্রাথমিক অবস্থায় মূলধনের একটি অংশ জানা থাকে। অতঃপর যখন টাকা খাটানো হতে থাকে তখন মূলধনও জানা হতে থাকে। এমনকি মুনাফার হিসাবের সময় পুরো বিষয় এমনভাবে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাতে আর কোন বিবাদের সম্ভাবনাই থাকে না।

ব্যাংকের সাথে একাউন্ট হোল্ডারদের মুদারাবা'র সম্পর্ক স্থাপিত হয়। মুদারাবার মধ্যেও বিষয়টি এমন নয় যে, এখানেও একবার মুদারিবকে মাল দেয়ার পর আর কোন মাল দিতে পারবে না; বরং মুদারাবা'র শুরুতে যে মাল দেয়া হয়, তা কারবারে খাটানোর পর আরো মাল দেয়া যাবে এবং সে নিজেও তার মাল এখানে শামিল করতে পারবে। সুতরাং, ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর এই উদ্ধৃতিটি লক্ষ্য করুন :

"قال محمد رحمه الله تعالى : ومن دفع إلى غيره ألف درهم مضـــاربة بالنصف، ثم دفع إليه ألف درهم آخر مضاربة بالنصف أيضـــا، فخلـــط المضارب الألف الأولى بالثانية، فالأصل في هذه المسائل: أن المضارب متى خلط مال رب المال بمال رب المال لايضمن........ فإن قال له رب المال في المضاربتين جميعا: إعمل فيه برأيك، فخلط أحدهما بالآخر، فإن لايضمن واحدا من المالين سواء خلطهما قبل أن يربح في المالين، أو بعد ما ربح في المالين أو بعد ما ربح في أحدهما دون الآخر، لأنه في بعض هذه الفصـــول

خلط مال رب المال بمال رب المال، وإنه لايوجب ضمانا على المضارب، وإن لم يقل له: إعمل فيه برأيك، فإذا قال له ذلك فيهما أولى أن لايضمن- وفي بعض هذه الفصول خلط مال رب المال بمال نفسه، وهو حصته من الربح، إلا أنه أذن له رب المال بهذا الخلط لما قال له: 'إعمل برأيك' - ألاترى أنه لو خلطهما بمال آخر خاصّ للمضارب لم يضمن، فلأن لايضمن وقد خلطهما بمال مشترك بينه وبين رب المال، وهو حصته من الربح، أولى-''—(المحيط البرهاني، كتاب المضاربة ، الفصل الثامن عشر، ج:١٨ ص:٢١٥)

তাই এখানেও একই অবস্থা যে, যত যত মাল মুদারাবা'র হাউজে জমা হতে থাকবে তা ততোই জানা হতে থাকবে। এমনকি যখন হিসাবের সময় এসে যাবে তখন পুরো মূলধন জানা হয়ে যাবে। যদি মূলধনে কোন বৃদ্ধি যোগ হয় তাহলে তা মুনাফার আকারে মুদারিব ও পুঁজিদাতাদের মধ্যে নির্ধারিত হারে বন্টিত হবে। যেহেতু পরবর্তীতে আগত মাল প্রথম থেকে জানা না থাকার কারণে এমন কোন অজ্ঞতা সৃষ্টি হয় না, যা মুনাফাকে অজ্ঞাত করে দেয় এবং বিবাদ সৃষ্টি করে, তাই বাদায়ে'র উপরোক্ত উদ্ধৃতির কারণে এই অজ্ঞতা চুক্তিকে ফাসেদ বা অবৈধ করে না।

এখন আমি এই কর্মপদ্ধতির দ্বিতীয় বিষয়ের দিকে আসছি। অর্থাৎ, শিরকাহ ও মুদারাবাহ শুরু হওয়ার পর বিভিন্ন অংশীদারকর্তৃক টাকা উত্তোলন করা। এর ব্যাখ্যা হল, যে ব্যক্তি এই সম্মিলিত হাউজ থেকে তার টাকা উত্তোলন করতে চায় প্রকৃত পক্ষে সে অন্য অংশীদারদের কাছে তার অংশ সামগ্রিক বা আংশিকভাবে বিক্রয় করে দেয়। এর মূল্য নির্ধারণ করার সময় কারবারের সে সময়ের অবস্থাকে সামনে রাখা হয়। আজ থেকে দশ বারো বছর পূর্বে এলায়েন্স মটরসের কারবারে এই একই ধরণের কাজ হত। দেশের সম্ভবত অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম এবং মুফতী সাহেবরা এই ভিত্তিতেই এলায়েন্স মটরসে টাকা বিনিয়োগ করতেন এবং উত্তোলন করতেন। তখন এর ফিক্বহী ব্যাখ্যা এটাই করা হয়েছিল যে, যে ব্যক্তি টাকা উত্তোলন করছেন তিনি আংশিকভাবে তার অংশ বিক্রয়

করে যাচ্ছেন। কিন্তু এখন এর উপর এই আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে যে, "মুশারাকায় নির্ধারিত মেয়াদ পূর্ণ হবার পূর্বেই মুশারাকা সম্পন্নকারীকে তার অংশ কম মূল্যে কোম্পানী বা অন্য কোন অংশীদারের কাছে বিক্রয় করতে বাধ্য করা শরীয়ত সম্মত নয়। আপন অংশ কম মূল্যে বিক্রয় করার সময় ضـــع وتعجّـــل এর খারাবীও দেখা দেয়। কেননা, শিরকা'য় প্রথম থেকেই অংশীদারের এই অধিকার থাকে যে, সে যখন চাইবে তখন তার মূল পুঁজি ও নির্ধারিত হারে এখন পর্যন্ত অর্জিত মুনাফা নিয়ে শিরকাহ থেকে আলাদা হয়ে যাবে। প্রচলিত মুশারাকায় অংশীদারের এই শরয়ী অধিকার মেনে না নিয়ে তাকে তার অংশ বিক্রয়ে; বরং কম মূল্যে বিক্রয় করতে বাধ্য করা এবং প্রকৃত মুনাফার পরিবর্তে আনুমানিক মুনাফা দেয়া শিরকা'র সরাসরি মৌলিক মূলনীতিবিরুদ্ধ হবার কারণে নাজায়েয এবং ফাসেদ। উপরে উদ্ধৃতিসহ বলা হয়েছে যে, ফাসেদ লেনদেনের মুনাফাও اكل بالباطل। অন্যায় ভক্ষনের আওতায় আসে, যা কি না হারাম।

এখানে শিরকাতে শরইয়্যার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি উপেক্ষা করা হচ্ছে। তা হল, অংশীদারদের মধ্য থেকে কেউ যদি তার মূলধন এবং শিরকাহ থেকে বের হবার সময় পর্যন্ত অর্জিত মুনাফা নিয়ে পৃথক হয়ে যেতে চায় তাহলে সে তা পারবে। তার মাল যে অবস্থায়ই থাকুক সে তা নিতে পারবে।" -(মুরাওয়াজা ইসলামী ব্যাংকারী পৃ:২১৭)

এই কথাটি লেখার সময় কোন ফিক্বহের কিতাব দেখে নেয়ার প্রয়োজন বোধ করা হয়নি, কোন উদ্ধৃতি প্রদান করা হয়নি এবং এটাও বলা হয়নি যে, 'মূলধন এবং ঐ সময় পর্যন্ত অর্জিত মুনাফা নেয়া'র কার্যপদ্ধতি কী হবে? ফল হল, এমন একটি কথা বলে দেয়া হয়েছে, যার উপর আমল করা প্রায় অসম্ভব, বিশেষত আজকালের বিস্তৃত ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-কারখানায়। আবার এটাকেই বলা হচ্ছে শরয়ী মূলনীতি।

এটাতো ঠিক যে, শিরকাহ ও মুদারাবা উভয় চুক্তিই জায়েয তবে আবশ্যকীয় নয়। অর্থাৎ, প্রত্যেক শরীক বা পুঁজিদাতার এই অধিকার আছে যে, তারা যেকোন সময় ইচ্ছা করলেই শিরকাহ বা মুদারাবা শেষ করতে পারে। কিন্তু শেষ করার পদ্ধতি কী হবে? এটাও ফুক্বাহায়ে কেরাম অস্পষ্ট রেখে দেননি। মুদারাবার ব্যাপারে তারা পরিষ্কার করে লিখেছেন যে,

মুদারাবার মাল যদি এখনো পর্যন্ত পুরোটাই মুদ্রার আকারে থাকে, তাহলে পুঁজিদাতা যেকোন সময় মুদারাবা ভঙ্গ করতে পারে। আর যদি তা মুদ্রা ছাড়া আসবাব পত্রের আকারে থাকে, তাহলে শুধূ পুঁজিদাতার কথার উপরই মুদারাবা শেষ হবে না; বরং আসবাব পত্রগুলো বিক্রয় করে মুদ্রার আকার ধারণ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। লক্ষ্য করুন মালিকুল উলামা আল্লামা কাসানী রহ. লিখেছেন:

"وهل يشترط أن يكون مال الشركة عينا وقت الشركة لصحة الفسخ وهي أن يكون دراهم ودنانير، ذكر الطحاوي أنه شرط حتى لو كان مال الشركة عروضا وقت الفسخ لايصح الفسخ ولاتنفسخ الشركة، ولا رواية عن أصحابنا في الشركة، وفي المضاربة رواية، وهي أن رب المال إذا نهى المضارب عن التصرف فإنه ينظر، إن كان مال المضاربة وقت النهي دراهم أو دنانير صح النهي، لكن له أن يصرف الدراهم إلى الدنانير والدنانير إلى الدراهم؛ لأنهما في الثمنية جنس واحد، فكأنه لم يشترها شيئا، وليس له أن يشتري بها عروضا. وإن كان رأس المال وقت النهي عروضا فلا يصح نهيه، لأنه يحتاج إلى بيعها ليظهر الربح فكان الفسخ إبطالا لحقه في التصرف فجعل الطحاوي الشركة بمنزلة المضاربة، وبعض مشائخنا فرق بين الشركة والمضاربة فقال: يجوزفسخ الشركة وإن كان رأس المال عروضا، ولايجوزفسخ المضاربة، لأن مال الشركة في يد الشريكين جميعا، ولهما جميعا ولاية التصرف، فيملك كل واحد منهما نهي صاحبه عينا كان المال أو عروضا، فأما مال المضاربة ففي يد المضارب و ولاية التصرف له لا لرب المال، فلا يملك رب المال نهيه بعد ما صارالمال عروضا-"—(بدائع الصنائع، كتاب الشركة، قبيل كتاب المضاربة ج:٦ ص:٧٧ ط: إيچ إيم سعيد)

এখান থেকে বুঝা যায় যে, শুধু পুঁজিদাতার কথায় মুদারাবা শেষ করা যায় না; বরং মুদ্রাহীন আসবাবপত্র বিক্রয় করতে হবে, অতঃপর মুদারাবা শেষ হবে। তবে শিরকাহর ব্যাপারে হানাফী ইমামদের কোন বর্ণনা নেই যে, শিরকাহর মাল আসবাব পত্র হলে বা একতরফাভাবে শিরকাহ ভেঙ্গে দেয়া হলে তাৎক্ষণিকভাবে শিরকাহ ভেঙ্গে যাবে, নাকি তা নগদ মুদ্রায় পরিণত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে? ইমাম ত্বাহাবী রহ. মুদারাবা ও এর মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি। তিনি বলেছেন, শিরকাহও তাৎক্ষণিকভাবে শেষ হবে না। আল্লামা যীলয়ী রহ.ও এই মতের উপর ফতোয়া দিয়েছেন। কিন্তু পরবর্তী ফুক্বাহায়ে কেরাম শিরকাহ ও মুদারাবা'র মধ্যে পার্থক্যের মতকে গ্রহণ করে বলেছেন, শিরকাহ তাৎক্ষণিকভাবে শেষ হয়ে যাবে। অতঃপর ভঙ্গকারী শরীকের সাথে অন্যান্য শরীকদের লাভ ক্ষতির হিসাব তাৎক্ষণিকভাবে চূড়ান্ত করে ফেলতে হবে। এটা করা ছাড়া তারা শিরকাহর ঐ মালে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। (দেখুন شرح مجلة الأحكام للأتاسي। খন্ড:৪ পৃ:২৭৮)

যেমনটি উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, ব্যাংকে সকল অংশীদাররা শুধু এই উদ্দেশ্যেই অংশগ্রহণ করে যে, তারা ব্যাংকের সাথে সামগ্রিকভাবে মুদারাবা করবে। তাই পুরো পুঁজিই মুদারাবার মাল। আর যেহেতু তা কারবারে খেটে আসবাব পত্রে পরিণত হয়েছে, তাই বাদায়ে'তে বর্ণিত মূলনীতি মোতাবেক শুধু পুঁজিদাতার কথায় মুদারাবা শেষ হবে না; বরং আসবাব পত্রগুলো বিক্রয় করতে হবে। এর পরেই মুদারাবা শেষ হবে। এখন অন্যান্য পুঁজিদাতারা যদি পরস্পরের মধ্যে ঠিক করে নেয় যে, অন্য কারো কাছে বিক্রয় করার পরিবর্তে এই অবস্থায় তারা নিজেরাই তার অংশ ক্রয় করে নেয়, তাহলে তাতে আপত্তির কী আছে? ফুক্বাহায়ে কেরাম এই মাসআলাটিও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তাহাবী রহ. বলেন,

৳وإن كان في تلك العروض فضل، أجبر المضارب على بيعهـا علـى المضاربة حتى يستوفى رب المال رأس ماله ويكون الفضل ان كان بينهـما على ما اشترطا إلا أن يشاء المضارب أن يعطـي رب المـال رأس مالـه

وحصته من الربح، ويحبس العروض بنفسه فلا يكون لرب المال الإمتناع عنه. " -(الشروط الصغير للطحاوي ج:٢ ص:٧٣١ ط: مطبعة العاني ، بغداد)

এই উদ্ধৃতির দাগ টানানো অংশে ইমাম তাহাবী রহ. স্পষ্টভাবে বলেছেন, মুদারাবার মাল যদি মুদ্রাহীন আসবাবপত্র হয় এবং লাভও স্পষ্ট হয়, তাহলে মুদারিব পুঁজিদাতাকে এ বিষয়ে বাধ্য করতে পারে যে, সে নিজে আসবাবপত্র রেখে দিয়ে ঐ পরিমাণ মূল্য পরিশোধ করবে, যাতে পুঁজিদাতার মূলধন ও মুনাফা আদায় হয়ে যায়। প্রকাশ থাকে যে, আসবাবপত্রের পরিবর্তে মূল্য দেয়া মানে বেচাকেনা করা। ইমাম তাহাবী রহ. বলেন, মুদারিব পুঁজিদাতাকে এই বেচাকেনায় বাধ্য করতে পারে। বরং এখান থেকে এটাও বুঝা যায় যে, এই বেচাকেনাটি অসরাসরিভাবেও হতে পারে। কেননা, এখানে ইমাম তাহাবী রহ. বেচাকেনা শব্দ ব্যবহার করেননি; বরং তিনি শুধু এটুকুই বলেছেন যে, মুদারিব বলে- আসবাবপত্র আমি রেখে দিব এবং তোমাকে তোমার মুনাফাসহ মূলধন ফেরত দিব। এটা মূলত বেচাকেনা হলেও বেচাকেনার শব্দ এখানে তিনি ব্যবহার করেননি।

এটা যৌক্তিকভাবেও একেবারে স্পষ্ট। কিছুক্ষণের জন্য ব্যাংকিংয়ের মাসআলাকে একদিকে রেখে দিন। মনে করুন, বিশ জন মানুষ মিলে কাপড় তৈরীর কারখানা প্রতিষ্ঠার জন্য পুঁজি একত্রিত করে। এই পুঁজি দিয়ে তারা মেশিনারী ও কাঁচা মাল খরিদ করে। অতঃপর তাদের এক অংশীদার শিরকাহ বা অংশীদারিত্ব ভেঙ্গে দেয়। এখন যদি ঐ অংশীদার দাবী করে যে, হয় আমাকে মেশিনারী ও কাঁচামাল বন্টন করে দিয়ে দাও নতুবা মেশিনারী ও কাঁচামাল বাজারে বিক্রয় করে মূল্য থেকে অংশ অনুযায়ী আমাকে দিয়ে দাও, তাহলে বাকী উনিশ অংশীদারের কী অবস্থা হবে? আচ্ছা! কোনভাবে মেশিনারী ও কাঁচামাল বিক্রয় করা হল এবং তা দিয়ে তারা নতুন করে মেশিনারী ও কাঁচামাল খরিদ করে পূণঃরায় কারবার আরম্ভ করল। সবেমাত্র কারবার শুরু হয়ে কিছু কাপড় তৈরী হয়ে বিক্রয় হয়েছে, কিছু মূল্য হাতে এসেছে আর কিছু ক্রেতাদের কাছে বাকী রয়ে গেছে। এমতাবস্থায় অন্য আরেক অংশীদার শিরকাহ ভেঙ্গে দেয় এবং দাবি করে যে, সকল আসবাবপত্র এখন ভাগ করা হোক।

মোট কথা, অল্প অল্প বিরতিতেই যদি কোন অংশীদার আসবাবপত্রের বন্টন ও সকল আসবাবপত্র তাৎক্ষণিক বাজারে বিক্রয় করার দাবী করে পুরো ব্যবসা স্তব্ধ করে দেয় তাহলে ব্যবসা-বাণিজ্য চলবে কী করে? এই পরিস্থিতি এড়ানোর লক্ষ্যে যদি সকল অংশীদাররা শুরুতে ঠিক করে নেয় যে, কোন অংশীদার শিরকাহ ভঙ্গ করতে চাইলে আসবাবপত্র ভাগ করা হবে না, বাজারে বিক্রয়ও করা হবে না এবং ইমাম তাহাবী রহ.-এর উপরোক্ত মূলনীতির অনুযায়ী বাকী অংশীদারগণ যদি চলে যাওয়া অংশীদারের অংশ কিনে নেয় তাহলে বিশেষত: বর্তমানের শিল্প ও বাণিজ্যে এটা ছাড়া অন্য কোন বাস্তবায়নযোগ্য পদ্ধতি নেই। এর মাধ্যমে কোন শরয়ী মূলনীতির বিরুদ্ধাচরণও হয় না।

এখন থেকে গেল ঐ মূল্যের বিষয়, যার উপর অংশীদারগণ ঐ অংশ ক্রয় করবে। এর ন্যায়সঙ্গত ফর্মূলা এটা হতে পারে যে, যদি সেসময় আসবাবপত্রগুলো বাজারে বিক্রয় করা হত এবং সেসময় বের হয়ে যাওয়া অংশীদারের মূলধনে তখন পর্যন্ত কোন মুনাফা হয়ে থাকে, তাহলে মুনাফায় যত অংশ হয় তার মূল্য এবং মুনাফার অংশ ঐ হারেই নির্ধারিত হবে যা শিরকাহ বা অংশীদারী কারবার শুরু করার সময় চূড়ান্ত হয়েছিল। যে সম্পর্কে ইতোপূর্বে বলা হয়েছিল যে, এতে বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন হার নির্ধারণ করা যেতে পারে। কেননা, তা الربح على ما اصطلحا عليه –এর সাধারণ নিয়মের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং, 'মজলিসে তাহক্বীকে মাসায়িলে হাজেরা'র রেজুলেশনে এই ভিত্তিতেই একাউন্ট হোল্ডারদেরকে টাকা উত্তোলনের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

যদি ব্যাংকের মতো প্রতিষ্ঠানকে সুদ থেকে পবিত্র করে এইভাবে পরিবর্তন করতে হয় যে, সাধারণ মানুষের সঞ্চয় থেকে শুধু ব্যাংক এবং অর্থায়নে সহয়তা লাভকারী পুঁজিপতিরা লাভবান না হয়ে ঐসকল জনসাধারণও তাদের মুনাফা থেকে লাভবান হবে যাদের টাকা ব্যাংকে গচ্ছিত আছে, তাহলে দৈনিক উৎপাদনের এই পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন পথ নেই, যার বৈধতা সম্পর্কে ইতোপূর্বে ফিক্বহী আলোচনা হয়েছে।

এই সব বিষয়ের আলোকে 'ইসলামী নযরিয়াতী কাউন্সিল' তার রিপোর্টে এই পদ্ধতি ঐ সময়েই সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করে, যখন তাতে হযরত মাওলানা শামসুল হক আফগানী রহ. এবং হযরত মুফতী সাইয়্যাহুদ্দীন কাকাখীল রহ.-এর মতো আকাবিরগণ উপস্থিত ছিলেন।

পরে 'মজলিসে তাহক্বীকে মাসায়িলে হাজেরা'র সভাতেও একাউন্ট থেকে টাকা উত্তোলনকে জায়েয সাব্যস্ত করা হয়েছে।

(আহসানুল ফাতাওয়া খন্ড:৭ পৃ:১২২)

হযরত মাওলানা মুফতী আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব যে তিনটি বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেছিলেন, তা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। এছাড়া ইসলামী বিশ্বের যেখানেই সুদবিহীন ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানকার উলামায়ে কেরাম এটাকে জায়েয এবং বাস্তবায়নযোগ্য পদ্ধতি হিসেবে অভিহিত করেছেন।

আইনগত ব্যক্তি ও সীমিত দায়িত্ব সম্পর্কিত মাসআলা

সুদবিহীন ব্যাংকিংয়ের মাসআলার উপর আলোচনা করতে গিয়ে কিছু সমালোচক আইনগত ব্যক্তি ও সীমিত দায়িত্বের মাসআলাকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে ব্যাংকিংয়ের সাথে জুড়ে দিয়েছেন। বাস্তবতা হল, এই মাসআলার সাথে ব্যাংকিংয়ের বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই; বরং এটা ঐসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মাসআলা, যা কোম্পানী বা কর্পোরেশন অথবা অন্য কোন আইনী অস্তিত্বসম্পন্ন হয়। যেহেতু আজকাল প্রায় সকল মাঝারী ও বড় মাপের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান আইনগত ব্যক্তি হিসেবে অস্তিত্ব লাভ করে, যার মধ্যে অধিকাংশই হল লিমিটেড কোম্পানী অর্থাৎ, সীমিত দায়িত্বের কোম্পানীসমূহ, তাই অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মতো আজকাল সুদী বা সুদবিহীন সকল ব্যাংকও লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে অস্তিত্ব লাভ করে। আমি ব্যাংকিংয়ের বিষয় ব্যাতিরেকে একটি প্রবন্ধে সীমিত দায়িত্বের মাসআলার উপর আলোচনা করেছি। অতঃপর সুদবিহীন ব্যাংকিংয়ের উপর আমার কিতাব প্রকাশিত হয়। তখন সেই প্রবন্ধকেও এর অংশ বানিয়ে দেয়া হয়। এর সারাংশ 'ইসলাম আওর জাদীদ মায়ীশাত ও তিজারাত' নামক কিতাবেও বর্ণিত হয়েছে। সম্ভবত এতে মনে করা হয়েছে যে, ব্যাংকিংয়ের সাথে মাসআলাটি সরাসরি ও বিশেষভাবে সম্পৃক্ত। তাই সুদবিহীন ব্যাংকিংয়ের উপর আলোচনা করতে গিয়ে সর্বপ্রথম একেই আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত করা হয়েছে। এটাও বলা হয়েছে যে, যেহেতু এই ভিত্তিই ধ্বংস হয়ে গেছে, তাই সুদবিহীন ব্যাংকিংয়ের পুরো ভবন যেন ধড়াম করে ভেঙ্গে পড়েছে। অথচ, এই দলিল মেনে নেয়া হলেও তা ব্যাংকের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। এর উদ্দেশ্য হবে, এই সময়ে

আইনগত ব্যক্তির ভিত্তিতে যত কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে তার সবই নাজায়েয।

যাই হোক! এখন আমরা আইনগত ব্যাক্তি ও সীমিত দায়িত্ব উভয় কল্পনার উপর পৃথকভাবে আলোচনা করছি।

আইনগত ব্যক্তির শরয়ী অবস্থান

আইনগত ব্যক্তির উপর সঠিকভাবে গবেষণার জন্য দু'টি বিষয়ের উপর পৃথকভাবে গবেষণা করতে হবে। যা বিভিন্ন সমালোচকদের লেখায় গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। এক: শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে আইনগত ব্যক্তির কোন অস্তিত্ব হতে পারে কি না? দুই: আইনগত ব্যক্তির কোন অস্তিত্ব হতে পারলে তার উপর কি প্রকৃত ব্যক্তির সকল আহকাম প্রযোজ্য হতে পারবে, নাকি কিছু প্রযোজ্য হবে আর কিছু অপ্রযোজ্য থেকে যাবে?

প্রথম মাসআলার ব্যাপরে আরজ হল, আজকাল দু'টি পরিভাষা ব্যবহৃত হয় এক: অর্থগত ব্যক্তি, দুই: আইনগত ব্যাক্তি। অর্থগত ব্যক্তি ব্যাপক এবং আইনগত ব্যক্তি বিশেষ হয়। ঐসকল প্রতিষ্ঠানকেই অর্থগত ব্যক্তি বলা যায়, যাকে তার মালিকানা ইত্যাদির সূত্রে তার অন্য একক থেকে পৃথক হুকমী অস্তিত্বের ধারক বলে মনে করা হয়। যেমন- ওয়াকফ বা মসজিদ ইত্যাদি। আর আইনগত ব্যক্তি ঐ অর্থগত ব্যক্তিকে বলা হয়, আইন যাকে পৃথক অস্তিত্বের ধারক ঘোষণা করে, যেমন- কোম্পানী। আমি যেহেতু আমার প্রবন্ধে ও 'ইসলাম আওর জাদীদ মায়ীশাত ও তিজারাত' নামক কিতাবে কোম্পানীর উপর আলোচনা করতে গিয়ে 'আইনগত ব্যক্তি' শব্দটি ব্যবহার করেছি, তাই কিছু ব্যক্তি ভুল বোঝাবুঝির শিকার হয়েছেন যে, শরয়ী কল্পনাকে প্রচলিত আইনের অনুগত করে দেয়া হয়েছে। অথচ, কোম্পানীর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় বিধায় কোম্পানীর আলোচনায় 'আইনগত ব্যক্তি'র পরিভাষাটি ব্যবহার করা হয়েছিল। কিন্তু এর উদ্দেশ্য 'অর্থগত ব্যক্তি' বা 'হুকমী ব্যক্তি' ছিল। তাই এই ভুলধারণা দুর করার জন্য এখানে আমি 'অর্থগত ব্যক্তি'র পরিভাষাটি ব্যবহার করব। অনেকে কোনভাবে 'অর্থগত ব্যক্তি'র অস্তিত্বকে স্বীকার করেননি। অথচ যতদুর 'অর্থগত ব্যক্তি'র অস্তিত্বের বিষয়ের সম্পর্ক আছে, তা অস্বীকার করা মানে একটি স্পষ্ট বিষয়কে অস্বীকার করা। প্রকৃত অর্থে 'অর্থগত

ব্যক্তি' হল- কোন প্রতিষ্ঠান নিজের হিসেবে একটি অস্তিত্ব ও অবস্থান ধারন করে, যা তাকে তার অন্য এককগুলো থেকে পৃথক করে দেয়। এটি এমন একটি বিষয়, যা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

চিন্তা করার বিষয় হল, যদি কোন দ্বীনি মাদরাসার পক্ষ থেকে আদালতে মামলা দায়ের করা হয়, তখন মূল পক্ষ বা বাদী 'প্রকৃত ব্যক্তি' হয় নাকি প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ 'অর্থগত ব্যক্তি' হয়? যদি প্রকৃত ব্যক্তি যেমন- মুহতামিম পক্ষ হয় তখন ঐ মুহতামিমের ইন্তেকালের পর মামলাটি তার উত্তরাধিকারগণ পরিচালনা করেন নাকি প্রতিষ্ঠানের নতুন মুহতামিম করেন? বলা বাহুল্য যে, দ্বিতীয়টিই সঠিক। এতে পরিস্কার হল যে, মূল পক্ষ প্রতিষ্ঠান ছিল, কিন্তু মুহতামিম তার প্রতিনিধি হিসেবে পক্ষভুক্ত হয়। মাদরাসার জন্য কোন কিছু ক্রয় করা হলে তার মালিক কি কোন প্রকৃত ব্যক্তি হয় নাকি প্রতিষ্ঠান হয়? যদি প্রকৃত ব্যক্তি মালিক হয় তাহলে তিনি মাদরাসার টাকার কীভাবে মালিক হলেন? মানুষ প্রতিষ্ঠানকে সাধারণভাবে যে চাঁদা ইত্যাদি দেয় তা কি কোন প্রকৃত ব্যক্তিকে দেয় নাকি প্রতিষ্ঠানকে অর্থগত ব্যক্তি হিসেবে দেয়? এ সব বাস্তবতা সামনে রেখে এটা কীভাবে বলা সম্ভব যে, ইসলামী শরীয়তে অর্থগত ব্যক্তির অস্তিত্বকেই স্বীকার করা হয় না।

মূল মাসআলা হল, অর্থগত ব্যক্তির উপর ঐসকল আহকাম কি প্রযোজ্য হবে যা প্রকৃত ব্যক্তির উপর প্রযোজ্য হয়, নাকি তার মধ্য কিছু প্রযোজ্য হবে আর কিছু হবে না? কিছু সমালোচকের বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, তাদের দৃষ্টিতে অর্থগত ব্যক্তির উপর প্রকৃত ব্যক্তির কোন আহকামই প্রযোজ্য হতে পারে না। বলা হয়েছে :

"আইনগত ব্যক্তির' অর্থগত অবস্থান মেনে নিয়ে তাকে প্রকৃত ব্যক্তির কাজকর্মের যোগ্য মনে করা এবং লেনদেনে আইনগত ব্যক্তিকে পক্ষের মর্যাদা দিয়ে যেসব লেনদেন করা হয় তা দুই চুক্তিকারীর শর্তাবলী পূরণ না হবার কারণে নাজায়েয এবং শরীয়তবিরোধী বলে পরিগণিত হবে। কেননা, চুক্তিকারী দুই পক্ষের শর্তাবলীতে পরিস্কারভাবে লেখা আছে যে, তারা উভয়ে স্বাধীন হবে, দাস হবে না, বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন হবে, বিবেক-বুদ্ধিহীন হবে না...... । এই বিশ্লেষণ থেকে বুঝা যায় যে, যেসব চুক্তিতে আইনগত ব্যক্তি পক্ষ হয় তা ফাসেদ এবং ভিত্তিহীন হবে। কেননা, চুক্তির দুই পক্ষের এক পক্ষকে চুক্তিকারী এবং ব্যক্তি বলা যায় না।"

(মুরাওয়াজা ইসলামী ব্যাংকারী পৃ:১৫৫-১৫৬)

এই কথাটি যদি তার ব্যাপক অর্থসহ যেভাবে বলা হয়েছে সেভাবে মেনে নেয়া হয়, তাহলে তার অর্থ দাড়ায়, যেকোন কোম্পানীর উৎপাদিত পণ্য কোম্পানী থেকে ক্রয় করার যতগুলো লেনদেন হয় তার সবকটিই নাজায়েয, ফাসেদ এবং ভিত্তিহীন। কেননা, লেনদেনের একটি পক্ষ হল আইনগত ব্যক্তি। যদি বলা হয়, লেনদেনের পক্ষ কোম্পানী নয়; বরং ঐ প্রতিনিধি যিনি ঐ পণ্যগুলো বিক্রয় করছেন, তাহলে প্রশ্ন হল, এই লেনদেনে যদি কোন বিবাদ সৃষ্টি হয় যেমন, কোম্পানীর উৎপাদিত পণ্যে উৎপাদনগত কোন ত্রুটি আছে এবং 'খিয়ারে আইব' বা ত্রুটি পাওয়ার কারণে সৃষ্ট অধিকার –এর ভিত্তিতে তা ফেরত দিতে হয়, তাহলে মামলা কার বিরুদ্ধে হবে? প্রতিনিধিটির বিরুদ্ধে নাকি আইনগত ব্যক্তি হিসেবে কোম্পানীর বিরুদ্ধে? যদি প্রতিনিধির বিরুদ্ধে হয়, তাহলে সে কোম্পানীর চাকরী ছেড়ে দিয়ে থাকলে কি তার ঘরে গিয়ে তার কাছে দাবী করা হবে? আর যদি মারা গিয়ে থাকে তাহলে কি তার উত্তরাধিকারদের কাছে দাবী করা হবে? যদি না হয়, তাহলে এর অর্থ এটা ছাড়া আর কী হতে পারে যে, চুক্তির পক্ষ প্রতিনিধি নয়; বরং আইনগত ব্যক্তি। আর যেহেতু সে পক্ষ হবার যোগ্যতা রাখে না এবং উপরোক্ত মূলনীতি অনুযায়ী চুক্তিটি সঠিক হয় না, তাই ক্রয়কৃত পণ্যের উপর ক্রেতার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অতএব, সে যদি কাউকে বিক্রয় করে তাহলে তা بناءالفاسد على الفاسد অর্থাৎ, ফাসেদের উপর আরেকটি ফাসেদের ভিত্তি হিসেবে নাজায়েয এবং ভিত্তিহীন হবে। সুতরাং, ফতোয়ার সারাংশ হল, বর্তমানে যত কোম্পানীর পণ্যদ্রব্য বাজারে বিক্রয় হচ্ছে, তার কোনটিই ক্রয় করা জায়েয নয় এবং এ সকল সদাইপাতি ফাসেদ, ভিত্তিহীন ও হারাম। আর যদি বলা হয়, মূলত কোম্পানীর সকল অংশীদারই সমষ্টিগতভাবে পক্ষ হবে, তাহলে অংশসমূহের বেচাকেনার কারণে অংশীদারদের সমষ্টি প্রতি মূহুর্তে পরিবর্তিত হতে থাকে এবং এই গৃহিত সমষ্টির নাম 'আইনগত ব্যক্তি'।

অনুরূপভাবে কোন মাদরাসার পক্ষ থেকে যদি কোন জিনিস ক্রয় করা হয় তাহলে যেহেতু মাদরাসা অর্থগত ব্যক্তি তাই উপরোক্ত বক্তব্য অনুসারে সে এই বেচাকেনার মধ্যে পক্ষ হতে পারবে না; বরং সেই পক্ষ হবে যে

ক্রয় করেছিল। এখন যদি বিক্রেতার কাছে কোন কিছু দাবী করতে হয় বা কোন মামলা দায়ের করতে হয় তখন মামলাটিতে ঐ ক্রেতা ব্যক্তিটি পক্ষ হবে নাকি মাদরাসা পক্ষ হবে? যদি প্রকৃত ব্যক্তিটি পক্ষ হয় তাহলে মাদরাসার চাকুরী ছেড়ে দেয়ার পরও কি তাকে মামলা লড়তে বলা হবে? অথবা যদি তার ইন্তেকাল হয়ে যায় তাহলে কি তার উত্তরাধীকারীরা মামলা লড়বে? যদি উত্তর 'না' হয়, তাহলে সে তো পক্ষ হল না। এ ক্ষেত্রে মাদরাসা অন্য কারো নাম প্রস্তাব করলে তার অর্থ হল, প্রকৃত পক্ষে মাদরাসাই পক্ষ ছিল, আর যেহেতু তা অর্থগত ব্যক্তি তাই এই ক্রয়কার্য সঠিক হয়নি।

মোট কথা, অর্থগত ব্যক্তি চুক্তিতে কোন পক্ষ হতে পারবে না এবং যে লেনদেনে সে পক্ষ হবে তা ফাসেদ হবে –এমন কথা বলা কোনভাবেই সঠিক হবে না।

আসল কথা হল, চুক্তিকারীর জন্য বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন হওয়ার যে শর্তারোপ করা হয়েছে, তার অর্থ হল, চুক্তিতে কথা বলা অর্থাৎ, ইজাব কবুল করার যোগ্যতা কোন অর্থগত ব্যক্তির থাকে না বিধায় এর জন্য কোন প্রকৃত ব্যক্তি হওয়া জরুরী। কিন্তু প্রকৃত ব্যক্তিটি অর্থগত ব্যক্তির প্রতিনিধি হিসেবে চুক্তি বা লেনদেন করবে। যেমন- কোন কিছু পার্থক্য করতে সক্ষম নয় এমন শিশুর পক্ষ থেকে তার অভিভাবক লেনদেন করে। কিন্তু লেনদেনের মাধ্যমে যে মালিকানা অর্জিত হয় তা ঐ অর্থগত ব্যক্তির জন্যই হয়, চুক্তি বা লেনদেন কারী প্রকৃত ব্যক্তির জন্য হয় না। হযরত মুফতী আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব নিজেই কোম্পানীকে একজন ব্যক্তি সাব্যস্ত করে শিরকাহ'র পক্ষ বানানোর সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন। 'মজলিসে তাহক্বীকে মাসায়িলে হাজেরা'য় তিনি ভিন্নমত পোষণ করে যে নোট লিখেছিলেন তাতে তিনি লেখেন:

"কোম্পানী পরিপূর্ণভাবে একজন ব্যক্তি (person)। এই হিসেবে ব্যাংক তার নিজের শতকরা ৭৫ ভাগ পুঁজির সীমা পর্যন্ত তাতে সংযুক্ত হবে। তাই কোম্পানীর সাথে তার যে শিরকাহ ছিল এখন তা শতকরা ২৫ ভাগ পর্যন্ত রয়ে গেল।" –(আহসানুল ফাতাওয়া খন্ড:৭ পৃ:১২৬)

সারাংশ হল, এ কথা বলা সঠিক নয় যে, আইনগত ব্যক্তির অর্থগত অবস্থান মেনে নেয়ার পরও তার উপর প্রকৃত ব্যক্তির আহকাম কোনভাবেই

প্রযোজ্য হতে পারে না। প্রকৃত পক্ষে সে প্রকৃত ব্যক্তির মতো ঋণদাতা ও গ্রহীতা হতে পারে। আলোচিত কিতাবের লেখকরাও ওয়াক্বফ ও বায়তুল মালের এই অর্থগত অবস্থান এবং এর ভিত্তিতে ঋণদাতা ও গ্রহীতা হতে পারাকে মেনে নিয়েছেন। (পৃ:১২১)

সীমিত দায়িত্ব

প্রশ্ন হল, অর্থগত ব্যক্তির অবস্থান যদি মেনে নেয়া হয়, তাহলে কি আইনগতভাবে কোম্পানীর ঋণগ্রহীতা হওয়ার দায়িত্বও ঐভাবে সীমিত হয়ে যাবে যেভাবে প্রকৃত ব্যক্তির দায়িত্ব নিঃস্ব হয়ে মারা যাওয়ার ক্ষেত্রে আইনগতভাবে তার উত্তরাধিকার সম্পত্তি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হয়ে যায়? এই মাসআলায় আমি যা কিছু স্পষ্টভাবে লিখেছি, তাতে এটাও পরিস্কারভাবে লিখেছি যে, এটা আমার পক্ষ থেকে কোন চুড়ান্ত ফতোয়া নয়; বরং এটা একটা চিন্তা ভাবনা, যা বিজ্ঞ ব্যক্তিদের গবেষণার জন্য পেশ করা হচ্ছে। এসব লেখার উদ্দেশ্যই ছিল এটা যে, এর উপর গবেষণা ও কাংখিত আলোচনা হবে। নতুবা আমার জানা নেই যে, এর পূর্বে আমাদের দেশে কেউ ফিক্বহী দিক থেকে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এ বিষয়ে আমি আমার কিতাবে লিখেছি:

"এই প্রবন্ধে যা কিছু পেশ করা হচ্ছে, তাকে এ বিষয়ে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত মনে না করা উচিৎ। এ বিষয়ে এটা প্রাথমিক চিন্তা ভাবনা। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হল, আরো অতিরিক্ত যাচাইয়ের জন্য ভিত্তি রচনা করে দেয়া।"

(ইসলামী ব্যাংকারী কি বুনিয়াদী পৃ:২৩২)

অতঃপর পুরো আলোচনার পর পূণঃরায় লিখেছি:

"পরিশেষে আমি ঐকথাটি পূণর্ব্যক্ত করছি, শুরুতেই যা চিহ্নিত করেছিলাম যে, সীমিত দায়িত্বের মাসআলাটি যেহেতু একটি নতুন মাসআলা, যার শরয়ী সমাধান বের করার জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন, তাই উপরোল্লিখিত আলোচনাকে এ বিষয়ে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত বিবেচনা করা উচিৎ হবে না। এটি শুধু প্রাথমিক চিন্তাভাবনার ফসল, যেখানে আরো আলোচনা ও যাচাইয়ের সুযোগ আছে।" (বরং আমার ইংরেজী শব্দের অধিক বিশুদ্ধ অনুবাদ হবে এটা:'যা সর্বদা আরো আলোচনা ও যাচাইয়ের অনুগত থাকবে'।) -(পৃ:২৪২)

আমার কিতাব 'ইসলাম আওর জাদীদ মায়ীশাত ওয়া তিজারাত' প্রকৃত পক্ষে আমার সেসব বক্তব্যের সমষ্টি, যা আমি উলামায়ে কেরামের একটি সমাবেশে প্রদান করেছিলাম। এর আসল উদ্দেশ্য ছিল, উপস্থিত সকলকে বর্তমান ব্যবসা পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত করা। এগুলোকে মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ মুজাহিদ শহীদ রহ. সংকলিত করেছিলেন। তবে এর ভূমিকাটি আমার লেখা, যেখানে আমি আরজ করেছিলাম:

"যদিও এই দরসের মৌলিক উদ্দেশ্য হল, বর্তমান ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোর সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া; যাতেকরে এসব মাসআলায় গবেষণা ও যাচাই বাছাই উলামায়ে কেরামের জন্য সহজ হয়ে যায়। কিন্তু যেহেতু বিগত প্রায় দশ বারো বৎসর পর্যন্ত এসব মাসআলাগুলো আমার নিজের গবেষণার বিষয় ছিল, তাই দরসে অংশগ্রহণকারীদের আকাঙ্খা ছিল, এসব মাসআলার ব্যাপারে আমার চিন্তাভাবনার সারাংশ আমি যেন তাদের খেদমতে পেশ করি। তাই এ সব মাসআলার উপর আমি ফিক্বহী অবস্থান থেকেও আলোচনা করেছি। এ আলোচনার ব্যাপারে আমি অধম দরসে অংশগ্রহণকারীদের সুস্পষ্ট করে দিয়েছিলাম যে, এর অবস্থান শুধু চিন্তাভাবনার। এগুলো এজন্যই উপস্থাপন করা হচ্ছে, যাতে করে উলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে গবেষণা করতে পারেন। এগুলোর মধ্যে অনেক মাসআলা এমন আছে, যার সুস্পষ্ট হুকুম কুরআন, সুন্নাহ অথবা ফিক্বহে পাওয়া যায় না। তাই এগুলোতে সম্মিলিতভাবে গবেষণা, যাচাই বাছাই এবং উদ্ভাবনের প্রয়োজন আছে। অতএব, ঐসব বক্তব্যে কোন মাসআলা সম্পর্কে যে ফিক্বহী আলোচনা করা হয়েছে, তা এ বিষয়ে শেষ কথা নয়। মাসআলাগুলো এজন্যই আলোচনায় আনা হয়েছে, যাতে এ বিষয়ে আলোচনার দ্বার উন্মুক্ত হয়। অধমের এই চিন্তাভাবনা অধমের ব্যক্তিগত ঝোঁকের প্রতিচ্ছবি হলেও একে অধমের পক্ষ থেকে চূড়ান্ত ফতোয়া মনে করা উচিৎ হবে না।" –(পৃ:৮-৯)

অতঃপর যেখানে সীমিত দায়িত্বের আলোচনা আছে, সেখানে আমি বিশেষভাবে আরজ করেছি যে, "এসব বিষয়ে আমি আমার এখনকার সময় পর্যন্তের চিন্তাভাবনার সারাংশ জ্ঞানী ব্যক্তিদের গবেষণার জন্য পেশ করছি।"–(পৃ:৮০)

কিন্তু কিছু সমালোচক এর উপর আলোচনা করতে গিয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা বাদ দিয়ে বিদ্রুপ শুরু করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি বারবার বলছে যে, এটা কোন চুড়ান্ত ফতোয়া নয়; বরং সম্মিলিতভাবে এর উপর গবেষণা করার প্রয়োজন আছে, তার ব্যাপারে স্বেচ্ছাচারিতা ও আত্মগরিমার অপবাদ আরোপ করা কোন ধরণের ন্যায়পরায়নতা?

প্রকৃত সত্য হল, সীমিত দায়িত্বের মাসআলাটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ভিন্ন মাসআলা; ব্যাংকের কারবারের সাথে যার কোন সরাসরি সম্পর্ক নেই। বর্তমানে সব বড় ব্যবসাগুলো লিমিটেড কোম্পানীর আকারে চলছে। যদি এগুলোর কোন একটি কোম্পানীর কারবারের ব্যাপারে, তা শরীয়ত মোতাবেক কি না ফতোয়া তলব করা হয়, তাহলে প্রশ্ন এবং উত্তর উভয়টিই এর কারবার সম্পর্কিতই হবে। সেখানে এটা আলোচিত হবে না যে, কোম্পানীটি লিমিটেড কি না? উদাহরণস্বরূপঃ কোন দারুল ইফতার কাছে যদি ফতোয়া চাওয়া হয় যে, কাপড় উৎপাদন ও বিক্রয়কারী অমুক কোম্পানী তার গ্রাহকদের সাথে অমুক অমুক পদ্ধতিতে লেনদেন করে। লেনদেনগুলো জায়েয হবে কি? উত্তরও ঐসব লেনদেন সম্পর্কিত আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। আজ পর্যন্ত কোন দারুল ইফতা এ ধরণের প্রশ্নের উত্তরে সীমিত দায়িত্বের প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন কি? জনাব শেখ ইরশাদ আহমদ সাহেব যখন করাচীতে একটি সুদবিহীন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন তখন তা একটি সীমিত দায়িত্ব সম্পন্ন (লিমিটেড) কর্পোরেশন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। ইতোপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, হযরত আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ ইউসুফ বিন্নুরী রহ. এর উপর অসাধারণ আনন্দ প্রকাশ করতে গিয়ে লিখেছেনঃ

"অত্যন্ত খুশির বিষয় হল, পাকিস্তানের একজন যোগ্য ও সৎ যুবক শেখ আহমদ এরশাদ এম.এ যিনি বেশ কয়েক বছর দেশের ভেতরে ও বাইরে থেকে ব্যাংকিং বিষয়ে পরিপূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করে ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও সূদী কারবারের ধ্বংসাত্মক দিক এবং ইসলামী অর্থব্যবস্থার কল্যাণকর দিকগুলোর উপর 'সূদবিহীন ব্যাংকিং' নামে একটি গ্রহনযোগ্য কিতাব রচনা করেছেন। গত বছর কিতাবটির ইংরেজী সংস্করণ এবং এ বছর উর্দূ সংস্করণ বের হয়েছে। তিনি 'The Co-operative Investment &Finance Corporation Limited' (দি কো অপারেটিভ

ইনভেষ্টমেন্ট এন্ড ফাইন্যান্স কর্পোরেশন লিমিটেড) নামে একটি প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিস্থাপন করেন। যাতে করে খুব দ্রুত ইসলামী ব্যবস্থার অভিজ্ঞতাও সামনে চলে আসে।" –(বাইয়্যিনাত,সফর সংখ্যা ১৩৮৫ হিজরী, পৃ:৮)

এখানে হযরত রহ. স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, কর্পোরেশনটি লিমিটেড, অর্থাৎ, তার দায়িত্ব সীমিত। তা সত্ত্বেও এর কার্যক্রম যেহেতু হযরতের দৃষ্টিতে উৎসাহ প্রদানের যোগ্য, তাই তিনি এর সমর্থন করেছেন। তিনি এ ব্যাপারে আলোচনা করেননি যে, সীমিত দায়িত্ব শরয়ী দৃষ্টিতে জায়েয কি না।

অনুরূপভাবে আমি সুদবিহীন ব্যাংকিংয়ের যে কর্মপদ্ধতিকে জায়েয বলেছি, তা কারবারের ধরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কোম্পানী লিমিটেড হওয়া না হওয়া একটি পৃথক মাসআলা, যাকে কারবারের ধরণের সাথে মিশিয়ে ফেলা উচিৎ নয়। হ্যা! যদি কোম্পানীটি লিমিটেড হওয়ার কারণে তার কারবার জায়েয হওয়া না হওয়ার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়, তাহলে ভিন্ন কথা। যতদুর সীমিত দায়িত্বের ধারণার প্রশ্ন জড়িত, তার উপর প্রথমে আমারও দৃঢ়তা ছিল না এবং প্রাথমিক যে ঝোঁক আমি প্রকাশ করেছি তার উপর পূণর্বার নজর দেয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। এর বিরুদ্ধে যেসব দলিল উপস্থাপন করা হয়েছে তার কিছু বাস্তবিক পক্ষে ভারপূর্ণ। কিন্তু বেশ কিছু উলামায়ে কেরাম মৌখিক বা লিখিত আরো কিছু দলিলের সূত্রে আমাকে বলেছেন যে, এই মাসআলার আরো কিছু দিক গবেষণার দাবী রাখে। তাই এর উপর কোন চুড়ান্ত ফলাফলে পৌছার পূর্বে আমার প্রাথমিক প্রস্তাব অনুযায়ী সামগ্রিক গবেষণা করা উচিৎ। কিন্তু তা এমন একটি সভায় আলোচানা করা দরকার, যেখানে পূর্বনির্ধারিত কোন বিষয়ে হঠকারিতা পরিহার করে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত পরিবেশে সবদিক নিয়ে গবেষণা ও যাচাই হবে।

তাই এখনো কোন চুড়ান্ত ফতোয়া প্রদান করা ছাড়া এই ভিত্তিতে কথা বলছি যে, যদি সীমিত দায়িত্বের ধারণা নাজায়েয ধরে নেয়ার পরও এর ভিত্তিতে কোন কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তাহলে কি এ কারণে তার সকল কার্যক্রম নাজায়েয হয়ে যাবে? এ ব্যাপরে কিছু সমালোচকের অবস্থান হলো:

"যদি মৌলিকভাবে দেখা হয় তাহলে ব্যাংক আইনগত ব্যক্তি হিসেবে ব্যাংকের ইসলামী অস্তিত্বই অবশিষ্ট থাকে না। এ ধরণের ব্যাংক নাজায়েয হবার জন্য তাতে আইনগত ব্যক্তির মতো শরীয়ত বিরোধী ভিত্তির উপস্থিতিই যথেষ্ঠ। ইসলামী ব্যাংকিংয়ের অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনার প্রয়োজনীয়তাও আর অবশিষ্ট থাকে না।" –(মুরাওয়াজা ইসলামী ব্যাংকারী পৃ:১৯৪)

এর অর্থ হল, যত লিমিটেড কোম্পানী এখন কাজ করছে, যেহেতু তাদের মধ্যে আইনগত ব্যক্তির মতো শরীয়তবিরোধী ভিত্তি উপস্থিত, তাই তার কারবারসমূহের জায়েয হওয়া না হওয়ার বিষয়ে আলোচনা করার কোন প্রয়োজনীয়তাই আর নেই; সবই নাজায়েয। যেভাবে উপরে একটি উদ্ধৃতিতে বলা হয়েছিল যে, যেহেতু আইনগত ব্যক্তি কোন চুক্তি বা লেনদেনে পক্ষ হতে পারে না, তাই তার সকল কার্যক্রম নাজায়েয। এর ফল দাঁড়ায় যে, বর্তমানে বাজারে যে সকল পণ্যদ্রব্যে বেচাকেনা হচ্ছে তার সবটিই হারাম। এই ধরণের গবেষণা পদ্ধতির উপর পর্যালোচনা করার জন্য কমপক্ষে আমার মত স্বল্পজ্ঞানীর কাছে কোন শব্দ নেই।

আরো বলা হয়েছে:

"প্রসপেক্টাসে লিখিত সীমিত দায়িত্ব ফিক্বহী দৃষ্টিকোণ থেকে এমন একটি ফাসেদ শর্ত, চুক্তিতে যার কোন গ্রহণযোগ্যতাই নেই। আর গ্রহণযোগ্যতা থাকলেও চুক্তিটি ফাসেদ এবং শর্তটি অগ্রহণযোগ্য হবে।"–(পৃ: ১৫৪)

এখানে 'গ্রহণযোগ্যতা থাকলে' 'অগ্রহণযোগ্য হবে' একই সাথে কথা দু'টি কিভাবে শুদ্ধ হয় তা লিখকগণই ভাল বলতে পারবেন। অথচ 'গ্রহণযোগ্যতাই নেই' কথাটির মধ্যে অগ্রহণযোগ্য হবার বিষয়টিই উল্লেখিত হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান কিভাবে শুদ্ধ হলো? তবে তাদের উদ্দেশ্য এটা হতে পারে যে, এই শর্তকে কোম্পানীর শিরকাহর জন্য আবশ্যকীয় করা হলে শিরকা'র চুক্তিই ফাসেদ হয়ে যাবে, ফলে শর্ত এবং চুক্তি দু'টোই ফাসেদ হবে। এ ব্যাপারে প্রথমে আরজ হল, এটাকে (দুই পক্ষের মাঝে) ফাসেদ শর্ত বলে বলা হলেও শিরকাহ এমন একটি চুক্তি, যা শর্তে ফাসেদের কারণে বাতিল হয় না; তবে শর্তটি বাতিল হয়ে যায়। (তবে যদি শর্তটি এমন হয় যে, তা বাতিল হবার কারণে শিরকাহই

আর অবশিষ্ট থাকে না, তাহলে ভিন্ন কথা, যেমন- কোন এক শরীকের জন্য কোন নির্ধারিত পরিমাণ টাকার শর্ত করা)। তানভীরুল আবসারে আছে:

”وما لايبطل بالشرط الفاسد القرض والهبة والصدقة والنكاح والطلاق والخلع والعتق والرهن والإيصاء والشركة والمضاربة الخ.“—(ردالمحتار ج:٥ ص: ٢٤٩—٢٥٠)

দ্বিতীয়ত: হযরত মাওলানা মুফতী আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব কয়েক জায়গায় এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, কোম্পানীতে যেহেতু ইজারার চুক্তি হয় এবং ইজারা শর্তে ফাসেদের কারণে ফাসেদ হয়ে যায়, তাই এই ফাসেদ শর্ত কোম্পানীর সাথে অংশীদারদের কৃত চুক্তিকেও ফাসেদ করে দেবে। তিনি বলেন:

"অতঃপর চুক্তিটি (অর্থাৎ কোম্পানী) শিরকাতে ইনান নয়; বরং ইজারা, যেমনটি আমরা স্পষ্ট করেছি। দারুল উলুম ওয়ালারা এটা বলে নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়া অর্থহীন যে, শিরকাহ শর্তে ফাসেদের কারণে ফাসেদ হয় না।"–(জাদীদ মাআশী মাসায়িল পৃ:৬৭)

কোম্পানী ইজারার চুক্তি কি না, তা নিয়ে ইন্‌শাআল্লাহ একটু পরেই কিছু আলোচনা করব, কিন্তু তার পূর্বে নিবেদন হল, যদি এটাকে ইজারা বলেও মেনে নেয়া হয়, তাহলে ঐ শর্তই চুক্তিকে ফাসেদ করে যা দুই পক্ষের কেউ অন্য পক্ষের উপর আরোপ করে। কিন্তু শর্তটি তৃতীয় কোন ব্যক্তির উপর আরোপ করা হলে তা চুক্তিকে ফাসেদ করে না; বরং শর্তটিই ফাসেদ হয়ে যায়। আল্লামা শামী রহ. লেখেন:

”المراد بالنفع ما شُرط من أحد المتعاقدين على الآخر، فلو على أجنبي لايفسد ويبطل الشرط لما في الفتح عن الولوالجية: بعتك الدار بألف على أن يقرضني فلان الأجنبي عشرة دراهم، فقبل المشتري لايفسد البيع لأنه لايلزم الأجنبي ولاخيار للبائع اهـ ملخصا.“—(ردالمحتار باب البيع الفاسد ج:٥ ص:٨٥)

আল বাহরুর রায়েক্বে আল্লামা ইবনে নাজীম রহ. বলেন-

"وفي المنتقي: قال محمد: كل شيئ يشترطه المشتري على البائع يفسد به البيع، فإذا شرطه على أجنبي فهو باطل، كما إذا اشترى دابة علـــى أن يهبه فلان الأجنبي كذا فهو باطل، كما إذا شرط على البائع أن يهبه."

এর টিকায় আল্লামা শামী রহ. লেখেন:

"قوله 'فهوباطل' أي فالشرط باطل كما في البزازية."-(منحة الخالق مع البحرالرائق، باب البيع الفاسد، ج:٦ ص:١٤١)

এখানে অংশীদারদের পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্বের সাথে সীমিত দায়িত্বের কোন সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ, এই শর্তটি এক অংশীদার অন্য অংশীদারের উপর বা (মুফতী আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের মতানুসারে যদি এটা ইজারা হয় তাহলে) ইজারাদাতা ইজারাগ্রহীতার উপর আরোপ করছে না; বরং এটা সকল অংশীদারদের পক্ষ থেকে তাদের ঋণদাতাদের জন্য একটি ঘোষণা বা তাদের সাথে একটি শর্ত যে, কোম্পানী দেউলিয়া হয়ে গেলে আপনাদের ঋণ কোম্পানীর আসবাবপত্রের তুলনায় যদি বেশী হয়, তাহলে আপনারা কেবল আসবাবপত্রের পরিমাণেই আপনাদের ঋণ উসুল করতে পারবেন। এই ঘোষণার সম্বোধিত ব্যক্তি অংশীদারগণ নয়; বরং অংশীদারদের ঋণদাতাগণ। তাই শর্তটি চুক্তির দুই পক্ষ পরস্পরের উপর আরোপ করছে না; বরং অপরিচিত ব্যক্তির উপর আরোপ করছে। উপরোক্ত ফিক্বহী উদ্ধৃতিসমূহের আলোকে এই ধরণের শর্ত নিজে বাতিল হলেও তার কারণে চুক্তি বা লেনদেন ফাসেদ হবে না। সীমিত দায়িত্ব নাজায়েয হওয়ার ক্ষেত্রে এই ঘোষণা এবং অপরিচিত ব্যক্তিদের উপর শর্তারোপ করা নাজায়েয হবে এবং শর্তটিও ফাসেদ হয়ে যাবে। কিন্তু এর কারণে চুক্তি ফাসেদ হবে না।

বাস্তবতা হল, কোম্পানীর চুক্তিকে মৌলিকভাবে ইজারা ঘোষণা করা এমন একটি অলৌকিক বিষয়, যার উপর আশ্চর্য্যান্বিত হওয়া ছাড়া আর কী করার আছে? কোম্পানীর শরয়ী অবস্থান সম্পর্কে অদ্যাবধি অনেকেই অনেক কিতাব ও লেখা রচনা করেছেন। কিন্তু কেউ এটাকে ইজারা বলেননি। আবার হযরত মুফতী সাহেব দা:বা:ও এ ব্যাপারে বিভিন্ন বাক্য

ব্যবহার করেছেন। ৫৫পৃষ্ঠায় তিনি বলেন: "যদিও সাধারণ পরিভাষায় তাকে শিরকাহ বলা হয় কিন্তু শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে তা শিরাকাহর চুক্তি নয়; বরং ইজারার।" তাছাড়া ৬৭ পৃষ্ঠায় বলেছেন: "ঐ চুক্তি(কোম্পানী) শিরকাতে ইনান নয়; বরং ইজারা।" এই দুই জায়গায় শিরকাহ হওয়াকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু ৫৯ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে: "প্রথমত শিরকাতে আমলাক অতঃপর ইজারা।" আবার ৬৯ পৃষ্ঠায় বলেছেন: "অংশের ক্রয়ের মাধ্যমে ইজারা চাহিদাগতভাবে সম্পন্ন হয়।"

আসলে হযরত মুফতী সাহেবের মনে যে কথাটি আছে তা হল, কোম্পানীকে ডাইরেক্টররা পরিচালনা করে। এজন্য তারা বেতন গ্রহণ করে। তারা অংশীদারদের বেতনভূক্ত কর্মচারী। অতএব, অংশীদারদের সাথে তাদের চুক্তি হয় ইজারার। কিন্তু কোম্পানীজ অর্ডিন্যান্স অধ্যয়ন করলে এবং কোম্পানীর কর্মপদ্ধতি থেকে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয় তা হল, কিছু লোক প্রাথমিকভাবে পুঁজি সমবেত করে জন সাধারণকে কারবারে অংশগ্রহণের আহ্বান জানায়। এই আহ্বানের জন্য যে লিটারেচার প্রকাশ করা হয় তাতে ডাইরেক্টর হিসেবে তাদের নাম থাকে। কিন্তু তারা কোম্পানীর কর্মচারী নয়। তাদেরকে বেতনও দেয়া হয় না। বরং তারা অংশীদারদের প্রতিনিধি হিসেবে কারবারের পলিসি নির্ধারণ করে। সব কোম্পানীতেই ডাইরেক্টরদেরকে ডাইরেক্টর হিসেবে কোন বেতন দেয়া হয় না। বরং মিটিংয়ে অংশগ্রহণের ফিস দেয়া হয়। অনেক কোম্পানীতে তাও দেয়া হয় না; বরং ডাইরেক্টরগণ শুধু অন্যান্য অংশীদারদের মত মুনাফায় শরীক হয়। তবে কোন ডাইরেক্টর যদি সার্বক্ষণিকভাবে কোম্পানীর কোন কাজ আঞ্জাম দেয় তাহলে তাকে বেতন দেয়া হয়। ডাইরেক্টরদের বোর্ড কোম্পানী পরিচালনা করার জন্য একজন চীফ এক্সিকিউটিভ (প্রধান নির্বাহী) নির্বাচন করে। এই প্রধান নির্বাহী সাধারণত প্রাথমিক ডাইরেক্টরদের মধ্য থেকে হয় না; বরং বাইরে থেকে নেয়া হয়। কিন্তু প্রধান নির্বাহী হওয়ার পর পদাধিকার বলে তাকেও ডাইরেক্টর মনে করা হয়।[২]

---

২. এই চীফ এক্সিকিউটিভ কোম্পানীর অংশীদার হলেও এর উপর আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে যে, অংশীদার কর্মচারী হতে পারে না। কিন্তু এ বিষয়ে হযরত মাওলানা মুফতী রশিদ আহমদ রহ. একটি বিস্তারিত ফতোয়া দিয়েছেন,

তবে অনেক সময় ডাইরেক্টরদের মধ্য থেকেও চীফ এক্সিকিউটিভ বানানো হয়। আবার কখনো চীফ এক্সিকিউটিভ ছাড়া কোন এক ডাইরেক্টরকে কোম্পানীর সার্বক্ষণিক দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এ রকম ডাইরেক্টরকে এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর বলা হয়। এ ক্ষেত্রে তিনি ডাইরেক্টর হিসেবে নয়; বরং কর্মচারী হিসেবে বেতন গ্রহণ করেন এবং মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করার জন্য সাধরণ ডাইরেক্টরদের যে ফিস দেয়া হয় তা তাকে দেয়া হয় না। বেতনধারী এক্সিকিউটিভ বা নির্বাহী নিয়োগদানের বিষয়টি কোম্পানী প্রতিষ্ঠার পরেই সম্পাদন করা হয়; কোম্পানী প্রতিষ্ঠার অংশ হয় না। কোম্পানীজ অর্ডিন্যান্সের ১৯৮ ও ২০০ নং দফায় তা উল্লেখ আছে:

198. (2) The directors of every company shall as form the date from which it commences business, or as form a date not later than the fifteenth day after the date of its incorporation, which ever is earlier, appoint any individual to be the chief executive of the company.

(3) The chief executive appointed as aforesaid shall, unless he earlier resigns or otherwise ceases to hold office, hold office up to the first annual general meeting of the company or, if a shorter period is fixed by the directors as the time of his appointment, for such period.

200. (2) The chief executive shall, if he is not already a director of the company, be deemed to be its director and be entitled to all the rights and privileges, and subject to all the liabilities of that office.

-(The companies ordinance, 1984, p 130)

যেখানে সুদৃঢ় দলিলের মাধ্যমে অংশীদারকে কর্মচারী বানানো জায়েয বলা হয়েছে। (দেখুন আহসানুল ফাতাওয়া খন্ড:৭ পৃ:৩২১-৩২৮। এখানে এর সূত্রটাই যথেষ্ট)

হযরত মুফতী আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব দাঃ বাঃ ৬২ নং পৃষ্ঠায় ডাইরেক্টররা কর্মচারী হওয়ার সমর্থনে একটি কোম্পানীর বার্ষিক রিপোর্টের সূত্রে বলেছেন যে, তার চীফ এক্সিকিউটিভকে লক্ষাধিক টাকা বেতন দেয়া হয়েছে। এখান থেকে হয়তো হযরত মুফতী সাহেব মনে করেছেন যে, চীফ এক্সিকিউটিভও ঐসব ডাইরেক্টরদের অন্তর্ভুক্ত, যারা প্রাথমিকভাবে কোম্পানী ঘোষনা করে। অথচ বাস্তবতা যা উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, চীফ এক্সিকিউটিভের নিয়োগ কোম্পানী প্রতিষ্ঠা হবার পর দেয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রেই তিনি প্রতিষ্ঠাতা ডাইরেক্টরদের মধ্য থেকে হন না; বরং বাইরে থেকে নেয়া হয়। তাকে শুধু পদাধিকার বলেই ডাইরেক্টর মনে করা হয়। মোট কথা হল, এসব কাজ কোম্পানী অস্তিত্ব লাভ করার পর করা হয়। এটি এমন একটি বিষয়, যেমনটি কিছু লোক অংশীদারী কারবার বা শিরকাহ আরম্ভ করার সময় এটা সিদ্ধান্ত নেয় যে, আমরা কিছু কর্মচারী নিয়োগ দিয়ে তাদের দিয়ে কাজ করাব। শুধু এই উদ্দেশ্যের বহিঃপ্রকাশের কারণে শিরকাহর চুক্তি ইজারায় পরিবর্তিত হয়ে যায় না। তাই তার সাথে সংঘটিত ইজারাকে কোম্পানী প্রতিষ্ঠার মৌলিক চুক্তি সাব্যস্ত করা কোনভাবেই সঠিক নয়।

অতঃপর আমার মতো একজন স্বল্পজ্ঞান সম্পন্ন মানুষের পক্ষে এটা বুঝা সম্ভব নয় যে, হযরত মুফতী সাহেব দাঃবাঃ কেন এই শিরকাহকে শিরকাতে আক্বদের পরিবর্তে শিরকাতে মিলক সাব্যস্ত করতে হঠকারী হলেন? অথচ, সকল অংশীদারগণই এই শিরকাহর মাধ্যমে লাভজনক কারবার করার ব্যাপারে একমত হয়েছেন এবং এই উদ্দেশ্যে টাকা জমা করে তারা প্রতিষ্ঠাতা অংশীদারদেরকে কারবারে তাদের প্রতিনিধি বানিয়ে নেন। অথচ শিরকাতে মিলক-এ প্রত্যেক অংশীদার নিজের অংশে অন্যের অংশের জন্য অপরিচিত থাকেন। এটি সকল ফিক্বহের কিতাবে উল্লেখ আছে। কিন্তু শায়খ মোস্তফা আযযরক্বা রহ. দুই প্রকারের শিরকাহর পার্থক্য আরো বেশী স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

"إن الملكية الشائعة إنما تكون دائما في شيئ مشترك فهذه الشركة إذا كانت في عين المال فقط دون الإتفاق على استثماره بعمل مشترك تُسمى شركة ملك- وتقابلها شركة العقد، وهي أن يتعاقد شخصان فاكثر على

استثمار المال أو العمل واقتسام الربح كما في الشركات التجارية والصناعية-" -(المدخل الفقهي العام ج:١ ص:٢٦٣)

আরেক জায়গায় তিনি এভাবে আরো স্পষ্ট করেছেন :

"عقد الشركة: وهو عقد بين شخصين فأكثر على التعاون في عمل اكتسابي واقتسام ارباحه- والشركة في ذاتها قد تكون شركة ملك مشترك بين عدة أشخاص ناشئة عن سبب طبيعي كالإرث مثلا، وقد تكون شركة عقد بأن يتعاقد جماعة على القيام بعمل استثماري يتساعدون فيه بالمال او بالعمل ويشتركون في نتائجه- فشركة الملك هي من قبيل الملك الشائع، وليست من العقود، وإن كان سببها قد يكون عقدا كما لواشترى شخصان شيئا فإنه يكون مشتركا بينهما شركة ملك ولكن ليس بينهما عقد على استغلاله واستثماره بتجارة أو إجارة ونحو ذلك من وسائل الإسترباح- وأما شركة العقد التي غايتها الإستثماروالإسترباح فهي المقصودة هنا، والمعدودة من أصناف العقود المسماة-"-(المدخل الفقهي العام ج:١ ص:٥٥١)

এই কথাটি এখানে অন্তর্গতভাবে এসে গেছে। এখন কোম্পানীর সব মাসআলা আলোচনা করা উদ্দেশ্য নয়; বরং আলোচনা এ বিষয়ে চলছিল যে, সীমিত দায়িত্ব শরয়ীভাবে নিষিদ্ধ হলে তাতে সুদবিহীন ব্যাংকের লেনদেনে এমন কোন প্রভাব কি পড়ে, যার কারণে তা নাজায়েয হয়ে যায়? সুতরাং, সীমিত দায়িত্বের শর্তেফাসেদের কারণে কোম্পানীতে শিরকাতে আক্বদই ফাসেদ হয়ে যাবে- এই ধারণাটি উপরোক্ত আলোচনার ম্যাধমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে যায়।

Contents

মুদারাবার উপর সীমিত দায়িত্বের প্রভাব

এই সূত্রে আরেকটি আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে যে:

"দ্বিতীয়তঃ সাধারণ হিসাবধারীদের ক্ষেত্রে 'কোম্পানী' ও 'ব্যাংক' মুদারিব (working partner) হয়। আর (সাধারণ ও অনুমতিপ্রাপ্ত নয় এমন) মুদারিবের দায়িত্ব সর্বসম্মতিক্রমে অসীম (unlimited)হয়। অর্থাৎ, সে যদি পুঁজিদাতার (investor) পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট অনুমতি ছাড়া অবশ্য আদায়ী লেনদেনের বোঝা একত্রিত করে, তাহলে তার দায়িত্ব পুঁজিদাতার (investor) নয়; বরং মুদারিব (working partner) নিজেই তা বহন করবে। কিন্তু কোম্পানী ও ব্যাংক প্রাণহীন 'আইনগত ব্যক্তি' (juristic) হওয়ার আড়ালে আপন দায়িত্ব সীমিত (limited) ঘোষণা করে এবং 'পুঁজিদাতা'র সীমিত দায়িত্বকে নিজের এই কল্পনার দলিল হিসেবে ব্যবহার করে।(১)

(১) এখানে আমার ঐ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হচ্ছে যেখানে আমি বলেছিলাম, বিশেষ বিশেষ অবস্থায় পুঁজিদাতার দায়িত্ব সীমিত হয় এবং ঋণের মাধ্যমে হওয়া ক্ষতি মুদারিব বহন করবে।

-(ইসলাম আওর জাদীদ মায়ীশাত ওয়া তিজারাত পৃঃ৮১)

এই দ্বৈত অবস্থান প্রকৃত পক্ষে মুনাফা সঞ্চয়ের এবং লোকসানের দায়িত্ব থেকে ফাঁকি দেয়ার জন্য নাজায়েয এবং শরীয়ত বিরোধী কৌশল ছাড়া আর কিছু নয়। এই দ্বৈত অবস্থান শুধু মুদারাবার আহকাম লংঘণ নয়; বরং 'مطففين' (ওজনে কম দাতাদের) এর অন্তর্ভূক্ত হবে।"

—(মুরাওয়াজা ইসলামী ব্যাংকারী পৃঃ ১৯৮)

দুঃখের বিষয় হল, এই আপত্তিতেও সঠিক পরিস্থিতি অনুধাবনের চেষ্টা করা হয়নি। বাস্তবতা হল, কোম্পানী হিসেবে ব্যাংকের দায়িত্ব সীমিত (লিমিটেড) হবার কারণে ব্যাংকের মধ্যে পুঁজিদাতা ও মুদারিবের যে সম্পর্ক ও পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য ইত্যাদি থাকে তাতে কোন হেরফের হয় না। পুঁজিদাতার উপর শরয়ীভাবে যতটুকু দায়িত্ব অর্পিত হয়, তাই ঠিক থাকবে এবং মুদারিবের উপর শরয়ীভাবে যতটুকু দায়িত্ব অর্পিত হয় ঠিক তাই অবশিষ্ট থাকবে। কেননা, মুদারাবার নিয়ম হল, তাতে মুদারিবের বাড়াবাড়ি ছাড়া কোন প্রকৃত লোকসান হলে তা পুঁজিদাতার উপর পড়ে; মুদারিবের শুধু এটুকু ক্ষতি হয় যে, তার পরিশ্রম ব্যর্থ হয়ে

যায়। ব্যাংক যখন মুদারিব এবং ডিপোজিটর পুঁজিদাতা হয়ে গেল, তখন যদি ব্যাংকের কোন বাড়াবাড়ি ছাড়া কোন প্রকৃত লোকসান হয় তাহলে শরয়ী হুকুম মতে পুঁজিদাতারাই তা বহন করবে। এজন্য নয় যে, ব্যাংকের দায়িত্ব সীমিত।

যদি ব্যাংকের দায়িত্ব সীমিত না হত তখনও লোকসানের ভার তাদের উপরই পড়ত। আর যদি লোকসান ব্যাংকের বাড়াবাড়ির কারণে হয়, যাতে পুঁজিদাতাদের অনুমতি ছাড়া ঋণ গ্রহণ করাও অন্তর্ভুক্ত, তাহলে সীমিত দায়িত্বের ধারণাও তাকে তা থেকে মুক্তি দিতে পারে না। কেননা, সীমিত দায়িত্ব কোম্পানীকে কোন প্রতারণা করা, চুক্তি ভঙ্গ করা বা অধিকার অতিক্রম করার ক্ষেত্রে কোন নিরাপত্তা প্রদান করে না। অতএব, কোম্পানীর আইনে তার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে:

194. Liabilities, ctc. of directors and officers.- Save as provided in this section, any provision, whether contained in the articles of a company or any contract with a company or otherwise, for exempting any director, chief executive or officer of the company or any person, whether an officer of the company or not, employed by the company as auditor, from, or indemnifying him against, any liability which by virtue of any law would otherwise attach to him in respect of any negligence, default, breach of duty or breach of trust of which he may be guilty in relation to the company, shall be void....... –(The companies ordinance, 1984, P:124)

এই ধারাটির সারাংশ হল, কোম্পানীর কোন ডাইরেক্টর বা চীফ এক্সিকিউটিভ বা অন্য কোন অফিসার যদি কোন অলসতা, দায়িত্বে অবহেলা, খিয়ানত বা আইন ভঙ্গ করে, তাহলে সে শুধু এর জন্য দায়ী হবে তা নয়; বরং তাকে রক্ষা করার জন্য কোন চুক্তি হয়ে থাকলেও তা অনুপস্থিত বলে গণ্য হবে। এখান থেকে পরিষ্কার হয় যে, সীমিত দায়িত্বের কারণে ঐ ক্ষতির ক্ষেত্রে কোন নিরাপত্তা পাওয়া যায় না, যা

মুদারিবের অলসতা বা বাড়াবাড়ির কারণে হয়ে থাকে। তাই মুদারাবা চুক্তির পরিসীমা পর্যন্ত কোম্পানীর সীমিত দায়িত্বের কারণে কোন দ্বিমুখী কাজ, দ্বৈত অবস্থান এবং ওজনে কম দেয়ার মতো কিছুই নেই।[৩]

সারাংশ হল, সীমিত দায়িত্বের ধারণা শরীয়তবিরোধী হলেও তার উদ্দেশ্য হবে, একটি শরীয়তবিরোধী ঘোষণা প্রদান, যা শরয়ীভাবে গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু এর কারণে শিরকাহর চুক্তিও ফাসেদ হবে না এবং মুদারাবার চুক্তিতেও কোন শরীয়তবিরোধী ফল বেরিয়ে আসবে না। সীমিত দায়িত্ব শুধু ঐ দুষ্প্রাপ্য ক্ষেত্রে বাস্তাবায়িত হয়, যখন কোম্পানী দেউলিয়া হয়ে যায়। সেসময় কোম্পানীর শরীকদের উপর শরয়ীভাবে ওয়াজিব হবে, যেন তারা এই শরীয়ত বিরোধী ঘোষণার উপর আমল না করে। যার পদ্ধতি হল- দেউলিয়া হয়ে গেলে কোম্পানীর বিনাশের জন্য একজন অফিসার নিয়োগ করা হয় যাকে Inquidator বলা হয়।

---

৩. এখানে আরেকটি বিষয় স্পষ্ট করা দরকার, যদিও সরাসরি আলোচ্য বিষয়ের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই, তা হল : আমার কিতাব 'জাদীদ মায়ীশাত ওয়া তিজারাত'-এ আমি লিখেছি : "যতক্ষণ পর্যন্ত পুঁজিদাতা মুদারিবকে অন্যের কাছ থেকে ঋণ নেয়ার অনুমতি না দেয়, ততক্ষণ পর্যন্ত মুদারাবাতেও পুঁজিদাতার দায়িত্ব তার পুঁজি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে।" –(পৃ:৮১)। এই বাক্যের উপর সার্বিকভাবে এই আপত্তি উত্থাপন করা সঠিক যে, পুঁজিদাতার সুস্পষ্ট অনুমতি ছাড়া মুদারিবের ঋণ নেয়ার অধিকার না থাকলেও বাকীতে ক্রয় যা কিনা প্রচলিত তা করার অধিকার আছে। এই জন্য ঐ ক্ষেত্রে তার দায়িত্ব অসীম হয়ে যায়। কিন্তু পুঁজিদাতা যদি মুদারিবকে স্পষ্টভাবে বাকীতে ক্রয় করাও নিষেধ করে দেয় তাহলে মুদারিব তা করতে পারবে না। এ ক্ষেত্রে পুঁজিদাতার দায়িত্ব তা পুঁজি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে। অতএব 'মাবসূত'এ একদিকে বলা হয়েছে:

"والشراء بالنسيئة وبالنقد من صنيع التجارفيملك المضارب النوعين جميعا بمطلق العقد"

–(المبسوط للسرخسي، كتاب المضاربة، باب ضياع مال المضاربة قبل الشراء وبعده ج:٢٢ ص:١٧٠، ط: دارالمعرفة)

অন্যদিকে এটাও বলা হয়েছে:

" ولودفعه إليه مضاربة على أن يشتري بالنقد ويبيع فليس له أن يشتري إلا بالنقد، لأن هذا تقييد مفيد في حق رب المال–"–(المبسوط، باب مايجوزللمضارب في المضاربة ج:٢٢ ص:٤٤)

অংশীদারগণ নিজ থেকে তার কাছে গিয়ে প্রস্তাব করবে যে, যেসব ঋণদাতা তাদের অধিকার বঞ্চিত হচ্ছে তাদের অবশিষ্ট অবশ্য আদায়ী ঋণসমূহ থেকে যে পরিমাণ অংশ আমাদের ভাগে পড়ে তা আমরা আদায় করতে প্রস্তুত। অতঃপর সেই অফিসার তাদের প্রত্যেকের ভাগে কত পড়ে তা জানিয়ে দিবে। এসব টাকা আদায় করা ওয়াজিব হবে। যদি কোন ব্যক্তি কোন লিমিটেড কোম্পানীর অংশীদার হয় তাহলে সীমিত দায়িত্বের ধারণা নাজায়েয হবার ক্ষেত্রে শরয়ীভাবে তার উপর আবশ্যই এই দায়িত্ব বর্তায়। কিন্তু এর কারণে শিরকাহ বা মুদারাবাকে ফাসেদ বলা যাবে না।

কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়

আলোচ্য সমালোচনাগুলোতে সুদবিহীন ব্যাংকিংয়ের ব্যাপারে যেসব ফিক্বহী আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে, দৃশ্যতঃ এ পর্যন্ত তার সব ক'টির উপর আলোচনা হয়েছে। তবে আরেকটি আপত্তি এও উত্থাপিত হয়েছে যে, সুদবিহীন ব্যাংক কোম্পানীসমূহের শেয়ারও ক্রয় করে। সমালোচকদের মধ্যে অনেকেতো কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করাকে সাধারণভাবে নাজায়েয বলেছেন। এক লেখায় বলা হয়েছেঃ

"অনুরূপভাবে ইসলামী ব্যাংক শেয়ার বাজার (Stock exchange)থেকে শেয়ার বেচাকেনা করে। অথচ ষ্টক মার্কেটের কার্যক্রম বাস্তব ও ইলমী প্রেক্ষাপটে এখন ব্যাপকভাবে নাজায়েয ঘোষিত হবার অপেক্ষা করছে।" –(মুরাওয়াজা ইসলামী ব্যাংকারী পৃঃ৩০৭)

বাস্তবতা হল, সুদবিহীন ব্যাংকসমূহ কোম্পানীর শেয়ার কেনার সময় ঐসমস্ত শর্তাবলী অনুসর করে থাকে, যা হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. ইমদাদুল ফাতাওয়ায় (খন্ডঃ৩ পৃঃ ৪৮৬-৫১২) বর্ণনা করেছেন। যা আমি আরো বিস্তারিতভাবে 'ইসলাম আওর জাদীদ মায়ীশাত ওয়া তিজারাত' কিতাবে উল্লেখ করেছি। সেখানে যেসব দলিল পেশ করা হয়েছে, তা এখানে পূণরায় উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। উপরোক্ত বাক্যের লেখকদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাদ এবং জামেয়াতুল উলুম আল ইসলামীয়া বিন্নুরী টাউনের দারুল ইফতার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা মুফতী ওয়ালী হাসান রহ.ও উক্ত শর্তাবলী সহকারে শেয়ারের ক্রয় বিক্রয়কে জায়েয মনে করতেন। পাকিস্ত

ানে এন আই টি ইউনিট প্রায় সকল স্টক মার্কেটেই পুঁজি বিনিয়োগ করে। আর এসব কোম্পানী হচ্ছে সীমিত দায়িত্বের কোম্পানী। আমাদের দারুল ইফতায় হযরত মাওলানা মুফতী ওয়ালী হাসান রহ.-এর ফতোয়া সংরক্ষিত আছে, যেখানে তিনি এন আই টি ইউনিটে পুঁজি বিনিয়োগকে জায়েয বলেছেন। এই ফতোয়ার উপর হযরত মাওলানা ড. আব্দুর রাজ্জাক সিকান্দার সাহেব দা:বা: এর সমর্থনসূচক স্বাক্ষরও আছে। আশা করি জামেয়াতুল উলুম আল ইসলামীয়া বিন্নুরী টাউনের দারুল ইফতার রেকর্ডে এই ফতোয়া অবশ্যই সংরক্ষিত আছে। ॥ আল্লাহই ভাল জানেন॥

বিক্ষিপ্ত কিছু কথা

সুদবিহীন ব্যাংকিংয়ে প্রচলিত বিভিন্ন পদ্ধতির উপর যেসব ফিক্বহী সুক্ষ্ম বিষয়ের অবতারনা করা হয়েছে, তার যাচাইমুলক আলোচনা পেছনের পাতাগুলোতে করা হয়েছে। যেসব সমালোচনা সামনে এসেছে তার মধ্যে এমন কিছু আছে যার সাথে ফিক্বহের কোন সম্পর্ক নেই। এখানে এ ধরণের বিষয়গুলোর কোন প্রতিবাদ করা হয়নি। তবে পরিশেষে এ ব্যাপারে কিছু আলোচনা পেশ করা সমুচিৎ বলে মনে করছি।

স্টেট ব্যাংক ও সুদবিহীন ব্যাংকিং

একটি ভুল ধারণা খুব জোরেশোরেই ছড়ানো হয়েছে যে, সুদবিহীন ব্যাংকসহ সকল ব্যাংকই স্টেট ব্যাংকের তৈরী নিয়ম কানুন মানতে বাধ্য এবং স্টেট ব্যাংকের সকল কার্যক্রম সুদের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। এমতাবস্থায় সুদবিহীন ব্যাংক সুদী লেনদেন থেকে কীভাবে নিরাপদ থাকবে?

এই প্রশ্নের উত্তর হল, সুদবিহীন ব্যাংক যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন স্টেট ব্যাংক তাকে সুদী ব্যাংক থেকে পৃথক লাইসেন্স প্রদান করে। এ লক্ষ্যে স্টেট ব্যাংকে পৃথক একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত আছে, যা শুধু সুদবিহীন ব্যাংকের লেনদেন সম্পর্কিত। এর একটি শরীয়া বোর্ডও আছে। এখন স্টেট ব্যাংক দেশে চলমান সকল সুদবিহীন ব্যাংককে এ বিষয়ে বাধ্য করে দিয়েছে যে, তারা তাদের লেনদেনসমূহে ঐ 'শরয়ী মাপকাঠি' অনুসরণ করবে যা বাহরাইনের هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية-

এর মজলিসেশরয়ী প্রস্তুত করেছে। স্টেট ব্যাংক এসব মূলনীতির ভিত্তিতে সুদবিহীন ব্যাংকসমূহের তত্ত্বাবধান করে। তাই তারা এমন কোন নিয়ম জারী করে না, যার কারণে সুদবিহীন ব্যাংকসমূহ শরীয়তবিরোধী কোন লেনদেন করতে বাধ্য হয়ে পড়ে। তবে তাদের অধিকাংশ নিয়ম কানুন প্রশাসনিক শৃংখলা বিষয়ক হয়ে থাকে, যার কারণে সুদবিহীন ব্যাংকসমূহকে নাজায়েয কোন চুক্তি ও লেনদেন করতে হয় না।

দুঃখের বিষয় হল, এসব সমালোচক ঘটনার সঠিক যাচাই না করেই খুব জোরেশোরে এই আপত্তিও উত্থাপন করেছেন যে, প্রত্যেক ব্যাংকের ডিপোজিটের একটি অংশ স্টেট ব্যাংকে সুদের ভিত্তিতে জমা রাখতে হয়। তাই সুদবিহীন ব্যাংকও সুদী ঋণ প্রদানের গুনাহে লিপ্ত হয়। অথচ সুদবিহীন ব্যাংক এই টাকাগুলো স্টেট ব্যাংকে ঠিক সেভাবেই রাখে যেভাবে মুসলিম জনসাধারণ কারেন্ট একাউন্টে টাকা জমা রাখে। এর উপর তারা এক পয়সার সুদও উসুল করে না। বিষয়টি 'ঘটনার সঠিক যাচাই ছাড়াই আপত্তি' শিরোনামে ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সংরক্ষণ

এসব সমালোচনায় আরেকটি কথা বলা হয়েছে যে, এই লেনদেনগুলোকে জায়েয করলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে সংরক্ষণ করা হয়। বরং কিছু লেখায় এই ধাঁচে বলা হয়েছে যে, এই গবেষণাপদ্ধতি পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে সংরক্ষণ করার জন্য গ্রহণ করা হচ্ছে।

এ সম্পর্কে নিবেদন হল, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কোন শরয়ী কিংবা ফিক্বহী পরিভাষা নয়; বরং একটি অর্থনৈতিক পরিভাষা। যার নিজস্ব স্বীকৃত পদ্ধতি আছে এবং সমাজবাদী ব্যবস্থারও কিছু নিজস্ব স্বীকৃত পদ্ধতি আছে। ইসলামের অর্থনৈতিক শিক্ষা ও আহকামকে পুঁজিবাদী ও সমাজবাদী ব্যবস্থা থেকে পার্থক্য করার একমাত্র সীমারেখা হল, হালাল হারামের পার্থক্য। শরীয়ত যা জায়েয করেছে তা শুধু এ কারণে নাজায়েয করে দেয়া যাবে না যে, পুঁজিবাদী ও সমাজবাদী ব্যবস্থাতেও তার প্রচলন আছে। যেমন: পুঁজিবাদের মূলনীতি হল, ব্যক্তিমালিকানাকে স্বীকার করা। প্রকাশ থাকে যে, ইসলামও ব্যক্তিমালিকানাকে স্বীকার করে। কিন্তু সমাজবাদী চিন্তাধারার ধারকদের অভ্যাস হল, যখনই ব্যক্তিমালিকানাকে শরীয়তের

আলোকে প্রমাণিত করা হয়, তখনই তারা এই অভিযোগ করে বসে যে, এর মাধ্যমে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে স্থায়িত্ব প্রদান করা হচ্ছে। এই ধরণের চিন্তাধারা অন্তত উলামাদের গ্রহণ করা উচিৎ নয়।

প্রকৃত সত্য হল, শরীয়ত যে জিনিসকে হালাল বলেছে তাকে হলালই বলতে হবে, যদিও এর উপর পুঁজিবাদকে সহায়তা করার অভিযোগ উত্থাপিত হয়। আর শরীয়ত যে জিনিসকে হারাম করেছে তাকে হারামই বলতে হবে, যদিও তার উপর সমাজবাদী মনমানসিকতার অপবাদ আরোপিত হয়। এটাই হচ্ছে ইসলামের পার্থক্যকারী ঐ সীমারেখা, যা দুই অর্থব্যবস্থার প্রান্তসীমার মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য সৃষ্টি করে দেয়। শরীয়তে হালাল হারাম নির্ধারণের নিজস্ব মূলনীতি আছে, যেগুলোকে পুঁজিবাদী বা সমাজবাদী ব্যবস্থার মূলনীতির অনুগামী করা যাবে না। সমাজবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে কোন ব্যক্তি বা একাধিক ব্যক্তি কোন কারখানার মালিক হওয়াটা সম্পূর্ণরূপে পুঁজিবাদী চিন্তাধারা বলে মনে করা হয়। তাদের দৃষ্টিতে ইজারাদারীও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ঘৃণিত অংশ। তারা জমির মালিকানাকেও পুঁজিবাদী মানসিকতার ফল বলে সাব্যস্ত করেন। এগুলো যে পুঁজিবাদের অংশ, তা সঠিক। কিন্তু শুধু এই কারণে এগুলোকে কি হারাম বলা যাবে?

বর্তমানে সমস্ত উলামায়ে কেরামের ফতোয়া হল, যেখানে সুদবিহীন ব্যাংক পাওয়া যাবে না সেখানে জনগণ সুদী ব্যাংকের কারেন্ট একাউন্টে টাকা জমা রাখতে পারবেন। এর অর্থ হল, এই টাকা দিয়ে ব্যাংক এবং পুঁজিপতিরাই লাভবান হবে, দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের মুনাফার কোন অংশই জনসাধারণ পাবে না। এর ম্যাধমে কি পুঁজিপতি ও পুঁজিবাদের বড় ধরণের সহায়তা হচ্ছে না? এবং এই ফতোয়া কি জাতীয় সম্পদের প্রবাহ চিরস্থায়ী পুঁজিপতিদের দিকে করে দেয়ার কারণ হয়ে যাচ্ছে না? এই ফতোয়া গণ প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে প্রদান করা হয়েছিল, কিন্তু কেউ এই কথা বলে এর বিরোধীতা করেনি যে, এর মাধ্যমে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সংরক্ষণ হচ্ছে। আশ্চর্য্যের বিষয় হল, যখন সুদবিহীন ব্যাংকে এমন কোন পদ্ধতি গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়, যার মাধ্যমে টাকা জমাকারীদের কমপক্ষে কিছু মুনাফা জায়েয পদ্ধতিতে অর্জিত হয় এবং ঐ সম্পদ যার মাধ্যমে সাধরণ পুঁজিপতিরা লাভবান হয় তার কিছু না কিছু অংশ জনসাধারণ পর্যন্ত

পৌঁছে যায়, তখন বলা হয় যে, এর মাধ্যমে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সংরক্ষিত হচ্ছে। সুতরাং, সেখানে শরয়ী চুক্তি বা লেনদেনেও গণপ্রয়োজনীয়তার কোন নিয়ম প্রযোজ্য নয় বলে মনে করা হয়।

যখন এই প্রস্তাব পেশ করা হয় যে, ব্যাংকের ব্যবসায়িক মুনাফা দৈনিক উৎপাদন পদ্ধতিতে বন্টিত হবে, যাতেকরে অর্জিত মুনাফা ঐসব সাধারণ মানুষ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে যারা কোন একটি নির্দিষ্ট তারিখে টাকা জমা রাখার ব্যবস্থা করতে পারে না, তখন বলা হয়, যেহেতু পদ্ধতিটি সরাসরি সনাতন কোন কিতাবে উল্লেখিত হয়নি, তাই তা গ্রহণযোগ্য নয়। সাথে এই শর্তারোপ জরুরী মনে করা হয় যে, যারা মুনাফা অর্জন করতে চায় তারা একটি তারিখেই টাকা নিয়ে আসবে, যদি অন্য দিন আনতে চায় তাহলে তা কারেন্ট একাউন্টে জমা রেখে পুরো মুনাফা ব্যাংকের মালিকদের সোপর্দ করবে। তাছাড়া সুদবিহীন ব্যাংকের সাথে মুরাবাহা ও মেশিনারী ইত্যাদির ইজারাকারীরা বেশীর ভাগ বড় ধনী লোক হয়। যদি তারা কোন জিনিস কেনার ওয়াদা করে ব্যাংকের মাধ্যমে ডিপোজিটরদের টাকায় ঐ জিনিস ক্রয়ে ব্যয় করার পর ওয়াদা ভঙ্গ করে, তাহলে তাদের মুক্তি দয়া উচিৎ। এর মাধ্যমে যদি ডিপোজিটরদের ক্ষতি হয় তাহলে তা ঐসব পুঁজিপতিদের কাছ থেকে উসুল করা উচিৎ হবে না। এ ছাড়াও এসব ধনীরা তাদের অবশ্য আদায়ী টাকা আদায় করতে বিলম্ব করলে তা কোন অভাবের কারণে নয়; বরং ঐ টাকা দিয়ে অতিরিক্ত মুনাফা কামানোর জন্য এরূপ করে এবং এর মাধ্যমে ব্যাংকের সাথে সাধারন ডিপোজিটরদেরও চরম ক্ষতি পৌঁছে। সুতরাং, যখন এমন কোন প্রস্তাব পেশ করা হয় যে, এই কারণহীন বিলম্বের ক্ষেত্রে নিজের মুনাফা থেকে কিছু অংশ ব্যাংক অথবা ডিপোজিটরদের দেয়ার পরিবর্তে গরীবদের সদকা করে দিবে তাহলে বলা হয়, এটা হানাফী মাযহাবপরিপন্থী বিধায় তাদের এমনভাবে মুক্তি দেয়া উচিৎ যেন বিলম্ব করলেও গরীবদের জন্য কোন আর্থিক দায়-দায়িত্ব আরোপ করা না হয়। শুধু এটুকুই নয়; বরং যখন বলা হয়-মুরাবাহা ও ইজারা সুদবিহীন ব্যাংকিংয়ের সর্বশেষ ধাপ নয়; বরং শিরকাহ ও মুদারাবাকে ব্যাংকের অর্থায়নের ভিত্তি বানাতে হবে, যাতেকরে সাধারণ মানুষও দেশের ব্যবসায়িক মুনাফায় বর্তমান সময় থেকে আরো উত্তমরূপে শরীক হতে পারে, তখন বলা হয় যে, চলমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শিরকাহ

ও মুদারাবা অসম্ভব এবং যতক্ষণ ব্যাংক লিমিটেড কোম্পানী আকারে থাকবে ততক্ষণ শিরকাহ ও মুদারাবাও জায়েয হবে না। বিকল্প জিজ্ঞাসা করা হলে বলা হয়, বিকল্প বলে দেয়া আমাদের দায়িত্ব নয়। এখন আপনারাই বলুন! কোন কর্মপন্থা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সংরক্ষণ, প্রচলন ও স্থায়িত্বের কারণ হচ্ছে?

বলা হয়, ফলাফলের দিক থেকে সুদী ব্যাংকিং এবং বর্তমানের সুদবিহীন ব্যাংকিংয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এটা এজন্যই বলা হয় যে, মুরাবাহা মুয়াজ্জালা ও ইজারার কারণে ব্যাংক ও ডিপোজিটর সাধারণত যে হারে মুনাফা পায়, তা কাছাকাছি হয়। বিষয়টি সাধারণভাবে মানুষের মনে এই আবেদন সৃষ্টি করে যে, এটা ঘুরিয়ে নাক ধরা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু বাস্তবতা হল, সুদী ও সুদবিহীন ব্যাংকিংয়ের এই বাহ্যিক সাদৃশ্য(যার ফিক্বহী দিকের উপর ইতোপূর্বে আলোচনা হয়েছে তা) সত্ত্বেও এ দু'টি পদ্ধতির মাঝখানে আকাশ পাতাল পার্থক্য বিরাজমান। জনসাধারণ শুধু ঐসব লেনদেন দেখে, যা সুদবিহীন ব্যাংক করে থাকে। তাও আবার বাহ্যিক দৃষ্টিতে। কিন্তু তারা এমন হাজার হাজার লেনদেন সম্পর্কে জানে না, যা শুধু শরয়ী বাধ্যবাধকতার কারণে পরিহার করা হয়। সুদী ব্যবস্থার ক্ষতি শুধু এটুকুই নয় যে, তারা ডিপোজিটরদেরকে কম মুনাফা দেয় আর পুঁজিপতিদের দেয় অনেক বেশী; বরং এর ক্ষতি হল বৈশ্বিক ধরণের। এই সুদী ব্যবস্থার মাধ্যমে এমন ব্যবস্থা অস্তিত্ব লাভ করেছে যে, যেখানে প্রকৃত সম্পদ ব্যতিরেকে কাল্পনিক টাকার ছড়াছড়ি এতবেশী বৃদ্ধি পেয়েছে, যদি এগুলোকে নোট বনিয়ে লম্বালম্বি করে দাড় করিয়ে দেয়া হয়, তাহলে তা ভূমি থেকে চাঁদ পর্যন্ত তিন চক্কর ঘুরে আসতে পারবে। আপনারা জানেন যে, নোটও কোন প্রকৃত মানের ধারক হয় না। কিন্তু আমি যে টাকার ছড়াছড়ির কথা উল্লেখ করছি তা নোটের আকারেও নয়; বরং কম্পিউটারে সৃষ্ট কাল্পনিক আকারে। প্রকৃত নোটের তুলনায় এর পরিমাণ কয়েক লক্ষ গুণ বেশী। আসবাবপত্র বা সম্পদ ছাড়া ঋণ জারী করা এবং কাল্পনিক জিনিসের বেচাকেনার কারণে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, যা পুরো অর্থব্যবস্থাকে বাতাসে ভরা বেলুনের মত বানিয়ে দিয়েছে, যেকোন সময় যা ফেটে গিয়ে বিরাট ধ্বংসযজ্ঞ সৃষ্টি করে দিতে পারে। সুদবিহীন ব্যাংকিংয়ে মুরাবাহা কিংবা ইজারা যাই হোক

প্রতিটি লেনদেনের পেছনে যেহেতু প্রকৃত সম্পদ থাকে তাই তা এই ধরণের ক্ষতি থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ।

এই সুদী ব্যবস্থাতে ঋণের বেচাকেনা হয়। এর জন্য আবার ঋণপত্রও (অর্থাৎ ঋণ পরিশোধের অঙ্গিকার পত্র) হয়, সেই ঋণপত্রের বাজারও বসে, আবার এসব ঋণপত্রের ক্রয় ও বিক্রয়ের অধিকার বিক্রয় হয়, যাকে 'অপশন' বলা হয়, আবার এসব অপশনের ক্রয়ের অধিকারও বিক্রয় হয়। যার মালিকানায় কিছুই থাকে না, সে শুধু কাল্পনিক ভিত্তির উপর ভবিষ্যতের ব্যবসা করে। ষ্টক মার্কেটে বিনিময়ের কারবার হয়ে থাকে। শেয়ারে 'ঈনা' (repo) করা হয়। মোট কথা, এটি বাতিল ও ফাসেদ লেনদেন ও চুক্তির একটি জগত, যা সুদী ব্যাংকিংয়ের একটি অপরিহার্য অংশ হয়ে আছে। এই ভিত্তির উপরই পুরো পুঁজিবাদী ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে আছে। সুদবিহীন ব্যাংকসমূহের জন্য শুধু সুদই নিষিদ্ধ নয়; বরং এসব লেনদেনও নিষিদ্ধ এবং এসব কিছু থাকা দুরে থাকা অত্যাবশ্যক, তাই এর এবং সুদী ব্যাংকের সামগ্রিক ফলাফলে বিরাট পার্থক্য বিরাজমান। এই কারণেই বর্তমান বিশ্ব মন্দার ঝড়ে যেখানে সারা পৃথিবীকে প্রচন্ডরকমের ঝাকুনি দিয়েছে সেখানে সুদবিহীন আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো সবচেয়ে কম প্রভাবিত হয়েছে। অনৈসলামিক বিশ্বও বিষয়টি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে। অথচ তারা এখনপর্যন্ত বেশীরভাগ মুরাবাহা ও ইজারার মতো পদ্ধতিই ব্যবহার করছে।

আমরা সবসময় শিরকাহ ও মুদারাবার উপর জোর দিয়ে আসছি এবং এখনো দিচ্ছি। কিন্তু বছরের পর বছর ধরে সুদী ও সুদবিহীন ব্যাংকিংয়ের উত্থান পতন দেখার পর মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে পরিপূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে এ কথা বলতে পারি যে, যদি দুনিয়ার সমস্ত ব্যাংক সুদবিহীন ব্যাংক হয়ে যায় এবং ধরুন তারা শুধূই মুরাবাহা ও ইজারার ভিত্তিতে তার সঠিক শর্তাবলী পালন পূর্বক অর্থায়ন করতে থাকে এবং সুদবিহীন ব্যাংকের জন্য শরয়ীভাবে আবশ্যকীয় বিষয়গুলো যথাযথভাবে পালন করে তাহলে যদিও তা ইসলামের উত্তম রূপের দৃষ্টান্তমূলক নমুনা হতে পারবে না, তবুও সারা দুনিয়া থেকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ঐসব ক্ষতিকর দিকসমূহ মুছে যাবে, যেগুলো আজ গোটা দুনিয়াকে অর্থনৈতিক মন্দায় গ্রাস করে নিয়েছে।

ইন্‌শাআল্লাহ্ এমন একটি নতুন ব্যবস্থা আসবে, যা শরীয়তের বরকতে পূর্ণ হয়ে যাবে।

সুদবিহীন ব্যাংকিং এবং অমুসলিম

সুদবিহীন ব্যাংকিংয়ের সমালোচকগণ এই বিষয়টি অনেক জোর দিয়ে বলেছেন যে, ব্যাংকিংয়ের এই পদ্ধতি অমুসলিমদের অনেক পছন্দ হয়েছে। এজন্য তা পশ্চিমা বিশ্বেও ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। যদিও এটি একটি আজগুবি দলিল যে, কোন হালাল জিনিস অমুসলিমদের পছন্দ হয়ে গেলে তাকে হারাম মনে করা উচিৎ। বাস্তবতা হল, পশ্চিমা বিশ্বে তিনটি শ্রেণী আছে। একটি শ্রেণী হচ্ছে তারা, যারা সুদবিহীন ব্যাংক এজন্যই গ্রহণ করেছে যে, এর মাধ্যমে মুসলমানদের সাথে লেনদেন করে তাদের ব্যবসা প্রসারিত করার প্রয়োজন ছিল। কেননা, দিন দিন মুসলমানদের মধ্যে সুদী ব্যবস্থা থেকে মুক্তি লাভের ঝোঁক বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমি একটি প্রসিদ্ধ পশ্চিমা ব্যাংকের দায়িত্বশীলকে জিজ্ঞাসা করি যে, ইসলামী ব্যাংকিংয়ের জন্য কোন ইউনিট বা প্রতিষ্ঠান কায়েম করার ধারণা আপনাদের কেন সৃষ্টি হল? তিনি উত্তরে বললেন, আমাদের মুসলমান গ্রাহকরা আমাদেরকে বলেন যে, আমরা সুদের উপর কাজ করব না। তাই আমাদের সুদবিহীন ব্যাংক দরকার। আমাদের গ্রাহকদের চাহিদা পূরণের জন্যই আমাদের এটা করতে হবে।

দ্বিতীয় শ্রেণী হল, যারা জ্ঞানগতভাবে সুদবিহীন ব্যাংকের গবেষণা করার পর এই ফলাফলে পৌছতে পেরেছে যে, সুদী ব্যবস্থায় যেসব ঝুকি ও ক্ষতি হয় এই ব্যবস্থায় তা নেই। বর্তমান অর্থনৈতিক মন্দার পর এ ধরণের মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে মনে হয়।

তৃতীয় শ্রেণী হল, যারা সুদবিহীন ব্যাংক ব্যবস্থার প্রাণঘাতী শত্রুতে পরিণত হয়ে আছে। তাদের আশংকা হল, যদি এই ব্যবস্থা সফলকাম হয়ে যায় তাহলে আমাদের সাজানো ধরায় পানি পড়ে যাবে। এরা হচ্ছে ঐ শ্রেণী, যাদের হাতে অপপ্রচারের বিরাট শক্তি আছে। কিছু কাল থেকে এমন কোন দিন যাচ্ছে না, যাতে সুদবিহীন ব্যাংকিংয়ের বিরুদ্ধে কোন না কোন বিষাক্ত প্রবন্ধ জনসাধারণের সম্মুখে আসছে না। এসব প্রবন্ধসমূহে আমাকে বিশেষ করে গালমন্দের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হয়েছে। এর

একটি কারণ হল, বিগত বৎসর মধ্যপ্রাচ্য ও মালয়েশিয়াতে বিলিয়ন বিলিয়ন টাকার এমন কিছু চেক (অর্থায়নের সার্টিফিকেট) ইস্যু হয়ে গিয়েছিল, যা আমি শরয়ী দৃষ্টিতে সঠিক মনে করিনি। আমি মজলিসে শরয়ীর সভাপতি হিসেবে এর বিরুদ্ধে বিবৃতি দিয়েছি। যা মধ্যপ্রাচ্য ও পশ্চিমা বিশ্বের সংবাদপত্রগুলো লালকালির হেডলাইনে প্রকাশিত করেছিল। এর ফলে অর্থনৈতিক ব্লকে একটি হৈচৈ পড়ে যায়। অতঃপর আমি বাহরাইনে মজলিসে শরয়ীর সভা ডেকে এই চেকগুলোর বিরুদ্ধে রেজুলেশন মঞ্জুর করিয়েছি এবং এর জন্য কিছু শরয়ী মূলনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছি, যার ফলে দ্রুত বাড়তে থাকা এই মার্কেটে স্থিতাবস্থা সৃষ্টি [illegible]। এই পরিস্থিতি বিশেষ করে ঐ পশ্চিমা শ্রেণীর কাছে এতই অসহনীয় [illegible] যে, এক পাকিস্তানী মৌলভীর কথায় সারা দুনিয়ার আর্থিক প্রতি[illegible] স্তব্ধ হয়ে গেছে। সুতরাং, এই ঘটনার সূত্রে ঐ শ্রেণীটি আপন অ[illegible]রের উপর চাপ সৃষ্টি করেছে যে, সুদবিহীন ব্যাংকিংয়ের ফলাফল এটাই [illegible] যে, বাজারের উপর সেসব লোকের প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে যারা শরীয়তের [illegible]। আর তাদের ভাষায়, যেহেতু শরীয়তের অনুসরণের অপর নাম হচ্ছে [illegible] ও মৌলবাদ, তাই তারা চিৎকার করে বলছে যে, ইসলামী ব্যাংক[illegible]লন দেয়ার কারণে পুরো অর্থব্যবস্থাই সন্ত্রাসীদের হাতে চলে যাচ্ছে। [illegible]হিসেবে তারা আমার ঐসব প্রবন্ধ বিকৃত করে উপস্থাপন করছে, যা [illegible]দের উপর লিখেছি।

সর্বশেষ নিবেদন

পরিশেষে একটি ভ্রাতৃত্বপূর্ণ নিবেদন করে আমার কথা শেষ করছি। যতদুর আমার সম্পর্ক আছে, আমি প্রথমেই বলেছি যে, আমার ব্যাপারে আকারে ইঙ্গিতে যেসব বলা হয়েছে সে ব্যাপারে আমার কোন বক্তব্য নেই। কিন্তু 'মুরাওয়াজা ইসলামী ব্যাংকারী' নামক কিতাবে বিশেষ করে ঐসব যুবক আলেমদেরকে হাসি, তামাশা, অপবাদ ও আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হয়েছে, যারা সুদবিহীন ব্যাংককে শরয়ী পরামর্শ প্রদান করে। তাদের অধিকাংশই মূলত দরস, তাদরীস ও ফতোয়ার খেদমতের সাথে জড়িত। তাদের ব্যাপারে কোথাও সম্পূর্ণ স্পষ্টভাবে

আবার কোথায় স্পষ্টের কাছাকাছি ইঙ্গিতে এই অপবাদ দেয়া হয়েছে যে, তারা শুধু আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য বিবেক বিক্রি করছে। আমার দরদমাখা নিবেদন হল, এরাতো আপনাদেরই ভাই, আপনাদের দর্শনের সাথে সম্পৃক্ত, আপনাদের মাদরাসাতেই খেদমতে আত্মনিয়োজিত। তাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করার পরিপূর্ণ অধিকার আপনাদের আছে। কিন্তু এই ধরণের অপবাদ আরোপ করা নিয়তের উপর আক্রমণ নয় কি? এই আক্রমণ করে আপনারা কার হাতে অস্ত্র তুলে দিচ্ছেন? অথচ তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যাদের ব্যাপারে আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, তারা শরয়ী আহকামের বড়ত্বের সামনে বড় থেকে বড় সম্পদকে পায়ে ঠেলে দিতে পারে। এই ধরণের লোকদের আপনারা 'উলামা' নয়; বরং 'যুবক ব্যাংকার' বলে অভিহিত করেছেন? এটা কি تنابزبالألقـــاب (খারাপ উপাধি প্রদান)-এর শামিল নয়? তাদের মধ্য থেকে একজন غـــرر বা ধোকাবাজি বিষয়ে তার 'পিএইচডি'র প্রবন্ধ রচনা করেছেন। আপনারা বলেছেন:

"যতদুর ধোকাবাজির সম্পর্ক, যদি এর সঠিক ব্যাখ্যা করা হয় তাহলে এটা ইসলামী ব্যাংকিংয়ের শরীরে এমন রোগ যার কোন চিকিৎসা নেই। এই আশংকার পরিপ্রেক্ষিতে কোন ব্যাংকার ডক্টর সাহেব এই বিষয়ে স্পেশালাইজেশন করেছেন..... ।" -(পৃ:১১৭)

এই আক্রমনাত্মক বাক্যক্ষেপনের মাধ্যমে আপনারা আপনাদের সমমনাদের কাছ থেকে প্রশংসা হয়তো পেয়েছেন, কিন্তু দাগ টানানো অংশের উপর যদি প্রশ্ন করা হয় যে, هلا شققت قلبه ؟ (অর্থাৎ, কেন তার অন্তর খুলে দেখনি?) তাহলে তার উত্তরও এখনই চিন্তা করে নেয়া উচিৎ।

'يا ايها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن' এবং 'ظنوا بالمؤمنين خيرا'

এবং 'لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم' এবং 'لا يجرمنكم

شنآن قـــوم علـــى ألا تعـــدلوا'-এর মতো কুরআন হাদীসের অকাট্য বিধানসমূহ আলোচনা ও প্রবন্ধ রচনার সময় লক্ষ্য রাখার কি কোন প্রয়োজন নেই? ঐ হাদীসটি আমাদের সকলের মনে রাখা উচিৎ, যা হযরত